দেশান্তরের স্বজন

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

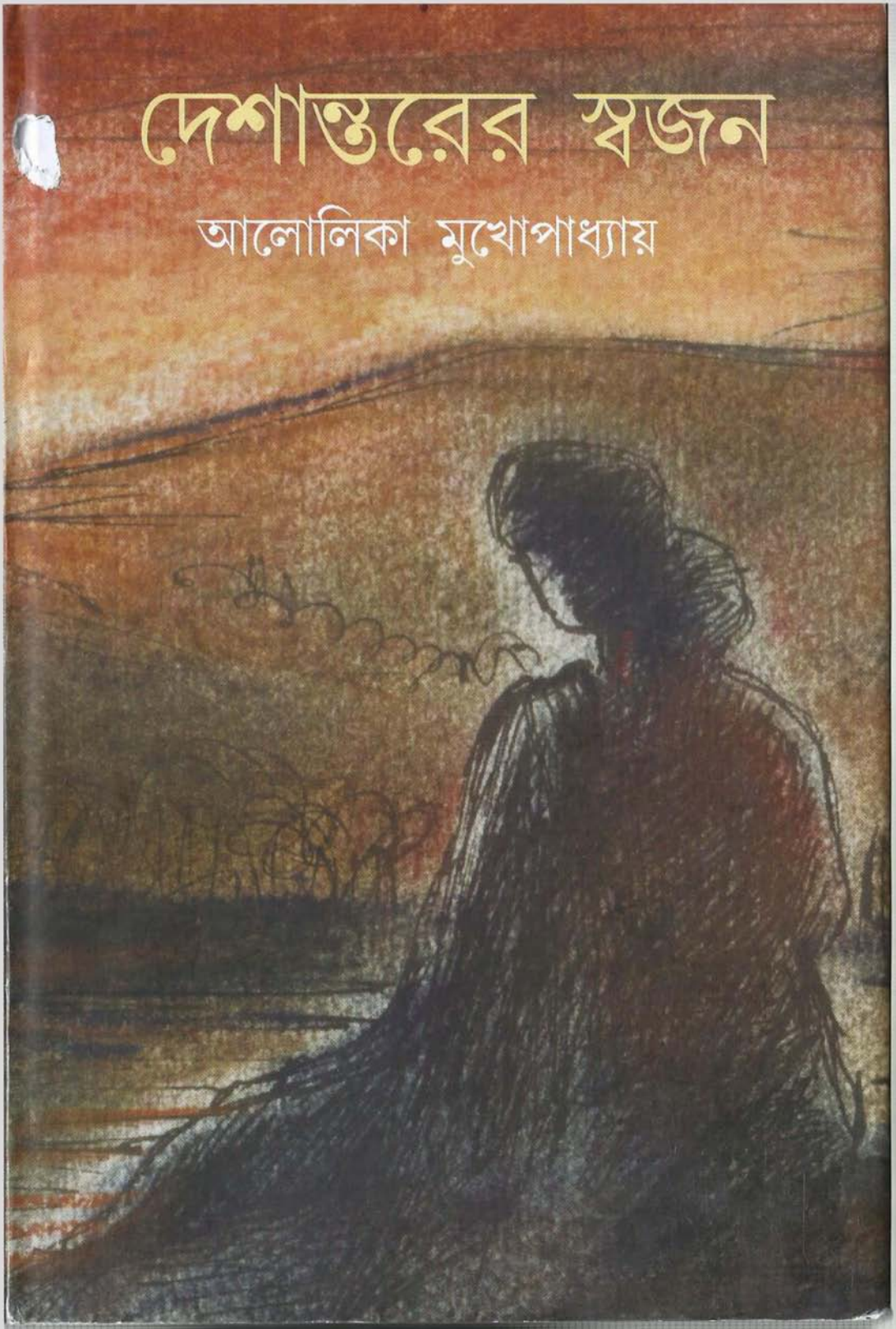

দেশান্তরের স্বজন

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য পরিষদ
৩৮এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

Deshatarer Swajan — Collection of Stories
By Allolika Mukhopadhyay

প্রকাশ করেছেন :
ড: রঞ্জা দাশ
দেব সাহিত্য পরিষদ
৩৮এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯
মো: ৭৬০৫৮-০৮৮২৪
ই-মেল: devsparishad@gmail.com

প্রথম প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০১৮; মাঘ ১৪২৪

© লেখিকা

ISBN - 978-81-929239-6-3

প্রচ্ছদ :
দেবাশিস সাহা

বর্ণ সংস্থাপনে :
জেএমএস এন্টারপ্রাইজেস্
১৫সি, ভুবন সরকার লেন
কলকাতা - ৭০০০০৭
মো: ৯৮৩১৬-৭২৪৯৮ / ৮৯৬১৮-২৭৩৯৪
ই-মেল: dasjoydev14@gmail.com

মুদ্রণে :
সেঞ্চুরী প্রেস
১৭, কানাই ধর লেন
কলকাতা - ৭০০০১২

মূল্য : ২০০ (দুইশত) টাকা

উৎসর্গ

শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতি সোনামন মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

সূচিপত্র

১ ॥	আত্মজন	১
২ ॥	স্মৃতি ভবন ও জীবন	৩১
৩ ॥	রূপকথার শর্ত্ত	৪৪
৪ ॥	রাজা সলোমনের দরবারে	৫৮
৫ ॥	গৃহযুদ্ধের শেষে	৮৪
৬ ॥	করালী দখলদারের ইতিবৃত্তান্ত	১১২
৭ ॥	এ জন্মের শেষ ঠিকানা	১২৬
৮ ॥	তিন কন্যা ও পাখির পালক	১৩৪
৯ ॥	দেশান্তরের স্বজন	১৪১
১০ ॥	অপুর ঠিকানা	১৫৯

আত্মজন

মাধবপুরের শিশুভবন থেকে বাড়ি ফিরে কবি অমলকান্তি বললেন—'ফোনটা তাহলে এখনই করো। সব যখন দেখেশুনে এলাম।'

তখন বেলা দুপুর। কবির স্ত্রী ঘড়ি দেখলেন।

'দুটো বেজে গেছে। ওবেলা অরুণ ফিরলে ফোন করব। তুমি জামাকাপড় বদলে নাও। শিউলিকে খেতে দিতে বলেছি।'

অমলকান্তি বুঝলেন মন্দিরা সরাসরি অপর্ণার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। অরুণ মন্দিরার কলেজের সহপাঠী। পুরোনো বন্ধুত্বের দাবীতে তার কাছে কিছু প্রত্যাশা থাকে। মন্দিরা মাঝে মাঝে ওদের নারীসংঘ আর শিশুকল্যাণ সমিতির জন্যে অরুণের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে আসে। আজ অবশ্য সে জন্যে নয়। অরুণদের ইচ্ছের কথা জেনেই ওদের সঙ্গে কথা বলবে।

দুপুরে খাওয়ার পরে অমলকান্তির আর পত্রিকা অফিসে যাওয়া হল না। সকাল থেকে মাধবপুর যাওয়াতে অনেকখানি সময় গেছে। আবার কলেজ স্ট্রিট যাওয়া, ট্র্যাফিক ঠেলে বাড়ি ফেরা। অমলকান্তি আর বেরোনোর উৎসাহ পেলেন না।

এই অবেলায় লেখালেখিতেও মন বসল না। বাইরের ঘরের চৌকিতে পাতা বিছানায় আধশোয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। পাশের ঘরে টাইপরাইটারের খটখট শব্দ। মন্দিরা ওদের সমিতির কাগজপত্র নিয়ে বসেছে।

কবি খবরের কাগজ সরিয়ে রাখলেন। আজ কোনো কিছুতেই মনসংযোগ করতে পারছেন না। অন্যমনস্ক কবির গায়ে, মাথায় হঠাৎ বৃষ্টির ছাট এসে পড়ল। জানলার বাইরে মেঘলা আকাশ। কখন ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নেমেছে। ভিজে হাওয়ায় ঝরা বকুলের গন্ধ। ফুটপাথের বকুলগাছ থেকে টুপটাপ ফুল ঝরছে। অপরাহ্নের আধোতন্দ্রায় কবি এক প্রার্থনার দৃশ্য দেখছিলেন। শিশুভবনের উঠোনে অপরিণত কণ্ঠের সেই সমবেত গান—'সারা জীবন দিলো আলো সূর্য্য গ্রহ চাঁদ...'

দরজায় কলিং বেল বাজল। বোধহয় শাওন এল। অমলকান্তি উঠে গিয়ে দরজা খুলতে শাওন স্কুলের ব্যাগ নিয়ে ঢুকল। বারান্দার এক পাশে জুতো রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আজ অফিসে যাওনি?' 'না রে। মাধবপুর থেকে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে গেল। তুই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে এলি! ছাতা নিয়ে যাসনি?'

শাওন হাত দিয়ে মাথা মুছল, 'বাস থেকে নেমে এইটুকু আসতেই ভিজে গেলাম।' শাওনের কথার মাঝখানে মন্দিরার গলা ভেসে এল, 'শিউলিকে চা করতে বল। আমি আসছি।'

শাওন খাবার টেবিলের পাশ থেকে চেয়ার টেনে বসল। মাথা ভরা ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জল। চোখে খয়েরি ফ্রেমের চশমা। গালের একপাশে বড়োসড়ো একটি তিল। ওর এখন ক্লাস ইলেভেন চলছে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে অমলকান্তির সঙ্গেই ওর যত কথা। ওর ধারণা ওকে আর বাবাকে একরকম দেখতে। ছোটবেলা থেকে চশমা নেওয়ার জন্যে অস্থির। যখন তখন অমলকান্তির চশমা পরে বসে থাকত। একমাথা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে নিজেকে আয়নায় দেখে বলত—'বাবা আর আমি একদলে। মা অন্যদলে।' মন্দিরা হেসে বলতেন, তা তো হবেই। বাবা তো আর ধরে বেঁধে অঙ্ক করায় না।'

শাওনের ছোটবেলায় অমলকান্তি নিজের লেখা কবিতার বই ওকে উপহার দিয়েছিলেন। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম পড়ে শাওন বিমুগ্ধ। তারপর বইটা খুলে উল্টে-পাল্টে দেখে বলল,—'কী বই লিখলে বাবা? একটা কবিতার পাশেও ছবি নেই! মানিককাকুর বাবার বইটাতে কত ছবি আছে দ্যাখোনি?'

সেই শাওন এখন বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়ছে। আধুনিক বাংলা কবিতা বোঝার চেষ্টা করছে। অমলকান্তির লেখক বন্ধুরা বাড়িতে এলে, ভক্ত পাঠকরা দেখা করতে এলে শাওন তাদের আলাপ-আলোচনার মাঝে এসে বসে। ওর বাবা যে একজন বিখ্যাত মানুষ, এজন্যে একটু গর্বিত ভাব।

টেবিলে জলখাবার খেতে বসে শাওন জিজ্ঞেস করল, 'আজ তোমরা বাচ্চাটাকে দেখে এলে? অরুণমামারাও কি গিয়েছিলেন?'

মন্দিরা মাথা নাড়লেন, 'না, ওরা এখনো পর্যন্ত ছেলেটাকে দ্যাখেনি। আমরা সুপারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছি। আজ অরুণকে সব জানাব।'

'বাচ্চাটা কত বড় মা?'

'ছেলেটা বছর তিনেকের। দেখতে একটু ছোটোখাটো। হয়তো নিউট্রিশানের অভাব। তবে মেডিকেল চেকআপ-এর রিপোর্টে দেখলাম এনলার্জড টনসিল ছাড়া আর কোনো অসুখ-বিসুখ নেই।'

'ও বাবা, এর-ও টনসিল? আমার মতো রাত্তিরে কেশে কেশে জ্বালাবে। বাচ্চাটার নাম কী গো?' মন্দিরা উত্তর দিলেন, 'মানিক, অরুণরা অ্যাডপ্ট্ করলে হয়তো নতুন নাম রাখবে।'

চা শেষ করে উঠে যাওয়ার সময় অমলকান্তি বলে গেলেন, 'মানিক নামের মানুষরা প্রতিভাধর হয়। অরুণদের জানিয়ে দিও।'

মন্দিরার ফোন পেয়ে সন্ধ্যেবেলায় অরুণ সান্যাল আর ওঁর স্ত্রী এলেন। অমলকান্তি তখন এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গিয়েছেন। শাওন ভেতরের ঘরে পড়তে বসেছে। মন্দিরা শিশুভবনের দেওয়া কাগজপত্র ওঁদের দিয়ে বললেন, 'এখানে কয়েকটা ইনফর্মেশন আছে। এবার তোমরা ওখানে গিয়ে বাচ্চাটিকে দ্যাখো। তারপর তোমাদের যা ডিসিশন।'

অরুণের স্ত্রী অপর্ণা জানতে চাইছিলেন, 'তুমি কোনো ছবি আনোনি? ভেবেছিলাম ছবি দেখে...।' মন্দিরা মাথা নাড়লেন—'না ছবি-টবি আনিনি। নিজেরা গিয়ে দেখে এসো। তিনবছরের ছেলে। দুরন্ত হতে পারে। জেদি হতে পারে। সব কিছু ভেবেচিন্তে দেখো।'

অরুণ হাসলেন, 'তুই হচ্ছিস আমাদের একমাত্র অ্যাডভাইসার। তোদের রেকমেন্ডেশনই যথেষ্ট। অপু, চলো তাহলে রবিবারে ওখানে চলে যাই।' অপর্ণা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা যদি রাজি হই, অ্যাডপ্শানের জন্যে কতদিন লাগবে?'

মন্দিরা বললেন, 'আগে তো বেশি সময় লাগত না। এখন প্রায় চার-পাঁচ মাস লেগে যায়।'

অপর্ণার গলার স্বর নেমে এল, 'তোমাদের মেয়েকে কোন বয়সে এনেছিলে?'

অপর্ণার অহেতুক প্রশ্নে অরুণ বিরক্ত হলেও মন্দিরা উত্তর দিলেন, 'ওর তখন পাঁচ মাস। তার আগে যাকে অ্যাডপ্ট্ করেছিলাম, দেড় বছর বয়সে নিউমোনিয়া মারা গিয়েছিল। এত ভেঙে পড়েছিলাম। মনে হত আমার মা হওয়ার যোগ্যতা নেই। বছর খানেক পরে মেদিনীপুরের বন্যায় রিলিফ ক্যাম্পে কাজ করতে গিয়ে শাওনকে নিয়ে এলাম। তখন শ্রাবণ মাস। অমল ওর নান রাখলো শাওন।'

অরুণ ঘটনাটা জানেন। পাশের ঘরে শাওন রয়েছে। অরুণ প্রসঙ্গ বদলাতে চাইলেন, 'কী রে? অমল রুগি দেখতে গেছে তো গেছেই। এত বৃষ্টির মধ্যে কোন পাড়ায় গেল?

মন্দিরার খেয়াল হল রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। ভবানীপুর থেকে ফিরতে এত দেরি হওয়া কথা নয়। অমল যে বাড়িতে গেছেন, তাদের টেলিফোনও নেই। মন্দিরা জানেন এইসব দূরত্বে অমল ট্রামে বাসে চড়তে চাননা। হেঁটে হেঁটে ভবানীপুর, গড়িয়াহাট চলে যান। কিন্তু আজ বৃষ্টি মাথায় করে কোথায় ঘুরছেন?

অমলকান্তির ফিরতে রাত দশটা বাজল। অরুণরা তখনো বসেছিলেন। অমলকান্তি বললেন রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় হেঁটে ফিরতে পারছিলেন না। ট্রামে, বাসে ওঠার চেষ্টা না করে, খানিক পথ হেঁটে আর রিকশা নিয়ে ফিরেছেন। অরুণ বললেন, 'এখানে একটা ফোন করে দিতে পারলে না।? আমি গাড়ি করে নিয়ে আসতাম।'

শাওন ঘরে ঢুকে বাবাকে বকাবকি করছিল। ভেজা ছাতা ওর হাতে দিয়ে অমলকান্তি মৃদু হাসলেন। রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছে বললেন, 'রাস্তাঘাটের যে এই অবস্থা বুঝতে পারিনি। তাহলে প্রেমাংশুর বাড়ি থেকে আগে বেরিয়ে পড়তাম।'

অপর্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'এবার আমরা যাই। আপনার দেরি দেখে একটু চিন্তা হচ্ছিল।'

মন্দিরাও তাড়া দিলেন, 'না, আর রাত কোরো না। অমলের জন্যে বসে থেকে তোমাদেরও দেরি হয়ে গেল।'

অমলকান্তির সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে দরজার বাইরে গিয়ে অরুণ আবার ফিরে এলেন। মন্দিরাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রবিবার আমাদের সঙ্গে মাধবপুরে যাবি? আমরা তো ওঁদের একেবারেই চিনি না। তুই সঙ্গে থাকলে কথাবার্তা বলতে সুবিধে হবে।'

মন্দিরা একমুহূর্ত ভেবে নিলেন, 'না। আমি আর যাব না। তোরা যে ছেলেটিকে দেখতে যাবি ওরা জানেন ডিসিশনটা তোদের দুজনকেই নিতে হবে। আমি থাকলে হয়তো ইনফ্লুয়েস করার চেষ্টা করব। সেটা উচিত হবে না।'

অরুণ তাঁর বান্ধবীকে চেনেন। আর কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। বৃষ্টি তখন প্রায় ধরে এসেছে। অমলকান্তি জামাকাপড় বদলে খাবার টেবিলে এলেন।

মন্দিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছে প্রেমাংশু?'

'একটু ভালো মনে হল। থেরাপি চলছে। তবে কথাবার্তা এখনো জড়ানো।'

'একটু ফল নিয়ে গেলে পারতে। এমন তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলে, আমারও খেয়াল হোল না।'

'প্রেমাংশুর ছেলের হাতে একশোটা টাকা দিয়ে এসেছি। ওষুধপত্রেরও তো খরচ আছে।'

শাওন বলল, 'আজ তোমাকে প্রিয়ব্রত রায় নামে একজন ফোন করেছিলেন। সামনের সপ্তাহের মধ্যে লেখা চাইছেন।'

অমলকান্তির মনে পড়ল 'বাতায়ন' পত্রিকা দুটো কবিতা চেয়েছিল। মাঝে কদিন লেখা নিয়ে বসা হয়নি। পত্রিকা অফিসের কাজের ফাঁকে সময়ও পাচ্ছেন না।

রাতে বিছানায় শুয়ে মন্দিরা বললেন, 'অরুণরা তো রবিবার মাধবপুরে যাচ্ছে। হয়তো কথাবার্তা ফাইনাল করে আসবে।'

'তুমি কি শুধু ছেলেটির কথা বলেছ?'

'ওরা তো মেয়ে নিতে চায় না। বিশেষ করে অপর্ণা। মেয়েদের জন্মপরিচয় না থাকলে নাকি বিয়ে দেওয়া মুশকিল। ও বোধহয় ভাবে ছেলে ওদের ভবিষ্যতে দেখবে। কে জানে?'

গভীর রাতে ঝড়বৃষ্টির শব্দে অমলকান্তির ঘুম ভেঙে গেল। মন্দিরা জানলার কাচ বন্ধ করে বিছানায় ফিরে এলেন। আধো অন্ধকারে দুটি মানুষ জেগে আছেন। অমলকান্তির গায়ে হাত রেখে মন্দিরা বললেন, 'আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। অনেকদিন আগে অরফানেজে গেলে এরকম হত।'

অমলকান্তি বললেন, 'আমারও মনটা ভালো নেই। এখন মনে হচ্ছে মানিকের খবর অরুণদের না জানালেই হত। শিশুভবনের সুপার কি আর ওদের রাজী করাতে পারবে। মন্দিরার গলায় সংশয়ের আভাস—'জানি না। অরুণ রাজি হলেও অপর্ণাকে কনভিন্স করা শক্ত।'

'কেন বলো ত? ওদের তো টাকার অভাব নেই। অত বড় বাড়ি, লোকজন। এ ধরনের বড়লোক জয়েন্ট ফ্যামিলিতে চিরকাল দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনরা এসে থাকে। আমার দাদু বড়লোক ছিলেন না। তবু গ্রাম সম্পর্কের তিন-চারজন দাদুর বাড়িতে

থেকে মানুষ হয়েছিল।'

'দুটোর মধ্যে তফাত আছে অমল। মানুষকে খেতে, পরতে দেওয়া কিংবা পড়ার খরচ দেওয়া আর অনাথ আশ্রম থেকে ছোট বাচ্চা এনে মানুষ করা, মানবিকতার দিক থেকে একরকম শোনালেও, দায়িত্ব তো এক নয়। আসলে কি জানো, ওরা এই বয়সে একটা অবলম্বন খুঁজছে। প্রয়োজনটা নিজেদের। আবার বলাও যায় না। মানিককে দেখার পরে হয়তো রাজি হতেও পারে।'

অমলকান্তির মনে হল, মন্দিরা যেন একটু বেশি আশা করছে। ওর যা স্বভাব। সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নয়। হয়তো অরুণদের বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করবে। এই সব ভাবনার মাঝে ভোরের দিকে একসময় ওঁর ঘুম এসে গেল।

রবিবার দুপুরে অরুণ আর অর্পণা মাধবপুরের শিশুভবনের অফিসঘরে অপেক্ষা করছিলেন। পৌঁছাতে একটু বেলা হয়ে গেছে। তখন ওখানে দুপুরের খাওয়ার সময়। সুপারিনটেন্ডেন্ট নির্মল দত্ত ওঁদের বসিয়ে রেখে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে নিচ্ছেন। খাওয়া শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল মানিককে ডাকতে পাঠাবেন। সিলিং ফ্যানটা তেমন জোরে ঘুরছে না। অপর্ণা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। ভেতরে ভেতরে ভারি উত্তেজনা হচ্ছে। অরুণের সঙ্গে সুপারের কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটিকে আপনারা কোথায় পেয়েছিলেন?' নির্মল দত্ত টেবিলে রাখা ফাইলটা এগিয়ে দিলেন, 'এখানে কিছু ইনফর্মেশন আছে। এর একটা কপি মিসেস মন্দিরা ব্যানার্জিকে দিয়েছিলাম! পেয়েছেন নিশ্চয়ই?'

অরুণ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, কাগজপত্র যা দিয়েছিলেন, পেয়েছি! অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ইনফর্মেশন, ছেলেটির বাবা, মা, কেউ বেঁচে নেই। কি হয়েছিল কিছু জানেন?'

নির্মল ফাইল বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে, তারপর কথা শুরু করলেন, 'ওর বয়স তখন দু-বছরেরও কম। মায়ের টিবি হয়েছিল। তাকে নিয়ে ওর বাবা বাসে করে জেলা হাসপাতালে গিয়েছিল। ফেরার পথে বাসের সঙ্গে লরির ধাক্কায় বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হতে ওর বাবা তখনই মারা যায়। মা-ও হাসপাতালে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি বাঁচেনি।'

অপর্ণা জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদের আত্মীয়স্বজন ছিল না? কে ওকে এখানে

দিয়ে গেল?'

'যতদূর জানি ওরা এদিককার লোক নয়। মানিকের বাবা পোস্ট্যাল ডিপার্টমেন্টে কাজ করত। অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজন দু-চারজন এসেছিল শুনেছি। কিন্তু বাচ্ছাদের দায়িত্ব নিতে কেউ রাজি হয়নি। তখন খবরের কাগজে নোটিস দিয়ে পোস্টমাস্টার ওদের এখানে রেখে গেলেন। সেই থেকে এখানেই আছে।'

অপর্ণা কথা বলার আগেই অরুণ বলে উঠল, 'বাচ্ছাদের মানে? ছেলেটি, মানে ওই মানিকের কথাই বলছেন তো?'

ঘণ্টার শব্দে নির্মল চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, 'একটু বসুন। আগে মানিককে নিয়ে আসি। পরে সব বলছি। আপনারা আজ দুপুরে খেয়ে যাবেন তো?'

তখনই চা, বিস্কুটের ট্রে নিয়ে এক মধ্যবয়সি মহিলা ঘরে ঢুকলেন। নির্মল পরিচয় করালেন, 'ইনি সুধাদি। শিশুভবনের মেট্রন। সুধাদি, এঁদের খেয়ে যেতে বলুন। আমি মানিককে নিয়ে আসছি।'

মহিলা চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে অপর্ণা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, 'না, না, আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন না। আর বেশিক্ষণ বসব না।'

সুধা মৃদু হাসলেন, 'কী আর ব্যবস্থা করব? আমাদের সঙ্গে সামান্য দুটো ডাল-ভাত খেয়ে যাবেন। বেলাও তো অনেক হয়েছে।'

অরুণের কাছে ব্যাপারটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। মানিক তাহলে এই অরফ্যানেজে একা আসেনি। সঙ্গে ওর ভাইবোনও এসেছিল। কিন্তু ফাইলে সেকথা লেখা নেই কেন?

অরুণ সরাসরি মেট্রনকেই প্রশ্ন করলেন, 'এই ছেলেটির কি আরও ভাইবোন আছে?'

মেট্রন উত্তর দিলেন, 'মানিকের ওপরে দুটি বোন আছে। আপনাদের কি সে কথা জানানো হয়নি?'

অপর্ণা অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন, 'না, আমাদের কিছুই জানানো হয়নি।'

'ও, কিন্তু মন্দিরা ব্যানার্জিকে তো দত্তবাবু জানিয়েছিলেন। উনি, ওঁর স্বামী, দুজনে সেদিন তিন ভাইবোনকে দেখলেন ওদের। সঙ্গে কথা বললেন।'

অপর্ণা হাত নেড়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। নির্মল একটি ছোটছেলের

হাত ধরে ঘরে ঢুকলেন।

রোগা ফর্সা ছেলেটা ওদের দেখে নির্মলের হাত ছেড়ে দৌড় লাগাল। সুধা গিয়ে আবার ধরে আনলেন। মাথার চুলে কদম ছাঁট। পরণে নীল গেঞ্জি, নীচে কালো হাফ প্যান্ট। পায়ে ছোট্ট হাওয়াই চটি। সুধার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মানিক ওদের দেখছিল। ওকে সামনে এগিয়ে দিয়ে নির্মল হেসে বললেন, 'এই হচ্ছে মানিক। এমনিতে খুব কথা বলে। এখন বোধহয় একটু লজ্জা পাচ্ছে।'

অরুণ সামনের টেবিলে রাখা চকলেটের প্যাকেট নিয়ে ওকে কাছে ডাকলেন। ছেলেটা এল না। আড়চোখে প্যাকেটটা দেখতে দেখতে সুধাকে মাথা উঁচু করে কী যেন বলল।

অরুণ বুঝতে পেরে উঠে গিয়ে ওর হাতে সেটা দিলেন। ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি মানিক?'

ছেলেটা মাথা নীচু করে রইল। ওর জড়তা কাটছে না বুঝে সুধা বললেন, 'এমনিতেই একটু শান্ত। খানিকবাদে দেখবেন হাসছে, কথা বলছে। তিনবছর তো মোটে বয়স।'

ঘরের বেঞ্চে বসে মানিক টুকটুক করে চকলেট খাচ্ছিল। অপর্ণা এরই মধ্যে কেমন যেন মায়ায় পড়ে গেছেন। আহা! কি রোগা অপুষ্ট চেহারা। সরু সরু হাত, -পা। মুখখানাই যা ভরাট। মাথার চুলগুলো কীভাবে ছেঁটে দিয়েছে। জামা-কাপড়ের চেহারা দেখলে দুঃখ হয়। অনাথ আশ্রমে আর কিই-বা জোটে। ছেলেটাকে আজই বাড়ি নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। শুধু একটা কথা জানা দরকার। সুপারের কাছে এখনো সব কিছু শোনা হয়নি। না জানা পর্যন্ত সোয়াস্তি পাচ্ছেন না।

মানিককে মেট্রনের সঙ্গে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে নির্মল অনুরোধ করলেন— 'আসুন। খাওয়াদাওয়া সেরে নিন, তারপর বাকি কথা হবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিশুভবনের খাবার ঘরে ওঁদের দুপুরের খাওয়া সারতে হল। আজ রবিবার বলে ডাল, ভাতের সঙ্গে মাঝের ঝোল হয়েছে। সপ্তাহে তিনদিন বাছ দেওয়া হয়। বাকি দিন নিরামিষ। মেট্রন বলছিলেন, আধা সরকারি এই অনাথ আশ্রমে খুবই হিসেব করে ওঁদের খরচ চালাতে হয়। আগের তুলনায় লোকেরা এখন আরও বেশি সংখ্যায় ছেলেমেয়ে পোষ্য নিচ্ছে ঠিকই। তবু নতুন নতুন শিশুরাও তো আশ্রমে আসছে। সরকারের বরাদ্দ টাকা আর অনিয়মিত ডোনেশনের

ওপর ভরসা করে কীভাবে যে এতগুলো ছেলেমেয়ের খাওয়া পরার ব্যবস্থা, চিকিৎসার খরচ চালাতে হচ্ছে, সে ওঁরাই জানেন।

অরুণ বললেন, 'আপনাদের ফর্মে যা দেখলাম, অ্যাডপশানের জন্যে খুব সামান্য ডোনেশন আশা করেন। সাধারণত কীরকম ডোনেশন পান?'

নির্মল উত্তর দিলেন, 'যে যেমন দিয়ে যান। আমরা কিছু চাইতে পারি না। বাচ্চাদের তো বিক্রি করছি না। মাঝে দু-একটা অর্গানাইজেশন সম্পর্কে এরকম খবর পাওয়া যাচ্ছিল। সত্যি, মিথ্যে জানি না।'

খাওয়া-দাওয়ার পরে ওঁরা অফিস ঘরে ফিরে এলেন। বাইরে চড়া রোদ। গুমোট গরমে ঘরের পাখাটা তেমন হাওয়া দিচ্ছে না। আশ্রমের ভেতরে কারো সাড়াশব্দ নেই, এখন বোধহয় বাচ্ছাদের ঘুমের সময়। অরুণ আর অপর্ণাকে বসিয়ে রেখে নির্মল আরও দুটো ফাইল নিয়ে এলেন। চেয়ারে বসে ফাইল দুটো খুলে কিছু পড়লেন। তারপর বললেন, 'মানিক সম্পর্কে আর একটা কথা বলা হয়নি। ওর দুই বোন এখানে থাকে। গৌরী আর মালা। গৌরীর বয়স আট বছর। মালার ছয়।'

অপর্ণা জানতে চাইলেন, 'ওরা কতদিন হল এখানে আছে?'

'এক বছরের ওপর।'

'তার মানে বাড়ির কথা ওদের সবই মনে আছে। বড় মেয়েটা ওর বাবার নাম, পদবি নিশ্চয়ই বলেছে।'

নির্মল ফাইলে চোখ রাখলেন, 'হ্যাঁ, এখানে লেখা আছে। বাবার নাম যতীন ঘোষ। মায়ের নাম মীনা ঘোষ। লোকটির অফিস থেকেও তাই জানিয়েছিল।'

অরুণ খুবই দ্বিধাগ্রস্ত, 'মিস্টার দত্ত, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না কী করা উচিত। যদি এখন মানিককে অ্যাডপ্ট করতে চাই, ও কি দিদিদের ছেড়ে থাকতে পারবে? এভাবে সরিয়ে নেওয়াও ঠিক নয়।'

'ও এখন খুবই ছোট। প্রথম প্রথম কান্নাকাটি করবে। আপনাদের স্নেহ ভালোবাসা পেলে ধীরে ধীরে পুরোনো কথা ভুলে যাবে। ওর দিদিদেরই বোঝানো শক্ত হবে। দেখুন না, আপনাদের আত্মীয়স্বজনরা কেউ যদি মেয়ে দুটিকেও নিতে চান।'

অপর্ণা মাথা নাড়লেন, 'না, এরকম কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, আমি ওকে নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করব। এখন যদি ছোটবেলার কথা...?

অরুণ অপর্ণাকে থামিয়ে দিলেন, 'শোনো, আজই আমরা কোনো ডিসিশন নিচ্ছি না। মিস্টার দত্ত, আপনারাও ভেবেচিন্তে দেখুন।'

নির্মলের মুখে ম্লান হাসি ফুটল, 'আমাদের আর ভাবাভাবির কী আছে বলুন। দেখে তো গেলেন এদের অবস্থা। এদের একজনকে যদি আপনারা নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেন, তার জীবনটা বদলে যাবে। মানিকের কী ভবিষ্যৎ? আপনিই বলুন।'

শেষ দুপুরে মাধবপুরের রাস্তা দিয়ে ফিরতে ফিরতে অরুণ ভাবছিলেন নিঃসন্তান জীবনে নিজে একরকম অভ্যস্থ হয়ে উঠেছেন। অপর্ণার কথা ভেবেই মন্দিরাকে অরফ্যানেজে খোঁজ নিতে বলেছিলেন। আজ মানিককে দেখে পর্যন্ত কি রে এক দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। একদিকে অসহায় ছেলেটর জন্য মায়া। অন্যদিকে সূক্ষ্ম এক অপরাধবোধের যন্ত্রণা। বারবার মনে হচ্ছে তিনটি অনাথ ভাইবোনকে কি বিচ্ছিন্ন করা যায়? নির্মলের শেষ প্রশ্নটাও মাথার মধ্যে ঘুরেফিরে আসছে। মানিকের কী ভবিষ্যৎ।

মানিকের ভবিষ্যৎ অথবা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যথাসময়ে নির্ধারিত হয়ে গেল। মাধবপুরের শিশুভবন থেকে এলগিন রোডের বিশাল বাড়িতে এসে তার নতুন নাম, পদবি হল অর্ণব সান্যাল। ডাকনাম হিসেবে সেটা সুবিধের নয়। তাছাড়া পুরোনো নামে না ডাকলে মানিক সাড়া দিচ্ছিল না বলে সে নামটাও রয়ে গেল। দয়া, মায়া, কৌতূহল ইত্যাদি নিয়ে সান্যালবাড়ির আত্মীয়স্বজনরা তাকে ঘিরে ধরল। উপহারে ঘর ভরে গেল। কিন্তু প্রথমদিন থেকে অরুণ যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই ঘটল। রাংতা মোড়া চকলেট হাতে নিয়ে মানিক বাড়ি যাব বলে কান্নাকাটি শুরু করল। কখনো দিদিদের খোঁজে। কখনো মামনির জন্যে কাঁছে। শিশুভবনের মেট্রন সুধা বোধহয় ওদের মামনি।

পাশাপাশি দুটি পৈত্রিক বাড়িতে অরুণদের তিন ভাই-এর সংসার। দুই দাদার ছেলেমেয়েরা মানিকের চেয়ে অনেক বড়। তবু ওরাই গল্প-টল্প বলে ওকে ভুলিয়ে রাখছে। ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বেশ থাকে। তার পরেই কান্না শুরু হয়। অরুণ অফিস থেকে ফিরলে মানিক ছুটে গিয়ে বলৌ 'বাড়ি যাব। গৌলিদিদির কাছে যাব।'

অপর্ণার বড় কষ্ট হয়? মন্দিরাকে ফোন করে বলেন, 'কী করি বলো তো? কেঁদে কেঁদে অসুখ-বিসুখ না করে। মন্দিরা ধৈর্য ধরতে বলেন, 'একটু সময় দাও।

ধীরে ধীরে অ্যাটাচমেন্ট হবে। আমার শুধু কষ্ট হয় ওর দিদিদের জন্য। মাধবপুরে ফোন করেছিলাম। ওরা খুব কান্নাকাটি করছে....'

প্রসঙ্গটা কোন দিকে যাচ্ছে অনুমান করে অর্পণা বিরক্ত হলেন। মন্দিরা এখনো সেই চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর আগে অরুণকে বলেছে, 'তোমাদের তো টাকার অভাব নেই। লোকবলও আছে। ওদের তিনজনকে নিয়ে এসো। একসঙ্গে থাকলে ওরা খুব তাড়াতাড়ি আডজাস্ট করে নেবে।'

সেই এক কথা অপর্ণা আর শুনতে চান না। ফোন রেখে দিয়ে দেখলেন সামনের বারান্দায় বসে আঙ্গুর খেতে খেতে মানিক খেলনার ট্রেন চালাচ্ছে।

মাস দুই পরে পুজো এসে গেল। কবির বাড়ির উঠোনের শিউলিগাছে ফুল ফুটছে। পাড়ার পুজোর প্যান্ডেল বাঁধা শুরু হতে না হতে শাওন জ্বরে পড়ল। এমন সময় জ্বর এল যে অমলকান্তির সঙ্গে ওর মাধবপুরে যাওয়া হল না। ওকে শিউলির কাছে রেখে ওঁরা দুজনে চলে গেলেন। অথচ একটু পরে শাওনের জ্বর কমে এল। মাথাব্যথাও করছে না। সারাদুপুর শিউলিমাসির খবরদারিতে অতিষ্ঠ হয়ে শাওন মাথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। বিকেলবেলা জানলার ধারে টুল নিয়ে বসল। বকুলগাছের পাশে কখন ট্যাক্সি এসে দাঁড়াবে তার জন্যে অধীর প্রতীক্ষা।

অমলকান্তিরা যখন বাড়ি ফিরলেন, ততক্ষণে রাস্তার আলো জ্বলে গেছে। শাওন দরজার কাছে গিয়ে দেখল শিউলিমাসি গলির মুখ থেকে দুটো ব্যাগ নিয়ে আসছে। পেছনে মা, তারও পেছনে দুটো বাচ্ছা মেয়ে। বাবা ঝুঁকে পড়ে টাক্সির ভাড়া দিচ্ছেন।

মন্দিরার গলায় উৎকণ্ঠা, 'বড্ড দেরি হয়ে গেল।

শাওন তখন মেয়ে দুটোকে দেখতে ব্যস্ত। ওরা ঘরের মাঝখানে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড়টার মাথায় দুটো চুট্‌কি বাঁধা। ছোটটার ঘাড় ছাঁটা চুলের একপাশে লাল ফিতের ফুল। গায়ে ফুলফুল ছিটের ফ্রক। তার নীচে চেক চেক পায়জামা দেখা যাচ্ছে। দুজনের হাতে সরু সরু প্লাস্টিকের চুড়ি। শাওন জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের নাম কী?'

বড়জন উত্তর দিল, 'গৌরী ঘোষ।' ছোটজন ওর দিদির গা ঘেঁষে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। মন্দিরা হাতে বাড়িয়ে দিলেন, 'কী হল? মালা, আমার কাছে এসো। এ হচ্ছে তোমার আরও একজন দিদি। শাওনদিদি।'

অমলকান্তি হেসে ফেললেন, 'তার চেয়ে বলো না কেন ঠানদিদি। শাওন, তুই ঠিক কর, ওরা কি বলে ডাকবে।'

শিউলি কাছে এসে ওদের নিরীক্ষণ করতে করতে মন্তব্য করল, 'বড্ড, রোগা গো। এদের ভাতের ফ্যান খাইয়ে মোটা করতে হবে।'

শাওন রেগে উঠল, 'আর বকবক কোরোনা তো! রোগা তো কি হয়েছে? খাওয়া নিয়ে তুমি একদম জ্বালাবে না।' অমলকান্তি হাত তুলে বললেন, 'হয়েছে। আর ঝগড়া করিস না। শিউলি আজ মালা, গৌরীর জন্যে কী কী স্পেশ্যাল রান্না করেছ বলো।'

শিউলি তার রান্নার ফিরিস্তি দিয়ে চলে গেল। শাওন মালাকে জিজ্ঞেস করল, 'গৌরী তোমার কে হয়? মালা হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে কচি গলায় উত্তর দিল, 'দিদি।'

'তাহলে আমাকে কি বলে ডাকবে? দিদিভাই?' গৌরী মাথা নাড়ল। মালা দেওয়ালের তাকের ওপর রাখা কাঠের রাশিয়ান পুতুলটা মন দিয়ে দেখছিল। শাওন সেটা নিয়ে এসে বড় পুতুলের পেট থেকে মেজো, সেজো, ছোট, তস্য ছোট পুতুলগুলো বের করতে, মালা আর গাম্ভীর্য ধরে রাখতে পারল না। অবাক চোখে হাত বাড়িয়ে, বললো, 'দে না। ভাঙব না। একটু খেলে দিয়ে দেব।' ওর কথা শুনে শাওন হেসে অস্থির।

এ বাড়িতে সবকিছুই পরিমিত। শাওনের মতো গৌরী, মালার জন্যেও পুজোর কয়েকটা জামাকাপড় কেনা হল। সঙ্গে বাটার জুতো, মোজা। মালা অনবরত জুতোর বাকল্‌স্‌ লাগাচ্ছে আর খুলছে। শিউলি বললে, 'এতো দেখি পুজোর আগেই জুতোর সব্বোনাশ করবে। গৌরী বয়সের তুলনায় একটু পরিণত। রাতারাতি বাবা, মাকে হারিয়ে, অনাথ আশ্রমের অপরিচিত পরিবেশে থেকে ওর বালিকাসুলভ আনন্দ, উদ্ভাস স্তিমিত হয়ে গেছে। গৌরীর ভীরু বিষণ্ণ মুখখানা দেখে অমলকান্তি অনুভব করেন ওর ছোট্ট জীবনের অমূল্য মুহূর্তগুলো কখনো ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। আট বছরের স্মৃতি থেকে শৈশব মুছে যাওয়ার নয়। ও শাওনের মতো জন্ম থেকে সর্বস্ব হারিয়ে আসেনি।

পুজোর সময় গৌরী আর মালাকে নিয়ে শাওন কাছাকাছি রাস্তায় ঠাকুর দেখিয়ে আনল। পাড়ার পুজোয় অনেকেই দেখল অমলকান্তি আর মন্দিরা আবার

দুটি পোষ্যকন্যা নিয়েছেন। প্যান্ডেলের ঢাকঢোল আর মাইকের গানের শব্দে অমলকান্তি যখন লেখা থামিয়ে বসে আছেন, মেয়েরা তখন বাড়ি ফিরল। মালা দৌড়ে এসে বলল, 'লাল দই খেয়েছি।'

'লালদই? কোথায় খেলে?'

বারান্দা থেকে শাওনের গলা শোনা গেল, 'ওদের নিয়ে জলযোগে গেলাম। দই আর শোনপাপড়ি খাইয়েছি।'

অমল হাসলেন, 'দ্যাখো মালা, তোমার দিদিভাই আমাদের জন্য লালদই আনলোনা।'

শাওন হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল, 'আনবোনা কেন? মা তো দই কেনার টাকা দিয়েছিলেন।'

বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় অমলকান্তি মেয়েদের নিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখাতে গেছেন। মন্দিরা চাইছিলেন গৌরীরা যখন বাড়িতে থাকবে না, সেই সময় অরুণকে সব জানাবেন। ফোনে অরুণকে পাওয়া গেল। দুজনের মধ্যে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে মন্দিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'মানিকের কী খবর? কান্নাকাটি কমেছে?'

'হ্যাঁ, এখন আর আগের মতো কান্নাকাটি নেই। পুজোর মধ্যে এখানে ওখানে ঘুরিয়ে আনলাম। তোরা একদিন চলে আয়। অনেকদিন দেখা হয়নি।'

—'মাঝে খুব ব্যস্ত ছিলাম। অমল দিল্লিতে গেল।'

'অ্যাওয়ার্ড নিতে গেল, সেটা বলছিস না কেন?' কাগজে অমলের ছবি দেখলাম। এত পুরস্কার রাখছিস কোথায়?'

মন্দিরা হাসছেন, 'অমল সেগুলো মাথায় রাখতে পারলেই ভালো হত। ঘরে একটু জায়গা পেতাম। এখন আমরা তিনজনের জায়গায় পাঁচজন। সে খবরটা দিতেও তোমাদের ফোন করলাম।'

অরুণ জিজ্ঞেস করলেন, 'পাঁচজন মানে? বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এসেছে?'

'অরুণ, আমরা মানিকের দুই দিদিকে নিয়ে এসেছি অ্যাডপ্‌শনের জন্যে ওই সময়েই অ্যাপ্লাই করেছিলাম। কয়েকদিন আগে সব হয়ে গেল। ওরা পুজোর আগেই চলে এসেছে।'

অরুণ হতবাক। মন্দিরা তাহলে এতটাই ভেবে রেখেছিল ওদের রাজি করাতে

না পেরে নিজেরাই শেষপর্যন্ত মেয়েদুটোকে অ্যাডপ্ট করল? এরকম ডিসিশন নেওয়া ওদের পক্ষেই সম্ভব। অরুণের মনে হল এখবর আপাতত অপর্ণাকে জানানোর দরকার নেই। কিন্তু বেশিদিন লুকিয়ে রাখা কি সম্ভব? বিশেষ করে অপর্ণা যখন মানিকের জন্মদিনে মন্দিরাদের নেমন্তন্ন করবে বলে ভেবেছে। মন্দিরার সঙ্গে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে অরুণ ফোন রেখে দিলেন।

অপর্ণা সে সময় দোতলায় ছিলেন। হঠাৎ সিঁড়ির কাছে মানিকের কান্নার শব্দ পেয়ে সেদিকে গেলেন। অরুণের দাদার মেয়ে সুপ্রিয়া মানিককে নিয়ে ওপরে এসে বলল, 'আজ কি কাণ্ড হয়েছে জানো? এক্ষুনি ওর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল।'

অপর্ণা চমকে উঠলেন, 'সে কিরে? কী হয়েছে? ও কোথাও পড়ে গেছে?'

মানিককে কোলে তুলে নিতে ও জোর করে নামার চেষ্টা করল। ফুপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'গৌলিদিদি বাইরে আছে। মালা আছে। ওখানে যাব।'

অপর্ণা স্তম্ভিত। কী বলছে মানিক? একটু আগে বেলুন কিনে দেওয়ার জন্যে ড্রাইভার ওকে গেটের বাইরে নিয়ে গেল। ওখানে কি কাউকে দেখতে পেয়েছে?

সুপ্রিয়া আভাসে ইঙ্গিতে ঘটনাটা বলল। বেলুন কেনার সময় রাস্তার ওপারে ভিড়ের মধ্যে দুটো মেয়েকে দেখে মানিক ড্রাইভারের হাত ছেড়ে দৌড়েছে। একটুর জন্যে স্কুটারের সঙ্গে ধাক্কা লাগেনি। কিছুতেই বাড়ি আসবে না সমানে ওই নাম দুটো বলে কাঁদছে।

অপর্ণার কেমন ভয় হল। মানিক কাদের দেখতে পেয়ে চলে যাচ্ছিল? কিন্তু তা কি সম্ভব? ওরা এখানে আসবে কী করে? বোধহয় ভিড়ের মধ্যে কাউকে দেখে ওদের কথা মনে পড়েছে। অপর্ণা আর সুপ্রিয়ার কথার মাঝখানে অরুণ চলে এসেছেন। মানিককে শান্ত করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'আয়। বাইরে নিয়ে যাব।'

সেরাতে মানিক ঘুমিয়ে পড়ার পরে দুজনে বারান্দায় গিয়ে বসলেন। তখনো বড় রাস্তা থেকে বিসর্জনের ঢাকের বাজনা, লরির আওয়াজ, কখনো 'দুর্গামায়ী কি জয়' ভেসে আসছে। রাতের বিষণ্ণ অন্ধকারে দুটি মানুষ নিশ্চুপ বসে আছেন। তাঁদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে বিজয়া দশমীর রাত কখনো এমনভাবে আসেনি। তবে কি সিদ্ধান্তে কোনো ভুল হল? সন্তান না থাকার অভাব বোধ ছিল। তবু, আজকের এই টানাপোড়েন, উৎকণ্ঠা, একটি শিশুকে আপন করতে না পারার অক্ষমতার যন্ত্রণা

কি আরও তীব্র নয়?

একসময় নীরবতা ভেঙে অরুণ বললেন, 'কদিনের জন্যে পাটনায় ঘুরে এলে হয়। তোমার বাবা তো মানিককে দেখেননি। আমি ফিরে আসব। তুমি ওকে নিয়ে কদিন থেকে আসতে পারো।'

অপর্ণা উত্তর দিলেন, 'কোথায় নিয়ে যাব? এখানেই থাকতে চাইছে না। ওখানে অচেনা লোকজন দেখে হয়তো আরও ইন্‌সিকিওর্ড হয়ে যাবে। দেখছ তো, ওর মন সারাক্ষণ ওদেরই খোঁজে।'

'ও এখনো একটা ট্র্যানজিশন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মাত্র চার-পাঁচ মাসে কি তুমি আশা করো?'

অপর্ণার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ভেবেছিলেন ধীরে ধীরে মানিক ওঁর ওপর নির্ভর করতে শিখবে। বয়স তো বেশি নয়। ইচ্ছে ছিল ওর জন্মদিনে সব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকদের ডাকবেন। ছেলেটা খুশি হবে। কোথায় কী? তবু জন্মদিনের কথা মনে পড়ায় অরুণকে বললেন,

'মানিকের জন্মদিন তো এসে গেল। মন্দিরা অমলরা একদিন আসবে বলেছিল। ভাবছি বাড়ির লোকজন আর ওদের কয়েকজনকে ডেকে ছোট করেই ব্যবস্থা করি। এ বছর আর বেশি লোকজন ডাকার দরকার নেই।'

মন্দিরাদের প্রসঙ্গে অরুণ অসোয়াস্তি বোধ করলেন। আজ মানিক যা করেছে, তা থেকে আরও স্পষ্ট হল, এ বাড়ির সঙ্গে ওর এতটুকু অ্যাট্যাচমেন্ট গড়ে ওঠেনি। ওর শিশুমন সেই মাধবপুরের অনাথ আশ্রমে পড়ে আছে। আজ যদি মন্দিরার সঙ্গে ওর দিদিরা এসে দাঁড়ায়, মানিক মুহূর্তের মধ্যে ওঁদের ছেড়ে চলে যাবে। ভালো খাবার খাচ্ছে, কি দামি খেলনা নিয়ে খেলছে, ওর কাছে এসবের কোনো আকর্ষণ নেই। অপর্ণা নিজেও তা বোঝে হয়তো অনাথ আশ্রমে ওর আপনজন না থাকলে এ সমস্যা হত না। কে জানে? তিন বছরের ছেলের মনঃস্তত্ত্ব বোঝার মতো অভিজ্ঞতাও তো নেই।

মন্দিরা কি সত্যিই মেয়ে দুটোকে এখানে নিয়ে আসবে? ওর ওপর অরুণ রাগ করতেও পারছেন না। নিজেরা যে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছেন, মানবিকতার তাগিদে ওরা সেই ভার নিয়েছে। কিন্তু একই শহরে বাস করে তিনটি ভাইবোনকে কি বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব? অরুণ জানেন, অপর্ণা এ কথা শুনলে রাগে,

দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়বে। মন্দিরাদের সঙ্গে দেখাশোনা বন্ধ করে দেবে। এতকালের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভেঙে যাবে। আসন্ন এক ঝড়ের পূর্বাভাসে অরুণ উদ্‌বিগ্ন হলেন।

শেষপর্যন্ত তাঁর আশঙ্কা সত্যি হল। মানিকের জন্মদিনের আগে অপর্ণা যেদিন মন্দিরাকে ফোন করলেন, সেদিনই সব কথা জানতে পারলেন। মন্দিরা বলেছিলেন মানিকের জন্মদিনের অপ্রত্যাশিত উপহার তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যাবেন। অপর্ণা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মন্দিরার এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতায় এতই আঘাত পেয়েছেন যে, ভবিষ্যতে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না।

অমলকান্তি অনুমান করেছিলেন এমনটা ঘটতে পারে। অপর্ণার মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার অধিকার যে মন্দিরার নেই, এ কথা বুঝেও মন্দিরা মেনে নিতে পারছিল না। গৌরী আর মালাকে আশা দিয়েছিল ভাই-এর সঙ্গে আবার দেখা হবে। আলাদা বাড়িতে মানুষ হলেও ওদের মধ্যে আসাযাওয়া থাকবে। ওরা মানিককে দেখার জন্য উন্মুখ। এখন নতুন করে ওদের কী বোঝাবে মন্দিরা?

শাওনের কান্না পাচ্ছিল। অপর্ণামামি এত নিষ্ঠুর কেন? মানিককে তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। ওর নিজের বোনদের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখতে দেবেন না? ভাগ্যিস মা আগে থেকে বলে দিলেন। নয়তো মানিকের জন্মদিনে সারপ্রাইজ দিতে গিয়ে কী অপমানিতই না হতেন। গৌরী, মালাকে নিশ্চয়ই ওদের বাড়িতে ঢুকতেও দিত না। সেই দুঃখের দৃশ্য কল্পনা করে শাওন নিজেই কেঁদে ফেলেছিল। আরও কষ্ট হয়েছিল বিছানায় গৌরীর বালিশের পাশে ছোট্ট ব্যাগটা দেখে। ওর মধ্যে মানিকের ফেলে আসা একটা জামা আর কালো সুতোয় বাঁধা মাদুলি। গৌরী বালিশ মুখ গুঁজে কাঁদছিল। শাওন ওর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়েছিল—একদিন ঠিক মানিকের সঙ্গে দেখা হবে।

বছর কেটে যায়। দুই পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ নেই। শুধু অরুণ মাঝে মাঝে আসেন। মন্দিরাদের চ্যারিটি ফ্যান্ডের জন্যে টাকাপয়সা দিয়ে যান। জনস্বার্থের কথা ভেবে মন্দিরা চেক ফিরিয়ে দিতে পারেন না। পুরোনো বন্ধুর নিরুপায় অবস্থা বুঝে মানিকের প্রসঙ্গও তোলেন না। অরুণ এ বাড়িতে এলে মেয়ে দুটিকে দেখতে পান। তারা বছর বছর নতুন ক্লাসে উঠছে। পাড়ার গানের স্কুলে যাচ্ছে। মন্দিরা অনেক খবর দেন। আবৃত্তি আর অভিনয়ের জন্যে গৌরী স্কুলের বাইরেও নানা অনুষ্ঠানে ডাক পাচ্ছে। অরুণ ভাবেন হয়তো অমলকান্তির জন্যেও তাঁর পালিত

মেয়ে এত সুযোগ পাচ্ছে।

অপর্ণা একদিন বাংলা কাগজে গৌরীর ছবি দেখলেন। অমলকান্তির বন্ধু বিখ্যাত পরিচালক সত্যেন মিত্রের নতুন ছবিতে সে এক কিশোরী নববধূর ভূমিকায় অভিনয় করছে। অপর্ণা কাগজটা সরিয়ে রাখলেন। মেয়েকে তাহলে ওরা সিনেমায় নামাচ্ছে। চেনশোনা থাকলে সবই হয়। সেই কবে একবার মাধবপুরে দেখেছিলেন। মেয়েটার মুখখানাও ভালো মনে নেই। এত বছর পরে ওর সিনেমার মেকআপ নেওয়া ছবি দেখে চিনতেও পারতেন না। কাগজে কবি অমলকান্তির মেয়ে গৌরী লিখেছে দেখে বুঝতে পারলেন। এ ছবি দেখে মানিকও চিনতে পারবে না। ওর ছোটবেলার কথা আর কিছুই বলে না। তবু ছবিটা না দেখা ভালো। মানিককে নিয়ে ওঁরা ছোটদের বাংলা, ইংরিজি ছবি দেখতে যান। রবীন্দ্রনাথের গল্প হলেও মানিককে এ সিনেমাটা দেখানোর দরকার নেই। শুনে অরুণ হাসলেন, 'সত্যেন মিত্রর সিনেমা। হয়তো মানিকদের স্কুল থেকেই দেখতে নিয়ে যাবে।'

অপর্ণা মাথা নাড়লেন, 'না, না। ওটা প্রেমের গল্প। বাচ্ছাদের দেখার মতো বই নয়।'

'মানিক এখনো বাচ্ছা নাকি?'

অপর্ণা হাসলেন, 'সত্যি! দশ বছর বয়স হয়ে গেল খেয়ালই থাকে না। দেখতে দেখতে ওর পৈতে দেওয়ার সময় হয়ে গেল। ভাবছি সামনের বছরে দিয়ে দেব।'

পৈতে দেওয়ার কথায় অরুণের মা আপত্তি তুলেছিলেন। ছেলের পোষ্যপুত্র নেওয়াতে তাঁর মত ছিল না। ক্রমশ মানিকের ওপর মায়া পড়ে গেলেও ওর পৈতের সময় নান্দীমুখের অনুষ্ঠানে অরুণদের পূর্বপুরুষদের নাম ধরে টানাটানি তাঁর পছন্দ নয়। শেষপর্যন্ত অরুণের দাদারা বোঝাতে উনি রাজি হলেন। এগার বছরে ধুমধাম করে মানিকের পৈতে হল। তার নিজের দুই দিদি বাদে শ'তিনেক লোক নেমন্তন্ন খেয়ে গেল। উপনয়ন উপলক্ষে ন্যাড়া অর্ণব সান্যালের দ্বিতীয় জন্ম হল।

এই শহরে শীত আর আগের মতো পড়ে না। কৃষ্ণচূড়া পলাশের লাল পাপড়ি ছড়ানো পথ দিয়ে যেতে যেতে শাওনের মনে পড়ে আজ বসন্ত। অথচ চাকরি আর সংসার নিয়ে এমন ব্যস্ত যে, বাবার কাছে গিয়ে কবিতা শোনার সময় হয় না। দু-বছর আগে ওর বিয়ে হয়েছে। অমলকান্তির পালিত মেয়ে জেনেই অফিসের

সহকর্মী দেবাংশু ওকে বিয়ে করেছে। বিধবা শাশুড়ি নিয়ে ওদের নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। তবু ঠাকুরপুকুর থেকে রোজ অফিস যাতায়াত করে শাওনের আর নিয়মিত সর্দ্দার শঙ্কর রোডে যাওয়া হয়ে ওঠে না। মা-র মাঝে একবার মাইল্ড স্ট্রোক হল। তাও ঘরে, বাইরে কোথাও ছুটি নিতে পারেন না। গৌরীর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা চলছে। মালার উঁচু ক্লাসে পড়াশোনার যথেষ্ট চাপ। গত সাত-আট বছরে বাবার শরীরেও ছোটখাটো উপসর্গ ধরা পড়েছে। শাওন বোঝে মালা, গৌরীর ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবা বেশ চিন্তিত। গৌরীর ার পড়াশোনার ইচ্ছে নেই। মা, বাবার সেটাই দুশ্চিন্তা। বাংলা সিনেমার নায়িকা হবে ভেবে যদি বি.এ.টাও না পাশ করে, মা সেটা একেবারেই সমর্থন করছেন না। দেখা যাক, পরীক্ষার রেজাল্ট কেমন হয়। ছবির অফার একটা-দুটো এসেছে। সত্যেন মিত্রর বই বলে বাবা এবারেও সরাসরি না বলতে পারছেন না। শাওনের মনে হয়, বেশি বাধা দিয়ে লাভ নেই। গৌরী যদি সিনেমায় কেরিয়ার করতে চায় করুক। টেনে টুনে বি.এ. পাশ করে কি চাকরি করবে? শাওন নিজে তো এম.এ. পাশ করেও নামেমাত্র অফিসার। তবু মা বলেন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ। মেয়েদের স্বনির্ভরতা শেখানোর জন্যে মা এই বয়সেও গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে কাজ করছেন।

শাওন বাড়ি এসে দেখল রীতিমতো নাটক চলছে। গৌরী তার পরীক্ষা ভালো হয়নি বলে মুখ ভার করে বসে আছে। মার ধারণা সিনেমার পোকা মাথায় না ঢুকলে ও একটু মন দিয়ে পড়াশোনা করত। মার মেজাজ বুঝে মালা সাত তাড়াতাড়ি পড়তে বসেছে। বাবা গেছেন রানাঘাটে কবি সম্মেলনে। ফিরতে রাত হবে। মার সঙ্গে দু-চার কথা বলে শাওন গৌরীকে জিজ্ঞেস করল, 'কাল পরীক্ষা আছে।' গৌরী উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়ল। শাওন জিজ্ঞেস করল, 'নেক্সট পরীক্ষা কবে?'

গৌরী গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'সোমবার।'

'তাহলে দোসা খেতে চল। মালাকে রেডি হতে বলেছি।'

'মাসি জানেন? এখন বেরোলে তো পড়তে বসতে রে হয়ে যাবে।'

'ফিরে এসে পড়বি। আমরা পরীক্ষার সময় রাত দুটো-তিনটে অবধি পড়তাম। সন্ধ্যেবেলা সার্দান অ্যাভিনিউ-এ বেড়াতে বেরোতাম তোর মনে নেই। বাবা বলতেন বসন্তের হাওয়া খেয়ে আয়।'

'তাও তুমি মাসিকে জিজ্ঞেস করো। এমনিতেই যা রেগে আছেন।'

শাওন গৌরীকে ইশারায় থামিয়ে দিলেন। মন্দিরা বারান্দায় এলেন, 'বেশি দেরি করিস না। গৌরীর অনেক রিভিশন বাকি আছে। পরশু পরীক্ষা।'

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে মালা জিজ্ঞেস করল, 'আজ তুমি থাকবে? কাল তো অফিস নেই।'

'আজ রাতটা থেকে যাব। কাল বিকেলে আবার আমাদের ওখানে একটা ফাংশান আছে। দেবাংশুরা নাটক করছে। তোদের পরীক্ষা না থাকলে নিয়ে যেতাম।'

বড় রাস্তার ওপারে "প্রেমা ভিলাস্"-এ দোসা খেতে বসে শাওন নিজে থেকে কথাটা তুলল, 'তোর পরীক্ষা খারাপ হয়েছে মানে কী? নিজে বুঝছিস না কেমন দিয়েছিস? পাশ নম্বর থাকবে তো?'

'তা থাকবে। কিন্তু মাসি যা এক্সপেক্ট করছেন, সেরকম রেজাল্ট হয়তো হবে না। দিদিভাই, আমি তোমার মতো পড়াশোনায় ভালো নই। আমার আর পড়তেও ইচ্ছে করে না।'

'তোর বয়সে পড়তে কার ইচ্ছে করে গৌরী? বাধ্য হয়ে পড়তে হয়। তোর যদি গ্র্যাজুয়েশন করতে ইচ্ছে না করে সে আলাদা কথা। কিন্তু একটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন না থাকলে জীবনে দাঁড়াবি কী করে? সেল্ফ্ সাফিশিয়েন্ট না হলে এযুগে চলে?'

'সিনেমায় নেমেও তো লোকে রোজগার করে। প্রথম ছবিটার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা পাইনি? মাঝে আরও কয়েকজন প্রোডিউসার মেসোমশাই-এর সঙ্গে কথা বলে গেছেন। আমার পরীক্ষা শেষ হলে কন্ট্র্যাক্ট নিয়ে আসবেন বলেছেন। কিন্তু মাসি একেবারে এগেন্স্ট। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না দিদিভাই?'

শাওন অবাক, 'তার মানে তুই আর কলেজে পড়তে চাস না? গৌরী, সিনেমা থিয়েটারের জগতেও কিন্তু এত কম পড়াশোনা নিয়ে কিছু অ্যাচিভ করা শক্ত।'

গৌরী তর্ক করল, 'কি বলছ তুমি? কত অ্যাক্ট্রেস আছে, যাদের কলেজের ডিগ্রিই নেই। কেরিয়ারের দিক থেকে তারা কিন্তু পুরোপুরি সাক্সেসফুল। অ্যাকটিংও তো কোয়ালিফিকেশন। সবাই পারে নাকি?'

শাওনের মনে হল গৌরীর একটা সিনেমা করেই মাথা ঘুরে গেছে। তাও আবার সত্যেনকাকার মতো বিখ্যাত পরিচালকের ছবিতে নায়িকার রোল্। এ মেয়েকে

রোখা যাবে না। এই যে মাদ্রাজী রেস্তোঁরায় বসে ওরা দোসা, কফি খাচ্ছে, এখানে ও কমবয়সি ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি ওদের টেবিলের দিকে। ওরা কেউ সোজাসুজি নয়তো আড়চোখে গৌরীকে দেখছে। গৌরী তার সৌন্দর্য সম্পর্কে কতোটা সচেতন বোঝা যায় না। তবে এ মুহূর্তে কিছু মুগ্ধ নয়ন যে ওর দিকে চেয়ে আছে, তা নিশ্চয়ই উপভোগ করছে। হঠাৎ মালা নীচু গলায় বলে উঠল, 'উঃ আবার ওই কেবলুটা এসেছে।'

গৌরী উপেক্ষার ভঙ্গিতে বলল, 'ইগ্‌নোর কর্। আজ দিদিভাই আছে। এমনিতেও তাড়াতাড়ি কেটে পড়বে।' শাওন বুঝতে পারল গৌরীর কোনো স্তাবক কিংবা নীরব প্রেমিক "প্রেমা ভিলাস"-এ এসে জুটেছে। তাও জিজ্ঞেস করল, 'কেবলু কে রে? মালাকে লাইক্ করে বুঝি?' মালা রুমাল দিয়ে গরম কফির স্টিলের গেলাস ধরে চুমুক দিচ্ছিল। ঠক্ করে গেলাস নামিয়ে হাসতে লাগল, 'ধুর! আমাকে কেন? ও তো খালি দিদিকে ফলো করে।'

শাওনের হাসি পেল, 'তোকে ফলো করলে খুশি হতিস?' মালার প্রবল প্রতিবাদ, 'মোটেই না। ও একটা কেবলুরাম!' বেরোনোর সময় দরজার কাছে মালার মৃদু ঠেলা খেয়ে শাওন বুঝল কেবলুরাম ধারে কাছেই বসে আছে। ওকে দেখে নির্ঘাত আজ গৌরীদের পেছন পেছন হাঁটবে না। ওদের বয়সগুলো ভেবে শাওনের নিজের অল্পবয়সের কথা মনে হচ্ছিল। পাড়ার বেবীদির মাসতুতো ভাই চন্দননগর থেকে বেড়াতে এসে কী জ্বালা, জ্বালিয়েছিল! তারপর ইনল্যান্ড লেটারে প্রেমপত্র আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি.....। বাবা হেমন্তকাকুকে বলেছিলেন, 'কী যে সব গান গাস! তোর গানের লাইন লিখে শাওনকে কে যেন প্রেমপত্র দিয়েছে! আমাদের কবিতা লেখা মাঠে মারা গেল।' হেমন্তকাকু হেসে উঠেছিলেন, 'তোর কবিতার লাইন লিখে যে ছেলে শাওনকে প্রোপোজ করবে, তার সঙ্গে ওর বিয়ে দিস।'

সত্যি! দেবাংশুও বাবার কবিতা ভালোবাসে। অবশ্য কবিতা লিখে প্রেমপত্র পাঠায়নি। বাবার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে দেখল অমলকান্তি রানাঘাট থেকে ফিরে এসেছেন। টেবিলে ফুলের তোড়া, মিষ্টির বাক্স। শাওনকে দেখে চশমার আড়ালে তাঁর দুই চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হল, 'আজ আসবি জানাসনি তো! তাহলে আগের গাড়িটায় চলে আসতাম। ফেরার সময় আমিই সকলের শেষে নামলাম।'

'আজ থেকে যাচ্ছি বাবা। কাল দুপুরে ফিরব। তোমাদের সম্মেলন কেমন হল?'

'ওই কবিতা-টবিতা পড়া, আলোচনা, যেমন হয়। তুই একা এলি? দেবাংশু এল না কেন?'

'তার আবার কাল নাটক। বাদল সরকারের "পাগলা ঘোড়া" করছে। রিহার্সাল নিয়ে মহাব্যস্ত! কাল যাবে বাবা?'

'যেতে পারি। কিন্তু গৌরীর পরীক্ষা চলছে...' মন্দিরা বললেন, 'তুমি ঘুরে আসতে পারো। আমি তো বাড়িতে আছি। শাওন, বাবাকে কিন্তু পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করবি। রাতে আজকাল দেখতে অসুবিধে হয়।' অমলকান্তি বললেন, 'পৌঁছোনোর ব্যবস্থা আবার কী করবে? বাসে তুলে দিলেই হবে।'

শাওন বলল, 'কেন? আমরা তোমাকে টাক্সিতে ফেরত পাঠাতে পারি না? চলো বাবা। দেবাংশু ভীষণ খুশি হবে। আগেও একবার বলেছিল। তখন তোমার কী একটা কারণে যাওয়া হল না।

পরদিন দুপুরের খাওয়া সেরে শাওন অমলকান্তিকে নিয়ে ঠাকুরপুকুর চলে গেল। ওর একটু বাবা, মা-র সঙ্গে একা থাকা দরকার। নয়তো গৌরীর সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে না। বেশ বুঝতে পারছে বাড়িতে একটা সমস্যা চলেছে। মা বিরক্ত। বাবাও যেন চাপা অশান্তিতে আছেন। শাওনের জন্যে ওঁদের কত ধৈর্য্য ছিল, উচ্ছাস ছিল। এসব কথা কাল রাতে মাকে বলার চেষ্টা করেছিল। মা বলতে চাইলেন, শাওনের এত জেদ ছিল না। পড়াশোনায় মন ছিল। গৌরীর এর মধ্যে দু-চারটে বয়ফ্রেন্ড হয়েছে। আবার ঘুচেও গেছে। মা শাসন করতে গেলে অশান্তি হচ্ছে। তার ওপর ভালো কোনো অ্যাম্বিশন নেই। কলেজে না গিয়ে সিনেমা করবে বলে জেদ ধরেছে। শাওনের মনে হয়, সমস্যাটা এত প্রবল হত না, যদি না বয়সের জন্যে, শরীরের জন্যে মা এত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে শাওন জিজ্ঞেস করল, 'গৌরী যদি হায়ার সেকেন্ডারির পরে ফিল্ম্-এ কেরিয়ার করতে চায়, তোমরা বাধা দিচ্ছ কেন বাবা?' অমলকান্তি সিটে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। ওইভাবেই উত্তর দিলেন, 'আঠারো বছর বয়সে ওকে এত স্বাধীনতা দিতে মন্দিরা ভয় পাচ্ছে। সত্যেন, কি মৃণালের ছবিতে অভিনয় করা এক কথা। তারা আমার বন্ধু। কিন্তু প্রফেশনে এলে গৌরীকে আরও বহু লোকের সঙ্গে কাজ করতে হবে। এক্সপ্লয়েটেশনের কথাও শুনি।'

'সবই মানলাম। কিন্তু ওর যখন অ্যাকটিং-এর দিকেই ঝোঁক, সুযোগও পাচ্ছে,

তোমরা একটু এন্‌কারেজ করো বাবা। বাড়ি থেকেই তো শ্যুটিং-টুটিং-এ যাবে। আর পরে যদি সেরকম কাজকর্ম না পায়, নিজেই হয়তো কলেজে ভর্তি হতে চাইবে।'

—'তোর মা-র সঙ্গে কথা বল্‌। ওর শরীরের পক্ষেও এরকম টেন্‌শনে থাকা ঠিক নয়।'

যে কথাটা বার-বার শাওনের মনে আসছিল, শেষপর্যন্ত অমলকান্তিকে আর জিজ্ঞেস করে উঠতে পারল না। গৌরীকে নিয়ে ওঁদের মনে কি কোনো আক্ষেপ আছে। হয়তো ওঁদের সেইসময় আর অ্যাডপ্‌শনের পরিকল্পনা ছিল না। শাওনকে নিয়েই ওঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই ব্যস্ত জীবনে আর্থিক অপ্রতুলতার মধ্যেও আবার যে ওঁরা গৌরী আর মালাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিলেন, তা কি ঝোঁকের মাথায় নেওয়া সিদ্ধান্ত? এখন তাই রাগ হচ্ছে, বিরক্তি আসছে, সহজে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছে। নিজে পালিত সন্তান না হলে শাওন প্রশ্নটা করতে পারত। এখন জানতে চাওয়া মানে ওঁদের খুবই আঘাত দেওয়া হবে। শাওন দীর্ঘশ্বাস গোপন করে জানলার বাইরে চেয়ে রইল।

দীর্ঘ পনেরো বছর পরে গৌরী যখন বাংলা ছবির প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী, ব্রেন ক্যানসারে মন্দিরা মারা গেলেন। কবির স্ত্রী চলে গেছেন। সমাজ সেবার জন্যে তাঁর নিজের বিশেষ পরিচিতি ছিল। হাসপাতালে, বাড়িতে খ্যাত, অখ্যাত মানুষের ভিড়ে অরুণ, অপর্ণাও ছিলেন। শুধু গৌরী যাকে খুঁজছিল, সে কোথাও আসেনি। মালা বুঝতে পেরে বলল, 'এখনো আশা করিস? আমি জানি, আমাদের কথা ওকে কখনো বলা হয় নি।' শাওন শুধু বলেছিল আজ এ সব কথা থাক। সেদিন ওর অরুণদের সৌজন্য দেখানোর মতো মনের অবস্থা ছিল না। এ বাড়িতে মা আছেন, জীবনে সেটাই একটা অভ্যাস। মা না থাকা যে কেমন, সেই শূন্যতার কথা ভেবে শোকস্তব্ধ বাবার দিকে চেয়ে সে বুকের ভেতর গভীর বেদনা অনুভব করছিল।

গৌরী এখন এ বাড়িতে থাকে না। কয়েকবছর হল এক প্রোডিউসারকে বিয়ে করে টালিগঞ্জে চলে গেছে। মালা এখনো বিয়ে করেনি। এম.বি.এ. পাশ করে একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে চাকরি করছে। শাওন এই নিঃসম্পর্কের ছোট বোনটির কাছে কৃতজ্ঞ। মাকে মালা অনেক সেবা করেছে বাবা ওর বিয়ে ঠিক করা সত্ত্বেও মার অসুস্থতার জন্যে মালা বিয়েটা স্থগিত রেখেছে। শাওনের মনে হল এবার ওকেই উদ্যোগ নিয়ে মালার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বাবা খুব একা হয়ে যাবেন।

তবে তাঁর তো নিজের জগৎ আছে। লেখা নিয়েই কত সময় চলে যায়।

বিংশ শতকে শোকের আয়ুষ্কাল প্রসঙ্গে একসময় কবি যাই লিখে থাকুন, ব্যক্তিগত জীবনে তার অভিঘাত আরও দীর্ঘস্থায়ী বোধ হল। তবু সময় কিছু ফিরিয়ে দেয়। নিম্নগামী স্নেহ তাঁর অনুভূতিকে আশ্রয় করল। শাওনের ছেলে দুটোর হুড়োহুড়ির বয়স চলে গেলেও গৌরীর ছেলেমেয়ে এখনো ছোট। আজ এরা আসে। তো, কাল ওরা ঘুরে যায়। অমলকান্তির লেখাপত্র শিকেয় ওঠে। গৌরীর আউটডোর শ্যুটিং থাকলে আয়া শুদ্ধু ওদের দুজনকে এ বাড়িতে রেখে যায়। শিউলি আয়াকে রান্নাঘরে ঢোকায়। অমলকান্তির হাত ধরে বাচ্চাদুটো পার্কে বেড়াতে বেরোয়। ওঁর মনে পড়ে এমনি করে যেতে যেতে শাওন হাত ধরে ঝুলে পড়ত। বলত একটু কোলে নাও না বাবা। পা ব্যথা করছে।

এরা কোলে-টোলে উঠতে চায় না। শুধু বকর-বকর আর নানা প্রশ্ন। শাওনের ছোটবেলার বইগুলো ওর ছেলেদের হাতে পড়ে ছিঁড়ে ঝুলিঝুলি হয়ে গেছে। গৌরীর ছেলেমেয়ের জন্যে অমলকান্তি আবার আবোলতাবোল আর হযবরল কিনে এনেছেন। ওঁর পুরোনো বন্ধুরা গল্প করতে আসেন। কেউ বলেন, চলো পত্রিকা অফিসের আড্ডায় গিয়ে বসি। কবি মৃদু হাসলেন, 'কোথায় যাব? এই বেশ আছি।'

ডিসেম্বরে মালার বিয়ের তারিখ ঠিক হল। শুনে গৌরী বলল, 'আমি ওর জন্যে শপিং করে আনব। অক্টোবরে ইউ.এস.এ যাচ্ছি। পুজোর ফাংশনে চার-পাঁচটা শহর থেকে নাটক করতে ডেকেছে। ওখানে তো আবার দু-তিন সপ্তাহ ধরে পুজো চলে।'

মালা জিজ্ঞেস করল, 'তোদের সঙ্গে দীপকদাও যাচ্ছে?'

'না, না। দুজনে বাইরে গেলে বাপ্পা, টুম্পাকে দেখবে কে? ওই সময় দীপকের মা এসে থাকবেন।'

অমলকান্তি জানতে চাইলেন, 'কি নাটক নিয়ে যাচ্ছ?'

'কিছুই ঠিক হয়নি। মেলোড্রামা গোছের কিছু একটা হবে! তবে "নটী বিনোদিনী"ও হতে পারে।'

'কোথায় কোথায় যাচ্ছ?'

'নিউইয়র্ক, বস্টন, হিউস্টন, লস এঞ্জেলস্ আর একটা কোথায় যেন ঠিক জানি

না।'

'ভালো, ঘুরে এসো। পারলে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে যেও। আমার যাওয়া হয়নি। শিকাগোর বঙ্গসম্মেলন থেকে ইস্ট কোস্টে গিয়েছিলাম। পিটাসবার্গে আমার বন্ধুর ছেলে গোগোলের কাছে ছিলাম। অনেক বছর পরে দেখা হয়ে সময়টা বেশ কেটেছিল।'

আমেরিকায় গৌরীদের প্রথম নাটক ছিল নিউইয়র্কে। বিদেশের বাঙালিদের কাছে ওর যে এত জনপ্রিয়তা, না এলে সেভাবে জানতে পারত না। বাংলা সিনেমা পত্রিকা আর ডিভিডি-র দৌলতে বাংলাদেশি দর্শকরাও ওকে চেনে। নটী বিনোদিনীর ভূমিকায় প্রভূত হাততালি পেয়ে গৌরী পরের শো-এর জন্যে বস্টনে গেল। তারপর দক্ষিণে অ্যাটল্যান্টা, হিউস্টন হয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় লস এঞ্জেলেসে।

এ পর্যন্ত আটজনের নাটকের দল কোথাও হোটেলে, কোথাও দুজন করে কোনো বাঙালির বাড়িতে থেকেছিল। কিন্তু গৌরী কলকাতা থেকে জানিয়ে দিয়েছিল, কারো বাড়িতে থাকবে না। একদম প্রাইভেসি থাকে না। কখন একটু ড্রিংক করল, কখন মুখে ফেস্‌প্যাক্ মেখে বসে থাকল, এইসব মুহূর্তগুলো সে নিজের অভ্যাস মতো কাটাতে চায়।

নায়িকা সংবাদ শুনে বস্টনে, নিউইয়র্কে ক্লাবের প্রেসিডেন্টদের বউরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া, মাধবী থেকে শুরু করে রবি ঘোষ, অপর্ণা, তাপস পাল কে না বাঙালির বাড়িতে থেকেছে? শুক্তো, বিরিয়ানি খেয়ে প্রশংসা করে গেছে। আর এ নায়িকা প্রথম থেকে দূরত্বের পাঁচিল তুলে রেখেছে। উদ্যোক্তদের স্ত্রীরা নিরাশ হতেই পারে। গৌরী অবশ্য খুব সৌজন্যের সঙ্গে তাদের বাড়িতে থাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছিল।

লস এঞ্জেলেসে নাটক হয়ে যাওয়ার দুদিন পরে গৌরীদের দেশে ফেরার ফ্লাইট। নাটকের আগের দিন থেকে প্রচণ্ড গলাব্যথা। মাঝরাতে জ্বর এল। হোটেলে ওর পাশের ঘরে দুজন অভিনেতা ছিলেন। পরদিন সকালে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উদ্যোক্তাদের ফোন করলেন। সেদিন রবিবার। ডাক্তার পাওয়া যাবে না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো অসুস্থতা নয়। শেষে চেনা এক বাঙালি ডাক্তারকে ধরে এনে অ্যান্টিবায়োটিক লেখানো হল। ওষুধপত্র খেয়ে গৌরী সন্ধ্যেবেলায় কোনো মতে নাটক উতরে দিল। তারপর উদ্যোক্তদের অনুরোধে হোটেলে থাকার বদলে বাকি দুটো দিন

ঈশিতা নামে একটি মেয়ের বাড়িতে থাকতে রাজি হল।

ঈশিতাদের শহর থেকে সমুদ্র দূরে নয়। প্রশান্ত মহাসাগরের তটরেখার সমান্তরাল পথ ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে ঈশিতা বলল, 'আপনার শরীর ঠিক থাকলে কাল বিচ্-এ নিয়ে যেতাম। ইউনিভার্সাল স্টুডিয়ো, ডিস্‌নিল্যান্ড, কিছুই তো দেখার সময় পেলেন না।' গৌরী ক্লান্ত ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। গলার ব্যথাটা যাচ্ছে না। একদিনের জ্বরেই শরীর অবসন্ন। দুদিন পরে লম্বা প্লেনজার্নি। বাড়ি ফেরার জন্যে মনটা অস্থির হয়েছে। বাপ্পা, টুম্পাকে ছেড়ে এতদিন কোথাও থাকেনি।

গৌরী গলায় শাল জড়াচ্ছে দেখে ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, 'আবার কি জ্বর এসেছে মনে হচ্ছে।'

'জ্বর বোধহয় নেই। একটু টায়ার্ড লাগছে।'

'আপনাদের খুব হেকটিক স্কিজিউল্। কোথাও তো ব্রেক পাচ্ছেন না। এই দুদিন ভালো করে ঘুমিয়ে নিন।'

গৌরী হাসল, 'তাহলে সাইট সিইং করব কখন? ইউনিভার্সাল স্টুডিয়ো কি অনেক দূরে?'

'এখান থেকে কাছে নয়। কাল বিকেলে আমাকে আবার এয়ারপোর্টে যেতে হবে। আপনি যদি যেতে চান, অর্ধেন্দুদাকে ফোন করে দেখি। উনি হয়তো কোনো ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

গৌরী বলল, 'দেখি, কাল কেমন থাকি। তুমি কি আমাকে কাছাকাছি কোথাও শপিং-এ নিয়ে যেতে পারবে?'

'কাল ব্রেকফাস্টের পরে মল্-এ নিয়ে যাব। দুপুর অবধি ফ্রি আছি।'

গৌরী ভাবল মেয়েটি বোধহয় ওর জন্যে কাল ছুটি নিয়েছে। এদেশে কে আর বাড়ি বসে থাকে? বিয়ে হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বাড়িতে কি একাই থাকে?

পিচের ড্রাইভ-ওয়ের দুপাশে রক্তকরবীর গাছ। দরজার একধারে টবে বড় বড় ঝুমকো জবা ফুটে আছে। নিউ ইয়র্ক, বস্টনে, বোধহয় এসব গাছ হয় না। ওদিকের ওয়েদার অন্যরকম। বাসে করে বস্টন যাওয়ার পথে দুধারের বনজঙ্গলে হেমন্তের ফল্ কালার দেখতে দেখতে গিয়েছিল। গাছে গাছে লাল, হলুদ, কমলা রঙের পাতার বাহার। দিদিভাই দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেত।

পাম গাছের সারির আড়ালে ঈশিতার ছোট দোতলা বাড়ি। কাচের দরজার বাইরে এক চিলতে বারান্দা। ভেতরের ঘরে গৌরীকে বসিয়েও সুটকেসটা সিঁড়ির ধারে রাখল। ঘরের আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল—

'এত রাতে আবার ঝামেলা করবে?'

'ঝামেলা আবার কী? জাস্ট্ মাইক্রোওয়েভে গরম করে দেব।'

'একটু স্যুপ খেতে পারি। আর কিছু ইচ্ছে করছে না।'

'তাহলে কিচেনে চলুন। নাকি আগে জামাকাপড় চেঞ্জ করবেন?'

'দরকার নেই। শোওয়ার আগে পালটে নেব।'

রান্নাঘরে টেবিলে বসে স্যুপ খেতে খেতে ওরা কথা বলছিল। গৌরীর চোখে পড়ল দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবিতে ঈশিতার পাশে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। অনুমান করল ওর বর হতে পারে। তাও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে একা থাকো।'

ঈশিতা হেসে উত্তর দিল, 'না, না। আমার হাজবেন্ড অফিসের কাজে সিয়াটল গেছে। কাল সকালে মিটিং আছে বলে আজ ফিরতে পারলো না। কাল বিকেলে ওকে আনতেই এয়ারপোর্টে যাব।'

গৌরী হাই তুলছে দেখে ঈশিতা বলল, 'আর গল্প নয় এবার শুতে চলুন। ঘরে এ. সি. চলবে? না জানলা খুলে ফ্যান চালিয়ে দেব?'

'এ.সি. দরকার নেই। ফ্যানও লাগবে কিনা দেখি।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি নিঝুম। গৌরীর ঘুম আসছিল না। উঠে অ্যাটিভ্যান ট্যাবলেট খেল। এটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। পরদিন যখন ঘুম ভাঙল দেওয়ালের ওপর দিকে লম্বা স্কাইলাইট দিয়ে সকালের রোদ আসছে। গলার চিন্‌চিনে্ ব্যথা আর নেই। বেশ ঘাম হচ্ছে। মাথা সামান্য ভার। গৌরী হাত বাড়িয়ে সাইড টেবিলে রাখা গেলাস থেকে জল খেল।

ম্যাক্‌ডোল্যান্ড-এ ব্রেকফাস্ট সেরে ওরা শপিং মলে পৌঁছেল। গৌরী তার লিস্ট মিলিয়ে কেনাকাটি করছে। ঈশিতা ভাবছিল এত জিনিস উনি নেবেন কোথায়? বোনের বিয়ের বাজার করছেন বলে ডজন খানেক পারফিউম?

বাড়ি ফিরে লাঞ্চের পরে গৌরী খানিকক্ষণ সুটকেস গোছাল। এক সময় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। তিনটে নাগাদ ঈশিতা এয়ারপোর্ট বেরিয়ে গেল। ওরা যখন ফিরে

এল গৌরী তখন সেজেগুজে বসে টিভি দেখছে।

ঈশিতা পরিচয় করাল—'আমার হাজবেন্ড অর্ণব। ইনি গৌরী চ্যাটার্জি।'

চশমা পরা কালো যুবকটির গালে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। গৌরীকে হাত জোর করে বলল, 'নমস্কার।' ভদ্রতাসূচক একটা-দুটো কথা সেরে দোতলায় উঠে গেল। ঈশিতা সোফায় এসে বসল, 'একটু পরে ডিনার দেব। তার আগে কোনো ড্রিংক নেবেন? অর্ণব এসে বানিয়ে দেবে।'

গৌরী বলল, 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তোমরা ড্রিংক নিলে আমি জিন কিংবা ভদকা নিতে পারি।'

রাতের খাওয়ার আগে ড্রিংক নিয়ে বসে ওরা গল্প করছিল। কলকাতার কত পরিবর্তন হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে ফ্ল্যাট কালচারের কথা উঠল। অর্ণব বলছিল, 'আমাদের পাড়ায় এখনো তবু কয়েকটা পুরোনো বাড়ি রয়েছে।'

গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আপনাদের বাড়ি?'

'সাউথে। এলগিন রোডে।'

গৌরী কেমন চমকে উঠল, 'কোথায়? এলগিন রোডের কোথায়? ওখানে অরুণ সান্যালদের চেনেন?'

অর্ণব হাসল, 'আপনি ওঁদের চেনেন নাকি?'

'আমার মাসিদের সঙ্গে চেনাশোনা ছিল। কবি অমলকান্তি চট্টোপাধ্যায় আমার মেসোমশাই।'

'স্ট্রেঞ্জ! ওয়ার্ল্ড ইজ সো স্মল! আপনারা কোথায় থাকেন?'

গৌরী সে প্রশ্নের উত্তর দিল না। তার নিজের মনে হাজার প্রশ্ন জমে আছে। অর্ণবের কাছে হয়তো তার কিছু উত্তর পাওয়া যাবে। হাতের গেলাস নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের বাড়িতে একটি ছেলে থাকত। মানিক। তার কোনো খবর জানেন?'

ঈশিতা অবাক, 'ওর নামই তো মানিক!'

অর্ণবের চোখে বিস্ময়, 'আপনি কি আমাদের চিনতেন? আমি তো ঠিক মনে করতে পরছি না...।'

আবেগে উত্তেজনায় গৌরীর গলার স্বর কাঁপছে, 'মানিক, আমি তোমাকে তিন বছর বয়সের পরে আর দেখিনি। সে তোমার মনে থাকার কথা নয়। আজ এত বছর পরে দেখে চিনতেও পারিনি।'

গৌরী তখনও নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছিল।

ঈশিতা ভাবছিল উনি হঠাৎ এমন ইমোশন্যাল হয়ে পড়লেন কেন? মদ্যপান কি বেশি হয়ে গেছে? কিন্তু অর্ণবের ডাক নাম জানলেন কী করে?

অর্ণব বিভ্রান্ত। কে এই মহিলা? কাঁদছেন কেন? ও জিজ্ঞেস করল,

'আমাকে আপনি তিন বছর বয়সে কোথায় দেখেছিলেন?'

'তখন তুমি যেখানে ছিলে। কিছু কি মনে আছে তোমার?'

'খুব ছোটবেলায় অরফ্যানেজে ছিলাম। আপনি কি তখন দেখেছিলেন? হঠাৎ আমাকেই-বা আপনার মনে থাকবে কেন?'

গৌরীর জীবনে এক অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ঘটে গেছে। কত বছর ধরে ওরা পথে ঘাটে, ছেলেদের স্কুলের সামনে ভাইকে খুঁজেছে। যদি একবার দেখা হয়। শাওন ভরসা দিত একদিন না একদিন দেখা হবেই। আজ সব খোঁজা শেষ হল। সেই মানিক চোখের সামনে বসে আছে। বিশ্বাস হয় না।

গৌরী উত্তর দিল, 'মানিক তুমি আমার ছোট ভাই। আমার তখন আট বছর বয়স—।'

অর্ণবের গলার স্বরে প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস, 'আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন। আমি শুনেছি, আমার কোলে ভাইবোন ছিল না।'

'সেটা তোমাকে বোঝানো হয়েছিল। অরফ্যানেজটা ছিল কলকাতার কাছে। মাধবপুরে। অমলকান্তির স্ত্রী মন্দিরা সোস্যাল ওয়ার্ক করতেন। ওঁর রেফারেন্সে অরুণ সান্যালেরা তোমাকে অ্যাডপ্ট্ করেছিলেন। কিন্তু আশ্রম থেকে অনেক রিকোয়েস্ট করা সত্ত্বেও ওঁরা আমাদের দুইবোনকে নিতে রাজি হননি। আমার বোন মালার তখন ছ'বছর বয়স। আমাদের সঙ্গে ওরা তোমার কোনো সম্পর্ক রাখতে দেননি। অনাথ আশ্রম থেকে নিয়ে আসে আমাদের মানুষ করেছিলেন মন্দিরা মাসিমা আর মেসোমশাই।'

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কথাগুলো জাস্টিফাই করতে পারেন, এমন

কেউ আছেন?'

গৌরী থমকে গেল। এরা কি ওকে অবিশ্বাস করছে? সন্দেহ করছে, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে গৌরী মানিকের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবী করছে?

গৌরী উত্তর দিল, 'এখনো মেসোমশাই বেঁচে আছেন। উনি বিখ্যাত মানুষ। কলকাতার কবি, সাহিত্যিকরা ওঁর বন্ধু। অনেকে ঘটনাটা জানেন। নয়তো অরুণ সান্যালদের জিজ্ঞেস করতে পারো। ওঁরা কি এই বয়সেও মিথ্যে বলবেন? মানিক যে অ্যাডপ্‌টেড, সেটা নিশ্চয়ই ওঁরাই বলে দিয়েছিলেন? তবু, এত বড় সত্যি কথাটা লুকিয়ে রাখলেন?

অর্ণব স্তম্ভিত। কার কথা বিশ্বাস করবে? এতদিন যা জেনেছে, সেটাই সত্যি বলে ভেবেছে? স্কুলের উঁচু ক্লাসে থাকতে বাবা ওকে অ্যাডপশানের কথা জানিয়েছিলেন। শুনে খুব আঘাত পেয়েছিল। তারপর ব্যাঙ্গালোরে পড়তে গেল। কলেজ হস্টেলের সেই মনখারাপের দিনগুলোয় কতবার ভেবেছে বাবার কাছ থেকে জোর করে অরফ্যানেজের ঠিকানা চেয়ে নিই। সেখানে গিয়ে দেখি, আমার নিজের মাকে কেউ চিনত কিনা। সে সব দিনে কলকাতার বন্ধুরাও কেউ পাশে ছিল না। কত রাত নির্ঘুম কেটে গেছে। এ মহিলা কি সত্যিই ওর দিদি? বাবা কেন এদের কথা লুকিয়ে রেখেছিলেন? এ মুহূর্তে সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। অর্ণবের মনে হল, আজ হয়তো বাবা ওকে সত্যি কথা বলবেন। অর্ণব ঘড়ি দেখল। কলকাতায় অনেকক্ষণ সকাল হয়ে গেছে।

সেদিন বিকেলে লস এঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে গৌরীকে নিয়ে অর্ণবরা যখন পৌঁছাল, তখন চেক-ইন কাউন্টারে ভিড় হয়নি। নাটকের দলও এসে পৌঁছোয়নি। চেক-ইন-এর সময় ঈশিতা যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। গৌরীর সুটকেসের ওজন অনেক বেশি হয়ে গেছে। তার জন্যে যা বাড়তি ভাড়া দিতে হবে, গৌরীর কাছে অত ডলার নেই। ক্রেডিট কার্ডও নেই। তাহলে সুটকেস খুলে জিনিস কমাতে হবে। গৌরী নার্ভাস হয়ে বলল, 'এখন তাহলে কী করবো? আমাদের গ্রুপ-এর কাউকে দেখছি না। ওদের কাছে নিশ্চয়ই পেয়ে যাব।'

অর্ণব এগিয়ে গিয়ে পেমেন্ট করে দিলো। কাউন্টার থেকে গৌরীর পাসপোর্ট, বোর্ডিং কার্ড তুলে নিয়ে বলল,

'ফ্লাইটের এখন অনেক দেরি। লাউঞ্জে কফি খেতে চলুন।'

লাউঞ্জে বসে গৌরী এদিক ওদিক দেখল, 'ওরা এখনো এল না কেন বলো তো? সমীরদার কাছে ক্যাশ পেয়ে যেতাম।'

অর্ণব হাসল, 'এত টেনশন করছেন কেন? একসেস্ লাগেজের চার্জটা আমাকে ফেরত দেবেন বলে? নাকি একা ট্র্যাভেল করতে হবে ভেবে নার্ভাস?'

গৌরী হেসে ফেলল, 'দুটোই ঠিক। দলের সঙ্গে এসেছি। দলের সঙ্গে ফিরব। তার আগে তোমার ডলারগুলো শোধ করে দিতে চাই।'

ঈশিতা গৌরীর হাত ছুঁয়ে বলল, 'প্লিজ, সে চেষ্টা করবেন না। কারণটা এক্সপ্লেন করতে চাই না। দেখছি অলরেডি কান্নাকাটি শুরু করেছেন।'

অর্ণবের বলতে ইচ্ছে হল আপনার কাছে আমার অনেক ঋণ। এত বছর পরেও তো জানতে পারলাম আমি অবাঞ্ছিত সন্তান ছিলাম না। আমার মা ছিলেন। বাবা ছিলেন। এই বিশ্বসংসারে এখনো আমার রক্তের সম্পর্কের আপনজন আছেন।

সিকিউরিটি গেট-এর সামনে নাটকের দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গৌরী বলল, 'চললাম। ভালো থেকো।' অর্ণব হাত তুলল, 'দেশে গেলে দেখা হবে?'

অন্ধকার আকাশ পথে রাতের প্লেন উড়ে চলেছে। যাত্রীরা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। গৌরী জেগে আছে। গতরাতে তীব্র অনুভূতি আর জেগে থাকার ক্লান্তির পরে এ মুহূর্তে মনে এক আশ্চর্য প্রশান্তি। শৈশবস্মৃতি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে তারা গাইছে 'তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু তোমার আশীর্বাদ'। হাত জোর করে দাঁড়ানো ছোট্ট রোগা ছেলেটার গলায় কালো সুতোয় বাঁধা মাদুলি। গৌরী নিঃশব্দে উচ্চারণ করল, 'মানিক তুই ভালো থাক। সুখে থাক।'

———

স্মৃতি ভবন ও জীবন

বাগানের কাঠের চেয়ারে বসে খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বাবা বললেন, 'বসন্ত এসে গেছে।'

বাবা মাঝে মাঝে এমন করে কথা বলেন। কখনো কবিতার এক লাইন। কখনো গানের কথা। কখনো গীতা, উপনিষদের শ্লোক। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরিজি, উর্দু শায়েরী, সময় বুঝে যখন যেমন তাঁর মনে আসে। আমরা ভাইবোনেরা নাম দিয়েছি "কোনেশন মাস্টার"। বাবা হেসে বলেন, 'কলেজে মাস্টারি করতে করতে এসব হয়েছে!'

এই যে এপ্রিলের শেষে গাছে গাছে অজস্র পাতা এসেছে, গোলাপি ফুলের ভারে চেরি গাছ নুয়ে পড়ছে, মাটি থেকে নীল টিউলিপ্ মাথা তুলেছে, বাবা যেন সে খবর জানালেন।

মা চলে যাওয়ার পরে বাবা এই প্রথম আমাদের কাছে এলেন। রিটায়ার্ড জীবনে কাজের চাপ, সংসারের দায়িত্ব কিছু ছিল না। পড়াশোনা, মাঝেমধ্যে লেখালেখি, এই নিয়েই থাকেন। আমার বোন সুতপা শিকাগো থেকে কলকাতায় গিয়েছিল। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছে। এখন বাবা আছেন আমাদের কানেটিকাটের বাড়িতে।

"নিউইয়র্ক টাইমস্"-এর পাতা খুলে রেখে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'ডেরেক ওয়াল্‌কটের একটা-দুটো বই এনে দিতে পারবি? আজ ওঁর সম্পর্কে অবিচ্যুয়ারি কলামে বেশ ডি-টেল লিখেছে।'

ক্যারিবিয়ানের কবিদের লেখা বেশি কিছু তো পড়িনি। বললাম, 'কাল ইভনিং নিউজ-এ খবরটা দেখলাম। উনি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে ওর দুটো কবিতার বই এনে পড়েছিলাম। কারিবিয়ান ক্রুজে গিয়ে সেন্ট লুশিয়া ঘুরেও এসেছি। ওই দ্বীপের সঙ্গে যেন ডেরেক ওয়ালকটের নাম জড়িয়ে রয়েছে। দেখি, ড্যানিয়েলকে বলে লাইব্রেরি থেকে "ওমেরস" আর "দ্য সি ইজ্ হিস্ট্রি" আনিয়ে দেব। বস্টন

থেকে ঘুরে আসি আগে, তারপর।'

কিন্তু সেই বসন্তে আর ম্যাসাচুয়েট্‌স্‌ যাওয়া হল না। জুন মাসে সবাই মিলে শিকাগোয় গেলাম। সুতপার ছেলে হাইস্কুল শেষ করে নর্থ-ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাচ্ছে। ওর হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েশন পার্টির জন্যে যাওয়া। বাবার ইচ্ছে ওর কলেজ ক্যাম্পাস দেখে আসেন। বাবার বন্ধুর ছেলে দ্যুতিমানও কয়েকদিনের জন্যে ওঁকে ইন্ডিয়ানায় গিয়ে গেল। আমরা ওয়েস্টপোর্টে ফিরে এলাম।

সুতপাদের কাছে প্রায় অর্ধেক সামার কাটিয়ে বাবা ফিরে এলেন যখন আমারও তখন স্কুল খোলার সময় হয়ে আসছে। তারপর দুর্গা পুজো এলো। এদিকে বাঙালি কম। ছোট ক্লাবের ছোট পুজো। একদিনে চারদিনের দুর্গা পুজো সারা হচ্ছে দেখে বাবা বললেন, 'তোদের ক্লাবটার নাম দে "সারাংশ"। আমি আর কি চন্ডিপাঠ করব? সিডিতে বীরেন ভদ্র চালিয়ে দে।'

ড্যানিয়েল আমাদের প্রতিবেশী । ওর স্বামী স্টীভ এখানকার হাসপাতালে আমার স্বামী সুবীরের মতোই অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান। আমাদের দুই মেয়ে তৃষা, তৃণা ওদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্কুলে পড়েছে। এখন সবাই দূরের কলেজে। তৃষা তো কলেজ পাশ করে স্যানফ্র্যানসিসকোয় চাকরি করছে। দুজনেই ছুটিতে এসে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করে গেছে।

ড্যানিয়েল লাইব্রেরিতে পার্ট টাইম কাজ করে। আমার কথামতো বাবার জন্যে ডেরেক ওয়ালকটের কয়েকটা কবিতার বই এনে দিয়েছিল। সকাল, বিকেল একটু হাঁটতে বেরোনো। বাকি সময়টা বইপত্র পড়েই বাবার কেটে যায়। এক সময় শুনতে পাই ডেরেক ওয়ালকট-এর "লাভ আফটার লাভ" কবিতার বই থেকে পড়ছেন—"দ্য টাইম উইল কাম

হোয়েন, উইথ ইলেশন
ইউ উইল্‌ গ্রীট্‌ ইয়োরসেলফ্‌ অ্যারাইভিং
অ্যাট ইয়োর ওন্‌ ডোর ইন ইয়োর ওন মিরর।'

বাবাকে রসিকতা করে বলি—এ তো ব্যর্থ প্রেমের কবিতা! বাবা উত্তর দেন—জীবন যেরকম। শেষ পর্যন্ত সেই তো নিজের কাছে ফিরে আসা।

শীতের আগেই বাবাকে নিয়ে ম্যাসাচুয়েট্‌স বেড়াতে গেলাম। বস্টন শহর,

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ঘুরে দেখার পর বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এখান থেকে কন্‌কর্ড জায়গাটা কি খুব দূরে?'

বাবা ছিলেন ফিলসফীর প্রফেসর। কনকর্ড সম্পর্কে আগ্রহের কারণটা বুঝেছিলাম। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক র‍্যালফ্ ওয়াল্ডো এমার্সন কনকর্ডে থাকতেন। তাঁর বাড়িটা এখন মিউজিয়াম। বাবার সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে হোয়েছিল। আমরা হোটেলে একরাত বিশ্রাম নিয়ে পরদিন সকালে কনকর্ডে এমারসনের বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম।

তখন টুরিস্টদের তেমন ভিড় ছিল না। বাবার ইচ্ছে অনুযায়ী আমরা প্রথমে গিয়েছিলাম ওয়ালডেন-এ। বাবা হেনরী ডেভিড মরোর "ওয়ালডেন" বই-এর "পন্ড্ ইন্ উইন্টার" থেকে একটি অংশ বলতে শুরু করেছিলেন। থরো এখানে থাকতেন। বাড়ির কাছেই পুকুর। ওয়ালডেন পণ্ড্। এখনও তাঁর বাড়ি, সেই পুকুর সবই রয়েছে।

দেড়শো বছরেরও বেশি আগে প্রত্যেক শীতকালে জমাট বাঁধা পুকুর থেকে বরফভেঙে দেশবিদেশে চালান দেওয়া হত। আমাদের দেশেও চালান যেত।

ওয়ালডেন পণ্ড্ থেকে শ্রমিকদের বরফ ভাঙা দেখে থরো লিখেছিলেন— দেখে দেখে ভাবি ম্যাড্রাস্, বম্বে আর ক্যাল্‌কাটার তাপদগ্ধ মানুষেরা এই একই উৎস থেকে জলপান করছে। প্রতিদিন সকালে আমি আমার মনন ও চিন্তাকে ভগবত্‌গীতার পরমাশ্চর্য সৃষ্টিতত্ত্বমূলক দর্শনে অবগাহন করাই। তারপর একসময় বই রেখে দিয়ে জলের জন্য কূয়োর ধারে যাই।...কল্পনায় দেখি ওয়ালডেনের শুদ্ধ জল গঙ্গার পবিত্র জলের সঙ্গে মিশে গেছে।

ওয়ালডেন পণ্ড দেখে ফেরার সময় বাবা বললেন, 'এই যে ওয়ালডেনের জল আর গঙ্গার জলের মিশে যাওয়ার তুলনা, এর মধ্যে দিয়েই হেনরি ডেভিড মরোর ভিশন্‌কে উপলব্ধি করা যায়।'

ক্রমশ বেলা বাড়ছিল। গাছপালায় ঘেরা গ্রামাঞ্চলের মতো পরিবেশে এমারসনের বহু পুরোনোকালের দোতলা বাড়িটি দূর থেকে চোখে পড়ল। বাগানে হেমন্তের ঝরাপাতা পায়ে পায়ে মাড়িয়ে বাবা বাড়িটায় ঢুকলেন। আমরা দরজা পার হয়ে ভেতরের বারান্দায় যেতে একটি মেয়ের গলা শুনতে পেলাম, 'এমারসন লিভড্ হিয়ার ফ্রম এইটিন থার্টিফাইভ আন্‌টিল্ হিজ্ ডেথ্। দ্যাট ওয়াজ এইটিন এইটি টু...।'

মেয়েটি তাহলে টুর গাইড। এখন অক্টোবরের প্রথমে ভাঙা সিজনে অল্প কয়েকজন টুরিস্ট পেয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছে। আমরা কাছে যেতে তার কথা থেমে গেলো। বাবার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, 'হ্যালো!' তারপর টুরিস্টদের বলল, 'এসো, দোতলায় যাওয়া যাক।' সে আমাদেরও সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ডাকলো।

কাঠের লম্বা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে ভাবছিলাম মেয়েটি বোধহয় বাঙালি। আজ পর্যন্ত এদেশে কোনো বাঙালি মেয়েকে টুর গাইড-এর কাজে দেখিনি। তাও আবার বস্টন থেকে চব্বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে কনকর্ডের মিউজিয়ামে কাজ করছে। কী জানি, হয়তো ছাত্রী-টাত্রি হবে। কিন্তু এখন তো সামার-এর ছুটি নয় যে, সামার জব নিয়েছে। কাছাকাছি সব ইউনিভার্সিটিতেই ফল সেমেস্টার শুরু হয়ে গেছে। তাছাড়া মেয়েটির বয়সও অত কম মনে হয় না। হয়তো ছোট মিউজিয়ামে কিক্ষরেটরের চাকরি নিয়েছে। টুর দেওয়াও ওরই দায়িত্ব।

বাবাকে যেন অন্যমনস্ক দেখলাম। দোতলায় উঠে মেয়েটি আমাদের নিয়ে এমারসনের শোবার ঘর, তাঁর ছেলেমেয়েদের খেলার ঘর, বইপত্রে ঠাসা পড়ার ঘর, সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল। বইগুলো দেখতে দেখতে বাবা বললেন, 'এমারসনের ফিলোসফী অফ্ ইন্ডিভিজুয়্যালিজম, ফ্রিডম অ্যান্ড সেলফ্ রিলায়েন্স' ...বাবার মৃদুস্বর ছাপিয়ে মেয়েটির কথা কানে এল—'হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন, অর ওয়ান অফ্ দ্য ফার্স্ট পিপল্ টু ফার্স্ট থিংকিং আউট সাইড দ্য বক্স্, উইথ হিজ হোল্ ট্র্যান্সেন্ডেন্ট্যালিজম্ অ্যান্ড, লাইক গড অ্যান্ড নেচার অ্যান্ড অল্ দ্যাট...'

দেখলাম বাবা ওর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ওর দার্শনিক কথাবার্তার জন্যে? নাকি বিস্ময়ের অন্য কোনো কারণ ঘটেছে? মেয়েটিই বা প্রথমে ওরকম অবাক ভাব দেখিয়েছিল কেন? ওকি বাবাকে আগে কখনো দেখেছে? তাহলে তো চেনার কথা। কিন্তু ব্যবহারে কিছুই বুঝতে দিল না।

বাড়ির যে গেস্টরুমে বহুবছর আগে আমেরিকান দার্শনিক ও লেখক হেনরি ডেভিড থরো সপরিবারে এসে থাকতেন, মেয়েটি আমাদের সেখানেও নিয়ে গেল। দেখলাম চেয়ারে বসে একজন আমেরিকান পুরুষ ফোনে কথা বলছে। মেয়েটি এই ঘরের ঐতিহাসিক মূল্য-টুল্য বোঝাতে চাইলেও, লক্ষ্য করলাম পুরোনো চেস্ট-অফ্ ড্রয়ারের মাথায় এ যুগের কিছু দরকারি জিনিসপত্র রাখা আছে। লোকটি আমাদের

হ্যালো বলে বেরিয়ে যাওয়ার পরে মেয়েটি হেসে বলল, 'হেনরি ডেভিড থরোর স্মৃতি ঘেরা এই ঘরে এখন আমি থাকি। মিউজিয়মের কেয়ার টেকার হিসেবে এখন এটাই আমার বাড়িঘর।'

বিকেল হয়ে আসছে। পাঁচটায় মিউজিয়ম বন্ধ হওয়ার আগে আমরা একটা কাচের বয়ামে টিপ্‌স্‌ হিসেবে কুড়ি ডলার রেখে বেরিয়ে আসছিলাম। মেয়েটি হঠাৎ বলল, 'ক্যান ইউ প্লিজ স্টে ফর আ হোয়াইল?' তারপর বাকি টুরিস্টদের বিদায় জানিয়ে বাবার কাছে এসে দাঁড়াল। সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করলো—'আমাকে আপনার মনে আছে স্যার? ফিলসফী অনার্সের সুজয়া। সুজয়া মিত্র।'

বাবা মাথা নাড়লেন, 'দেখে চেনা মনে হয়েছিল। নামটা মনে পড়ছিল না। তুমি তো পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করে কোথায় পড়াতে গিয়েছিলে না?'

'হ্যাঁ, বাঁকুড়ায় চাকরি পেয়েছিলাম।'

'তারপর, এদেশে এলে কবে?'

বাবার কথাবার্তায় দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে একটু তাড়া দিতে হল, 'মিউজিয়ম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বাবা। আমাদের এবার ফিরতে হবে।'

সুজয়া ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আপনারা কোথায় ফিরবেন? বস্টনে? একটু সময় থাকলে আমার ঘরে বসে কফি খেয়ে যান না? আমার ওয়ার্ক আওয়ার শেষ। কতবছর পরে ডঃ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হল। প্রথমে চিনতে একটু সময় লেগেছিল। মানে, এত বছর পরে, ঠিক এখানে আপনাকে দেখব...' ওর কথার মাঝখানে বাবা বললেন, 'সে তো হতেই পারে। কিন্তু আমাদের কি আর বসার সময় হবে?'

আমি সুবীরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে আধঘণ্টা পরে স্টার্ট করি? বাবার একটু কফি ব্রেক হয়ে যাবে।'

সুবীর বলল, 'ঠিক আছে। আমারও একটু কফি পেলে মন্দ হয় না।'

সুজয়া "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ভেতরে চলুন" বলতে বলতে আমাদের একটা ছোট বসার ঘরে নিয়ে গেল। বাড়ির মেইন দরজা বন্ধ করে গ্যারাজ সংলগ্ন ছোট রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। তার মানে কেয়ারটেকার হিসেবে প্রধান বাড়ির বড় কিচেনে নয়, এই ছোট্ট কিচেন কাম ডাইনিং রুমে ও রান্না খাওয়া সারে। তারপর এই নির্জনে এত বড় বাড়িটার গেস্টরুমে রাত কাটায়। কোথায় কলকাতা, কোথায় বাঁকুড়া, ভাসতে ভাসতে এতদূরে চলে এসেছে?

বাবার মনেও বোধহয় এসব প্রশ্ন জেগেছে। সুজয়া ঘরে আসার আগে বাবাকে নিচু গলায় সতর্ক করলাম, 'তুমি ওকে বেশি পার্সোন্যাল কথা জিজ্ঞেস কোরো না।'

বাবা যেন বিরক্ত হলেন, 'পুরোনো ছাত্রীকে পড়াশোনার কথা ছাড়া কীই-বা জিজ্ঞেস করব?'

সুবীর বাবার কথায় সায় দিল, 'ঠিকই তো। লোকজনের ব্যাপারে এমনিতেই আপনার কৌতূহল কম। তার ওপর সকাল থেকে থরো আর এমারসনের তীর্থস্থানে ঘুরছেন! আসলে নীপাই এখন একটা স্টোরি লাইন খোঁজার চেষ্টা করছে।'

আমি সুবীরকে কিছু বলার আগেই সুজয়া কফির ট্রে নিয়ে ঘরে এলো। টেবিলের ওপর ট্রে রাখতে রাখতে বলল, 'সরি, ক্র্যাকার আর বাদাম ছাড়া কিছু দিতে পারলাম না।'

বাবা বললেন, 'দুপুরের লাঞ্চ এখনও হজম হয়নি। এখন কফি ছাড়া কিছু নয়।

আমার ওয়ার্নিং শুনে বাবা সুজয়াকে যে ঠিক কি জিজ্ঞেস করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। কফির মাগ হাতে নিয়ে বললেন, 'তুমি কি এদেশে ডক্টরেট করেছ? কোন ইউনিভার্সিটিতে?'

সুজয়া মাথা নাড়ল, 'পি এইচ ডি করতে আসিনি। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদা স্পনসর করে নিয়ে এসেছিলেন। হিউস্টনে ট্র্যাভেল্ এজেন্সীতে চাকরি করতাম। তারপর ঘুরতে ঘুরতে বস্টনে। পী-বডি মিউজিয়ামে পার্ট টাইম কাজ পেয়েছিলাম। কিছুদিন করেছি। কিন্তু কিউরেটরের চাকরি জন্যে যা কোয়ালিফিকেশন দরকার, সে সব তো আমার নেই। মাঝে কয়েকটা কোর্স নিয়েছিলাম। কমপ্লিট করতে পারিনি।' আমি বলালাম, 'এ কাজটা নিশ্চয়ই ভালো লাগছে? নয়তো শহর ছেড়ে এখানে থাকবেন কেন?'

সুজয়া হাসল, 'ইন এ ওয়ে, ইউ আর রাইট। কেয়ারটেকার হিসেবে কাজের চাপ তো খুব নেই। শুধু ক্লিনিং-এর কাজটা সন্ধ্যের পরে শুরু করতে হয়। তখন আমি দারোয়ান, ক্লিনিং লেডি, সব কিছু। তাও একজনের হেল্প পাই।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—'কিন্তু সিকিউরিটির ব্যবস্থা কী? তুমি একা মেয়ে, এই নির্জন পাড়ায় থাকো। রাতে ভয়-টয় নেই তো?'

দরজা দিয়ে সেই আমেরিকান লোকটি ঘরে এলো। আমাদের দেখে একটু হেসে সুবীরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'হাই, আয় অ্যাম শন্।'

সুজয়া পরিচয় করালা, 'হি ইজ দ্য ল্যান্ড স্কেপার অফ্ দিস্ প্রপার্টি, অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড। শন, মিট মাই কলেজ প্রফেসর ডঃ গোস্ওয়ামি অ্যান্ড হিজ্ ফামিলি।'

সুবীরের সঙ্গে আলাপ করার পর শন বাবার। কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়াল। বাবা ইতস্ততভাবে 'হাউ আর ইউ' বলে চুপ করে গেলেন।

কফি নিয়ে বসে শন জিজ্ঞেস করল আমরা কোথা থেকে এসেছি। সুজয়ার সঙ্গে এদেশে আগে কখনো দেখা হয়েছিল কিনা, এইসব মামুলি প্রশ্ন। বাবার বোধহয় ওর উচ্চারণ বুঝতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। আমরাই কথাবার্তা বলছিলাম। শন কথায় কথায় জানাল এই মিউজিয়ম সংলগ্ন জমি, বাগান দেখাশোনার জন্যে কন্ট্র্যাক্ট পেয়ে এসেছে। ল্যান্ডস্কেপি ওদের পারিবারিক ব্যবসা। কাছাকাছি আরও কয়েকটা পুরানো বাড়ির বাগান দেখাশোনার কাজও করছে। শীতকালে বরফ পরিষ্কার করার কন্ট্র্যাক্ট নেয়। দু-একজন লোক নিয়ে সারাবছর এই ব্যবসা চালায়।

সুবীর জিজ্ঞেস করলো—'তোমরা বোধহয় নিউ ইংল্যান্ডের এই অঞ্চলেরই লোক?'

শন উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, প্রায় কয়েক জেনারেশন ধরে কাছাকাছি শহর গুলোতেই আত্মীয়স্বজনরা রয়েছে। আমি উইক্ এন্ডে কুইন্সি শহরে বাবা, মা-র কাছে ঘুরে আসি। সারা সপ্তাহে বাড়িতে সুজির সঙ্গে থাকি, অ্যাজ হার কম্প্যানিয়ন।'

সুজয়া যেন শনের শেষ কথাটায় একটু অসোয়াস্তি বোধ করল। 'বন্ধু' আর 'কম্প্যানিয়ন' শব্দ দুটো পার্থক্য বাবা কী বুঝলেন জানি না। আমরা আর কথা না বাড়িয়ে এখান থেকে ফেরার জন্যে উঠে পড়লাম। একঘণ্টার আলাপে কে আর সুজয়ার জীবনযাপন নিয়ে মাথা ঘামায়?

চলে আসার সময় সুজয়া বলল, 'কি অদ্ভুতভাবে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি যে প্রথমে স্যারকে ঠিক চিনতে পারিনি তা নয়। কিন্তু টুরের মাঝখানে লোকজনের সামনে ব্রেক নিতে পারিনি, মিউজিয়ম বন্ধ করার সময় হয়ে যাচ্ছিল...'

বললাম, 'এটা আপনার প্রফেশন। আমরা কিছু মনে করিনি। তাও তো একটু বসলাম। কফি খাওয়া হল।'

সুজয়া আন্তরিকভাবেই বলল, 'এই ছোট্ট মিউজিয়ম দেখতে কেউ তো

দ্বিতীয়বার আসে না। তাই, আবার আসবেন, সে কথাটাও বলতে পারছি না। তাছাড়া, চাকরিটাও কতদিন থাকবে জানি না।'

বাবা জিগ্যেস করলেন, 'এটা কী সরকারি চাকরি?'

সুজয়া হেসে উঠল, 'না, না। একজন কড়া মহিলার কাছে আমরা চাকরি করি। তাঁর নাম বে এমারসন্ ব্যানক্রফ্ট। তিনি হচ্ছেন র‍্যালফ্ ওয়াল্ডো এমারসনের নাতনির নাতনি। এঁরাই এই বাড়ির মালিক। বস্টনে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ লোক পাঠিয়ে খোঁজ নেন মিউজিয়মের কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে কিনা। তবে খরচপত্রের ব্যাপারে বেশ উদার। মাঝে মাঝেই তাঁর কাছ থেকে গিফ্ট পাই। দেখি, কত দিন এখানে থাকতে পারি।'

গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাবা বললেন, 'তুমি তো একদিন আসতে পারো। ওয়েস্ট পোর্ট কি খুব দূর হবে? আমি অবশ্য আর মাসখানেক থাকব। যদি পারো, একবার এসো।'

ভদ্রতা করে আমিও একই কথা বললাম। ফোন নম্বর, ই-মেল অ্যাড্রেস দিলাম। সুজয়া বলল, 'দেখি, চেষ্টা করব। আমার ছুটি থাকে থ্যাংক্স গীভিং আর ক্রীসমাসের দিন। ততোদিন পর্যন্ত তো স্যার থাকবেন না।'

'আমরা থাকব। কখনো কানেটিকাটে গেলে সময় পেলে কন্ট্যাক্ট করবেন।'

গাড়ি হাই-ওয়েতে পড়ার পর সুবীর বলল, 'আপনার ছাত্রী বনবাসে ভালোই আছে মনে হল। সংসারের ঝুট ঝামেলা নেই। শুধু এমারসন আর হেনরি থরোর সঙ্গে ভূতবাংলোয় বসে ফিলসফী চর্চা। আপনার একটা ছাত্রী অ্যাটলিস্ট বে-লাইনে যায়নি।'

বাবা ওর রসিকতায় কান দিলেন না। নিজের মনেই বললেন, 'কি জানি? বনবাস না আত্মনির্বাসন, সে কথা যার জীবন সেই জানে। ও তো আরও পড়াশোনা করতে পারত। এদেশে ওর দাদা আছে বলছিল। বিয়ে-টিয়েও দেয়নি নাকি? তোমরা যে এত "অ্যাচিভমেন্টের" কথা বলো, সুজয়াকে দেখে ওই প্রশ্নটাই মনে আসছে।'

গভীর অন্ধকারে এক প্রাচীন বাড়ির বাগানে দাঁড়িয়ে থাকা পরবাসী মেয়েটির জন্যে বাবার মনে কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। যদিও জানি মানুষ হিসেবে বাবার চিন্তাধারা খুব গতানুগতিক নয়। মেটিরিয়্যালিজম্, সাক্সেস আর অ্যাচিভমেন্টের

ডেফিনিশন নিয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্ক হয়। তবু সুজয়াকে দেখে বোধহয় এ কথাই ভাবছিলেন—ভালো ছাত্রী হয়েও যে আমেরিকায় আরো পড়াশোনা করেনি, প্রফেশন্যাল চাকরি, বিয়ে, সংসার কোনো কিছুই হয়তো যার বেঁচে থাকার আদর্শ রুটিন অনুযায়ী হয়নি, শুধু এক স্মৃতিঘরে আশ্রয় নিয়ে এ তার কেমন জীবনযাপন?

হতে পারে বাবার এত কিছু মনে হয়নি। অনেকটাই আমার অনুমান। বাবাকে বললাম, 'মহিলা বেশ তো আছে বাবা। একজন বন্ধুও রয়েছে। তুমি ভাবছো কেয়ারটেকারের চাকরি। সুজয়া হয়তো শখ করেই কাজটা নিয়েছে। বলছিল না, ওর মিউজিয়মে কাজ করতে ভালো লাগে?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'হবে হয়তো। বাঁধা রুটিনের বাইরের জীবনকে তো সেভাবে দেখা হয়নি।'

সুবীর বলে উঠল, 'কথাটা কোটেশন দিয়ে শেষ করুন—"যে জীবন ফড়িং এর"...'

ওয়েস্টপোর্টে ফিরে আসার কিছুদিন পরে বাবার কথায় সুজয়ার ফোন নম্বরে ফোন করেছিলাম। এমারসন মিউজিয়মের নতুন কেয়ারটেকার জানাল সুজয়া পী-বডি মিউজিয়মে চাকরি পেয়ে চলে গেছে। কৌতূহল হলেও সুজয়ার সেই বনমালী শন-এর কথা আর জিজ্ঞেস করিনি।

বাবা দেশে চলে যাওয়ার কয়েকমাস বাদে সুজয়ার ফোন এলো। নতুন চাকরি নিয়ে সময়মতো যোগাযোগ করতে পারেনি বলে লজ্জিত।

সুজয়া বাবার কলকাতার ঠিকানা আর ফোন নম্বর চেয়ে নিল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কোথায় থাকেন?'

'এক মহিলার বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়েছি। মিউজিয়ম থেকে ডিস্ট্যান্স বেশি নয়।'

'এখন তাহলে আর মিউজিয়মে রাত কাটাতে হচ্ছে না?'

সুজয়ার গলার স্বর যেন ভারী শোনাল, 'নাঃ, ওই এপিসোড শেষ।'

কথাটা কানে বাজল। তবে কি শনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভেঙে গেছে? সুজয়া বলছিল, 'দ্যাট্ ওয়াজ এ কাইন্ড অফ্ এক্সপেরিয়েন্স! অ্যান্ড আই লাভ্ড্ দ্যাট ...তারপর প্রসঙ্গ বদল করল, 'পী বডি মিউজিয়মে এসেছেন বোধহয়?'

'হ্যাঁ, বাবাকে নিয়েও গিয়েছিলাম।'

'সেকি? স্যারের সঙ্গে তাহলে আমার দেখা হবে কোথায়?'

আমি হেসে উঠলাম, 'হয়তো নিউ ইয়র্কের কোনো মিউজিয়মে। যদি বাবা আবার কখনো আসেন।'

সুজয়ার সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি। মাঝে একবার ওর ফোন পেলাম। বলছিল, 'স্যারকে আমি আর ফোন করতে পারিনি। দেশে যাওয়াও হয়নি। এমনভাবে সময় চলে যাচ্ছে, সবদিক ম্যানেজ করে উঠতে পারি না।'

কি জানি কীসের ওর এত ব্যস্ততা? সংসারের দায়িত্ব তো নেই। হয়তো পার্ট টাইম আরও কোনো কাজ-টাজ করে। কথার ফাঁকে সুজয়া বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কনকর্ডে এসে স্যার বোধহয় আমার সম্পর্কে একটু ডিস্যাপয়েন্টেড হয়েছিলেন?'

'কেন? পড়াশোনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন বলে? সে তো পুরোনো প্রফেসরদের বাঁধা প্রশ্ন। বাবা কিছু মনেও রাখেননি।' সুজয়া উত্তর দিল, 'আসলে, স্যার তো জিজ্ঞেস করতেই পারেন। ওঁর কাছে পরীক্ষার আগে কতবার নোটস্ নিতে গিয়েছি। তখন তো টিউশন ফী বলে কিছু ছিল না। আপনাদের বাড়িতেও গিয়েছি। আপনি বোধহয় তখন এদেশে চলে এসেছেন।'

'তাই-ই হবে। শুধু বাবা নয়, আমার মামারাও ছিলেন ফিলসফীর লোক। প্রবাস জীবন চৌধুরী, গোপীনাথ ভট্টাচার্য, কালিদাস ভট্টাচার্য, এদের কত ছাত্রছাত্রী ছিল। টিউশন নিয়ে পড়ানোর কথা এঁরা ভাবতেও পারতেন না।'

সুজয়া নিজের মনেই বলল, 'সে একটা যুগ ছিল।'

মাঝে আর কথা হয়নি। এক সন্ধ্যেবেলায় ইউ-টিউব এ বাংলা ছবি দেখছিলাম। নুরীর আজ হসপিটালে অন্-কল্। কিছুক্ষণ আগে ফোন পেয়ে বেরিয়ে গেছে। ছবি দেখতে দেখতে ফোন বাজল।

বলল, 'অনেকদিন ফোন করতে পারিনি। আপনার ভালো? স্যার কেমন আছেন?'

'আছেন একরকম। মাঝে একবার বাথরুমে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙল। এ বয়সে এসব ভয়ই তো করে।'

'তবু ভালো বড় ইন্‌জুরি কিছু হয়নি। আমি আসলে এত স্ট্রেসের মধ্যে থাকি। ভাবি কল্ করব। হয়ে ওঠে না। এনি ওয়ে, নাউ উই আর সেট্‌লিং ডাউন।

ওর কথার কোনো সূত্র ধরতে পারি না। একবার বলে খুব স্ট্রেসের মধ্যে আছি। এখন বলছে আমরা সেট্‌ল ডাউন করছি। এত সামান্য পরিচয়ে জানার আগ্রহও হয় না। গতবারে ফোনে বলেছিল ওকে 'আপনি'র বদলে 'তুমি' বলতে। বয়সেও ছোট।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেট্‌ল করছ বললে। কোথায়?'

'কুইন্সিতে একটা ছোট বাড়ি কিনেছি। শনের বাবা, মা-র বাড়ির কাছাকাছি। ইন্‌ফ্যাক্ট, আমরা লাস্ট ইয়ারে বিয়ে করেছি।'

'কনগ্র্যাচুলেশনস! লাস্ট টাইম বলেছিলে পী বডি মিউজিয়মের কাছাকাছি কোথাও যেন রুমিং হাউসে আছো...।'

সুজয়া বলল, 'শন তখন ওদের ফ্যামিলি রিয়েল এস্টেট বিজনেসের কাজে রোড আয়ল্যান্ডে কমিউট করছিল। আমি মিউজিয়মের কাজটা ছাড়তে চাইছিলাম না। টেম্‌পোর‍্যারী অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। শেষ হয়ে গেছে।

কথায় কথায় মনে পড়ল সামনের মাসে আমাদের জুনিয়র হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সালেম শহর ওই মিউজিয়মেই যাব। একদিনের বাস্‌ ট্রিপ। সুজয়া শুনেই বলল, 'আগে এলে আমার সঙ্গে দেখা হত। এমনিই একবার আপনারা আমাদের কাছে বেড়াতে আসুন না নীপাদি।'

এভাবেই কথাবার্তা শেষ হয়ে যায়। সুজয়া একদিন আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট চাইল। আমি ফেসবুক-এ নেই জেনে অবাক। হঠাৎ বলল, 'কোনো ভালো খবর শেয়ার করার জন্যে আমার নিজের দিক থেকে কেউ নেই জানেন?'

এবার আমি অবাক। ভালো খবর মানে কী সুজয়া এক্সপেক্‌টিং? নাকি বাচ্ছা হয়ে গেছে? তাছাড়া ওর নিজের দিক থেকেও বা কেউ নেই কেন?

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার দাদার কথা বলেছিলে বোধহয়। তাঁরা কোথায় থাকেন? আর গুড নিউজটাই বা কী? সেটা আমার সঙ্গেই শেয়ার করো।'

সুজয়া বলল, 'জানাব। আগে দাদার ইন্‌সিডেন্টটা বলি। বেশ কয়েকবছর আগে দাদার অল্‌জাইমার্স ধরা পড়েছিল। ওই অবস্থায় একা একা হাঁটতে বেরিয়ে একটা ডিচ্‌ এর মধ্যে পড়ে ম্যাসিভ হেড ইনজুরি হল। বেঁচে আছেন এইটুকুই। আমাকে চিনতেও পারেন না।'

'দাদার ফ্যামিলি আছেন তো?'

'দাদা পেনসিলভানিয়ায় নার্সিং হোমে থাকেন। ওঁর আমেরিকান স্ত্রী যতটা

পারেন দেখাশোনা করেন। ওঁদের ছেলেমেয়ে নেই। আমিও অনেকদিন ধরে আর যেতে পারিনি।'

কি জানি কেন, সুজয়ার ভালো খবর জানার জন্যে আর প্রশ্ন করলাম না। নিজে থেকে কথা শেষ না করলেও সহজে ফোন রাখে না। সেদিনও আমিই ফোন রাখলাম।

সপ্তাহখানেক পরে দেখি আমার সেলফোনে দুটো ছবি এসেছে। ছোট্ট একটা ছেলে দুহাতে লাল বল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য ছবিতে সে সুজয়ার কোলে। পাশে সুজয়ার সেই বনমালী শন।

আমার ফোন পেয়ে সুজয়া খুশি হল।

"ছবি দেখে অবাক হয়েছেন তো? এই খবরটাই শেয়ার করতে চেয়েছিলাম।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তোমাদের ছেলে আছে জানতাম না। খুব কিউট!'

সুজয়া হাসল, 'নীপাদি, আ অ্যাম নট দ্যাট ইয়াং টু হ্যাভ মাই ওন বায়োলজিক্যাল চাইল্ড। আমি আর শন্ ওর ফস্টার পেরেন্টেস্। ওর ছবি দেখে কি ইন্ডিয়ান মনে হচ্ছে?'

বাচ্চাটিকে ছবিতে দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। ভারতীয় হলেও হতে পারে। পাঞ্জাবী, কাশ্মীরিদের ছোট ছেলেদের মতো দেখতে।

সুজয়া তখন বলল, 'আপনাকে বলেছিলাম না মাঝে খুব স্ট্রেসের মধ্যে ছিলাম? ভারমন্টে যেতে হতে বারবার। সেখানে সিরিয়ান রেফিউজি ক্যাম্পে অরফ্যান বেবীদের শেলটার থেকে ওকে নিয়ে এসেছি। অ্যাডপশনের জন্যে তো এখনই দেবে না। তবু অ্যাপ্লাই করেছি। লিগ্যাল প্রেপারেশনের জন্যে সময় লাগল। ওয়াশিংটনে যেতে হয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর নাম কী সুজয়া? বয়স কত?'

'রেজা। এখনো দুবছর হয়নি। সিরিয়ায় অ্যালেপপোর কাছে ম্যাসিভ বম্বিং অ্যাটাকের পরে যাদের রেসকিউ করেছিল, ও তাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু ওর ফ্যামিলির কাউকে পাওয়া যায়নি।'

আমার মনে পড়ছিল টেলিভিশনে দেখা দামাস্কাসের রেফিউজি ক্যাম্পে সেই অনাথ ছেলেটির মুখ। বোমা বিস্ফোরণের পরে তার হাতে মুখে পোড়াছাই লেগে

আছে। তার বিষণ্ণ, বিপন্ন মুখের ছবি দেখে একটি আমেরিকান ছোটছেলে প্রেসিডেন্ট ওবামাকে চিঠি লিখেছিল, ওকে আমাদের কাছে এনে দাও। আমার সঙ্গে থাকবে। আমার সঙ্গে স্কুলে যাবে...

সুজয়ার সঙ্গে সেদিন অনেক কথা হয়েছিল। বলেছিল, 'স্যার বোধহয় আমার কথা ভুলেও গেছেন? যদি আপনার মনে হয়, ওঁকে জানাবেন।'

বাবা শুনে কেমন বিষাদের সুরে বলেছিলেন—'যুদ্ধের শিশু! ছোটবেলার স্মৃতি যদি থাকে, সে বড় ভয়ংকর!'

বললাম, 'বাচ্ছাটা খুবই ছোট। মনে রাখার বয়স নয়।'

'ভালো। সুজয়াদের কাছে স্নেহ, ভালোবাসা পেয়ে মানুষ হোক। ওদের আমার শুভকামনা জানিয়ে দিস।'

যুদ্ধের শিশুর জন্যে বাবার শুভকামনা এখনো আমার জানানো হয়নি। শুধু ওই শব্দ দুটো মাথার মধ্যে রয়ে গেছে। হেমিংয়ের "ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস"-এর শেষ কয়েকটা পাতা আবার নতুন করে পড়ছি। যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কাহিনি, যুদ্ধের সিনেমা, মিডিয়ায় বছরের পর বছর যুদ্ধের খবর। যুগ যুগান্ত ধরে এক ভয়ঙ্কর সময়ের ডক্যুমেন্টেশন। তবু সাহিত্যে ফেরা। হেমিংওয়ের অনুবাদ যেন কার ছিল?

এখনো বাংলা নামটা মনে আছে। 'হে যুদ্ধ বিদায়।'

———

রূপকথার শর্ত

এক জীবন মানুষকে কতো ছবি দেখায়। বিচিত্র চিত্রশালার মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে যে দুচোখ মেলে দেখতে জানে, সে দ্যাখে। যদি প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা থাকে, লেখার মধ্যে দিয়ে বহুজনের জন্যে আরও বর্ণময় ছবি আঁকে।

দীপংকর ভাবে, তার সবদিক থেকেই অক্ষমতা রয়ে গেছে। সাদামাটা জীবনে তেমন কোনো দুর্লভ মুহূর্তের সঞ্চয় নেই, যা থেকে অন্তত একটা সাড়া জাগানো গল্পও লেখা যায়। শুধু যখন উদয় নারায়ণের কথা মনে পড়ে, দীপংকর যেন কিছু অনুপ্রেরণা পায়। অবচেতনে একটি রূপকথার শুরু থেকে শেষ কল্পনা করতে পারে। বহু বছর আগে এক সম্ভ্রম মেশানো বিস্ময় থেকে যে কাহিনির সূত্রপাত হয়েছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কুমার উদয়নারায়ণ রাইদেব ছিল দীপংকরের সহপাঠী। ততোদিনে রাজা মহারাজাদের প্রি.ভি. পার্স বন্ধ হয়ে গেছে। তবু ঠাটবাটের অনেকটাই ছিল। মধ্যপ্রদেশের লেটিভ স্টেটে উদয়ের পূর্বপুরুষরা একসময় যে বিলাসবৈভবের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, উদয় সেই ঐশ্বর্যের কিছু অংশ ভোগ করেছিল। রায়পুরের "রাজকুমার কলেজে" পড়েছে। ওর শৈশব, কৈশোরের সঙ্গী, সহপাঠীরা প্রায় সকলেই ছিল রাজা-রাজড়ার বাড়ির ছেলে। তারপর কলকাতায় পড়তে এসেছিল। দীপংকরের সঙ্গে একটু চেনাশোনা হতেই একদিন উদয় ওদের আলিপুরের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সেই প্রথম রাজবাড়ি দেখা। রাজকুমারের কুকুরদের প্রচণ্ড গর্জন শুনে বারান্দার সোফায় পা উঠিয়ে বসা। উদয়ের হা হা হাসি, 'তোকে আমাদের চিল্কীগড়ের বাড়িতে নিয়ে যাব। ওখানে দুটো পোষা চিতা আছে।'

প্রথমদিনের সেই অভিজ্ঞতা দীপংকরের মনে আছে। এখানকার ম্যাগাজিনে একটা গল্প লিখবে ভেবে আরও বেশি করে ভাবতে চেষ্টা করছে। উদয়নারায়ণকে সে গল্পের মূল চরিত্রে রেখে ইমিগ্রান্ট বাঙালিদের কথা লিখতে চাইছে। তার পরের চিন্তাগুলো এখনো সাজিয়ে উঠতে পারেনি।

গল্পের খাতিরে অসমবন্ধুত্বের জন্যে উদয়নারায়ণকে রাজপুত্র আর নিজেকে ছিন্নমূল পরিবারের সংগ্রামী যুবক সাজিয়ে দুজনের মাঝখানে এক আপাতদূরত্ব রচনা করা যেত। রাজ্যহারা উদয়নারায়ণের চরিত্রে ক্রমশ সমাজবাদের প্রভাব, দীপংকরের দারিদ্র্যের অহংকার অথবা হীনমন্যতাবোধ নিয়েও গতানুগতিক দ্বন্দ্বের ছবি আঁকা যেত।

কিন্তু দীপংকর সেভাবে লিখতে চায় না। সে তার হারানো দিনের গোপন মুগ্ধতাবোধের স্মৃতি ধরে রাখতে চায়। একসময় এই বোধ তাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। উদয়দের ঐশ্বর্য্য, সেই সম্ভ্রান্ত পরিবেশ, বিশিষ্ট ব্যবহার, আদর, আপ্যায়ন তিল তিল করে কী এক সম্মোহন সৃষ্টি করত। প্রসন্নতা ছড়িয়ে দিত। দীপংকরের মনে হত রূপকথার রাজ্যে তাঁরও কোনো ভূমিকা আছে।

কখনো সন্ধেবেলায় উদয়ের ঘরে বসে বাগান থেকে ভেসে আসা ঘণ্টা শুনতে পেত। তখন গোপীনাথ জিউ-এর মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময়। পুজো শেষ হলে রূপোর রেকাবিতে প্রসাদ আসত। কোনোদিন থালা ভরা জলখাবার। দীপংকর কেমন খুশি হয়ে উঠত। সেই প্রসন্নতাবোধ বলত—রানিমা আমার জন্যে পাঠিয়েছেন।

কখনো বিশাল দালান পার হয়ে যাওয়ার সময় রাজদর্শন হত। ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ার ফাঁকে রাজামশাই এক পলক চেয়ে দেখতেন। একবার কোন্ আন্দোলনে কলকাতার রাস্তায় ট্রাম, বাস পুড়ছে শুনে দীপংকরকে বাড়ি ফিরতে দেননি। ওঁদের টেলিফোন থেকে খবরটা দীপংকর বেহালায় ওদের পাশের বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছিল।

মাঝে মাঝে রানিমার সঙ্গে দেখা হত। একটি দুটি কথা বলতেন। দালানে ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় সারি সারি মার্বেল মূর্তির লক্ষ্যহীন নিষ্পলক দৃষ্টির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীপংকরের ঘোর লাগত। ভারী পর্দার আড়ালে সেতারের রিমঝিম সুর—কে যে রেওয়াজ করত। দীপংকর শ্বেতপাথরের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নেমে আসত। সমস্ত স্নায়ু জুড়ে রিমঝিম রিমঝিম...

উদয়ের বোনকে সে একবারও দ্যাখেনি। তখন তার স্বপ্ন দেখার বয়স। ভেতরের ঘরে কে সেতার বাজায়, তাকে দেখার ইচ্ছে হত। সত্যিই সে তো আর রাজকন্যাকে পাওয়ার আশা করত না। সেই মেয়ে শুধু দীপংকরের বুকে আলতো

একটু যন্ত্রণা রেখে ময়ূরভঞ্জ নয়তো কুচবিহারের রানি হয়ে চলে যেতে পারত রাজবাড়িতে গিয়েও রাজকন্যা দেখার কৌতূহল তার মিটল না।

ফাইনাল ইয়ারের আগেই উদয় কলেজে পিছিয়ে গেল। দীপংকরের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা হল না। ও তখন ক্ল্যাসিক্যাল গান বাজনা নিয়ে মেতে আছে। নামকরা গাইয়ে বাজিয়েরা দিল্লি, লখনৌ, বেনারস থেকে কলকাতায় এলে উদয়দের বাড়িতে আসার বসত। দীপংকরও একবার সরোদ শুনতে গিয়েছিল।

গানবাজনার ঝোঁকে উদয় মাঝেমাঝেই কলেজ করত না। দুম করে আজ বেনারস, কাল গোয়ালিয়র, নয়তো লখনৌ চলে যেত। কুমার গন্ধর্বের গান বলতে পাগল। মাঝে কিছুদিন ইন্দোরে কাটিয়ে এলো। এই করে শেষ পর্যন্ত কলেজে দুটো বছর পিছিয়ে গেল। দীপংকর ততোদিনে পাশ করে রাঁচিতে চাকরি করছে।

সত্তরের দশক বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারদের জীবনে নতুন সুযোগ এনে দিল। আমেরিকায় জন কেনেডির দৌলতে ইমিগ্রেশনের দরজা খুলে গেছে। শুধু মেধা সম্বল করে শত শত বাঙালি বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে। চোখের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নময় ছবি। ভাগ্য অন্বেষণের জন্যে অনেকেই নিউইয়র্কে এসে পৌঁছোচ্ছে। জাতিবিরাদরির দেখা মিলবে। কিছুটা ভরসা পাওয়া যাবে। তারপর নিজের নিজের ভাগ্য।

ম্যানহ্যাটনে "সিক্স হান্‌ড্রেড ওয়েস্ট" আর "ক্লিনটন আর্মস হোটেলে" ঘর ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। আরও কয়েকটা সস্তার হোটেলেও সদ্য আসা বাঙালি ইমিগ্র্যান্টদের ভিড়। কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে এইসব ঠিকানার কোনো একটা ঘরে প্রায়দিনই কেউ না কেউ সুটকেস হাতে এসে দাঁড়াচ্ছে। ক্রমশ স্বচ্ছলতা, সাফল্য, প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের সাথে বাস্তবের কঠিন লড়াই আর মোকাবিলার মধ্যে দিয়ে রচিত হচ্ছে প্রবাসী বাঙালির স্বতন্ত্র ইতিহাস।

এদেরই মাঝে দীপংকর এসে পৌঁছোল। তারপর থেকে প্রতিদিন দুঃসহ শীতের সকালে বেঢপ সাইজের সেকেন্ডহ্যান্ড গরমকোট পরে মরীয়া হয়ে "লাইনের চাকরি" খুঁজে বেড়ানো। শেষ দুপুরে সেন্ট্রাল পার্কের বেঞ্চে বসে আত্মসমীক্ষা। কুয়াশা জড়ানো সন্ধ্যায় একরাশ ক্লান্তি আর হতাশা নিয়ে হোটেলে ফিরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দাদাদের অমৃতবাণী শ্রবণ। "অড্ জব" নেওয়া আর না নেওয়া নিয়ে তর্কবিতর্ক বেশিক্ষণ স্থায়ী হত না। দেশ থেকে কিনে আনা সীমিত ডলারের পুঁজি

যার শেষ হতে চলেছে, তার কাছে ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানির মামুলি চাকরি, নয়তো ব্যাঙ্কের টেলারের কাজই আপাত ভরসা। সপ্তাহে হোটেলের ভাড়া, খাওয়া দাওয়া ছাড়াও দৈনন্দিন খরচ আছে। দীপংকর যখন এই ভেবে মনকে একরকম প্রস্তুত করেছে, ঠিক তখনই ভাগ্য প্রসন্ন হল। "স্টার অ্যান্ড মিলার" নামে এক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে চাকরি হয়ে গেল। 'অড্ জব' আর নিতে হল না।

ক্লিনটন আর্মস হোটেলের সন্ধ্যের আড্ডায় ক্রমশ যেন নৈরাশ্যের ছায়া নামছিল। প্রফেশন্যাল ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন অভিজ্ঞতার অভাবে কতজন চাকরি পাচ্ছেনা। বাধ্য হয়ে সুপার মার্কেটে, পোস্টঅফিসে টেম্পোর্যারী কাজ নিচ্ছে। নাইট গার্ডের কাজও নিয়েছে কয়েকজন। সাময়িক উপার্জনের তাগিদে আপস করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এরই মাঝে ছোট ছোট ঈর্ষা, প্রতিযোগিতার মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকছে না। দীপংকরের "ডিজাইনারের" চাকরি নিয়েও দু-চারজনের অবিশ্বাস, ঈর্ষা, ঠাট্টা রসিকতার চেষ্টা ওকে আহত করেছিল। ইংল্যান্ড থেকে আসা মোহন বিশ্বাস নিজেকে ভীষণ কোয়ালিফায়েড ভাবতেন। অথচ মনোমতো চাকরি পাচ্ছেন না। আমেরিকান কোম্পানিগুলো যে শিবপুর-যাদবপুরের ছেলেদের সঙ্গে মোহনদাকেও এক করে ফেলছে, ইউ. এস্ ডিগ্রি বা ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স নেই বলে হাঁকিয়ে দিচ্ছে, এতে উনি ভীষণ বিরক্ত। সেই মোহন বিশ্বাস দীপংকরের চাকরির খবরে বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন। "স্টার অ্যান্ড মিলার"-এ গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তিনি বিলেত ফেরত আর সুযোগ দিলে দীপংকরের চেয়ে কম মাইনেতেই কাজটা নিতে রাজি আছেন বলে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। পরে, কোম্পানির ইহুদী মালিকের কাছে ওই ঘটনা শুনে দীপংকর যত না লজ্জা পেয়েছিল, দুঃখ পেয়েছিল তার বেশি। নৈরাজ্য আর ব্যর্থতাবোধ মানুষকে কখন যে কোন্ প্রবণতার মধ্যে ঠেলে দেয়!

অথচ অতীন চ্যাটার্জির মতো শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষও ছিল। দীপংকর, অনুপ আর শ্যামলের নতুন চাকরির খবরে "ক্লিনটন আর্মস্"-এ পার্টি লাগিয়ে দিল। মাংস, ভাত রান্না করে কী আনন্দ! চাঁদা করে শ্যাম্পেনের বোতল কিনে এনে গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি। তিনজন বাঙালি অড্ জব না করেই সোজাসুজি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে ঢুকে গেছে—অতীনের কাছে এটা নাকি সেলিব্রেট করার মতো সুখবর।

ছ'মাসের মধ্যে দীপংকর ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হল। ইহুদী মালিকরা কথা

রেখেছেন। মাইনেটা ওর কাছে আশাতীত ছিল। সব মিলিয়ে দীপংকরের দিনগুলো ভালোই কাটছিল। পার্ট টাইম পড়াশোনা শুরু করবে বলে নিউইয়র্কের ইউনিভার্সিটিতে খোঁজ খবর নিচ্ছিল।

এক বছর পরে উদয়ও চলে এলো। কলকাতা থেকে দীপংকরের চিঠিতে ফ্লাইট নম্বর দেওয়াতে ও এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। দেড় বছর পরে দেখা। এদেশে উদয়ের আরও চেনাশোনা লোকজন থাকা সত্ত্বেও উদয় যে দীপংকরের কাছেই উঠতে চায়, এ ব্যাপারটা দীপংকরকে খুশি করেছিল। খানিক উচ্ছ্বাস বিনিময়ের পর দীপংকর উদয়ের মালপত্রের বহর দেখে অবাক! ঢাউস হাতব্যাগে একজোড়া তবলা এনেছে। এক্সেস্ লাগেজের ভাড়া দিয়ে কালো বাক্সে হারমোনিয়ম। কোনো বাঙালিকে প্রথমবারে এমন বাজনাবাদ্যি নিয়ে আমেরিকায় ঢুকতে দ্যাখোনি দীপংকর। ঠাট্টা করাতে উদয় যেন অবাক হয়ে বলল, 'কেন? এদেশে লোকেরা গান গায় না?'

দীপংকর উত্তর দিয়েছিল, 'এরা আর আমরা? রুটির জোগাড় করতেই প্রাণ যাচ্ছে।'

উদয় কথাটা কানে নিল না। আমেরিকার চাকরি-বাকরির বাজার নিয়ে কিছু জানতেই চাইল না। দীপংকরের সঙ্গে বাস-এ চড়ে সারা পথ পুরোনো গল্পগুজব চালিয়ে গেল।

দীপংকর ক্লিনটন আর্মস হোটেলে ওর নিজের ফ্লোরেই উদয়ের জন্যে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রেখেছিল। তিনতলায় পৌঁছে চাবি খুলে ঘরে ঢুকল। পুরোনো কার্পেট, সাধারণ ফার্নিচার। জানলার কাচ তুলে দিলে রাস্তার হট্টগোল, চলন্ত গাড়ি থেকে ঝিংচাক্ বাজনা ভেসে আসে। আপটাউনের ঘিঞ্জি পাড়া। কাছেই সাবওয়ে আর মোড়ের মাথায় জ্যান্ত মাছের দোকান বলে বাঙালির খুব সুবিধে। হোটেলের কিচেন শুদ্ধু অ্যাপার্টমেন্টে তারা প্রায়ই মৎসমুখ করে। চাঁদা করে বাজার আসে। দল বেঁধে রান্না করে।

এরকম পরিবেশে উদয় থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু রাজপুত্র হলেও বেকার বন্ধুর জন্যে আপাতত দীপংকর এর চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত আর কী করবে? প্রথম সপ্তাহের ভাড়াটা নিজেই দিয়ে দিয়েছে। উইক্লি পঁয়ত্রিশ ডলার। তারপর দেখা যাক উদয় কী ঠিক করে। দেশ থেকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট ডলার নিয়ে এসেছ। ওর আর চিন্তা কীসের?

উদয়ের ঘরে জিনিসপত্র রেখে দীপংকর ওকে নিজের ঘরে নিয়ে এল। ইকেলট্রিক কেট্‌লিতে কফির জল বসাল। ওর বিছানায় বসে ক্লান্ত গলায় উদয় বলল, 'জার্নিটা কি লম্বা রে! অ্যাটলান্টিক আর শেষ হয় না।'

দীপংকর হাসল, 'এখনই টায়ার্ড হয়ে পড়ছিস? প্রচুর লড়তে হবে বন্ধু। রয়্যাল লাইফস্টাইল্ ছেড়ে কেন যে এদেশে এলি!'

উদয় জিজ্ঞেস করল, 'চট করে চাকরি পাবো না বলছিস?'

কফি তৈরি করতে করতে দীপংকর জবাব দিল, 'চট করে মানে দু-এক সপ্তাহের মধ্যে হয়তো কিছু পাবিনা। দেখা যাক।'

কফি খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। শেষ করে কাপ এগিয়ে দিলো উদয, 'আর এক কাপ দে তো। নইলে ঘুম ছাড়বে না।'

'আজ আর জেগে থাকার দরকার কী? তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়। খিদে পায়নি?'

'ডিনার? কী খাওয়াবি কী? ভাত-টাত পাওয়া যাবে?'

'ডাল, ভাত সব পাবি। নীচের অ্যাপার্টমেন্টে কিচেন আছে। দু-চারজন রান্না করে। ইচ্ছে করলে ওদের সঙ্গে শেয়ার করে খাওয়া যায়। আমি অবশ্য রোজ ইন্ডিয়ান খাইনা।

'আমার জন্যে ঝামেলা করিস না। যা হয় খেয়ে নেব।'

একটু পরে নীচে গিয়ে জয়দেব, শংকরদের অ্যাপার্টমেন্টেই ওরা খেয়ে নিল। মাংসের খুব সুখ্যাতি করল উদয়। জয়দেব উৎসাহিত হয়ে ওদের রান্নার টিমে জয়েন করতে বলল। উদয় রাজি। দীপংকরের হাসি পাচ্ছিল। উদয় রান্না করবে! অবশ্য রোজ দিশি রান্না খেতে চাইলে দলে না ভিড়ে উপায় কী?

সে রাতে উদয় আর বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারেনি। খানিক আড্ডা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

দু-চারদিন পরে উদয় নিজের ঘরভাড়ার জন্যে ডলার দিতে চাইল। দীপংকর প্রথম সপ্তাহের পঁয়ত্রিশ ডলার আর নিল না। এটুকু সাহায্য করার মতো অবস্থা তার হয়েছে। তবে পরের সপ্তাহের জন্যে উদয়কে নীচের রেটিং অফিসে গিয়ে চেক্ জমা দিতে হবে।

দীপংকর খোলাখুলি জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে থাকতে পারবি, না অন্য পাড়ায় প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্ট দেখব? উইক্‌লি পঞ্চাশ ডলার মতো দিলে ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট পেয়ে যাবি। তবে অফিস-টফিস হয়তো এত কাছে হবে না।'

উদয় অবাক হোল, 'কেন, অন্য পাড়ায় যাব কেন? তোরা তো এখানে আছিস?'

শেষ পর্যন্ত ওই তীথস্থানেই উদয় থেকে গেল। ততোদিনে অনেকে ভালো চাকরি পেয়ে ক্লিনটন আর্মস ছেড়ে চলে গেছে। দেশ থেকে ফ্যামিলি আসার পর রেসিডেন্‌সিয়াল এলাকায় অ্যাপার্টমেন্টে সংসার পেতেছে। আবার একদল ভাগ্যসন্ধানী ক্লিনটন আর্মস-এ এসে পৌঁছেছে। দীপংকর কোথাও যায়নি। এ হোটেলে তিনতলায় তার ঘরটি বেশ একটেরে। দু-পা দূরে সাবওয়ে। সন্ধ্যের পরে হোটেলে ফিরে ইচ্ছে হলেই একদল বাঙালি ছেলের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায়। কেউ কেউ সদ্য দেশ থেকে এসেছে। দীপংকর তাদের জন্যে চাকরির খোঁজ খবর নিয়ে আসে। রেসিউমে লিখে দেয়। দুজনকে এর মধ্যেই নিজেদের অফিসে ঢুকিয়েছে। 'স্টার অ্যান্ড মিলার'-এ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়র হয়ে ক্রমশ তার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ছে। অবশ্য মাইনেপত্র সে তুলনায় বেশি নয়। দীপংকর এধার-ওধার অ্যাপ্লাই করছে। সেরকম কিছু পেলে এ চাকরি ছেড়ে দেবে। আমেরিকায় কেউ প্রথম চাকরিতে পড়ে থাকে না।

উদয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসেছিল। কিন্তু নিউইয়র্কে এসে মাত্র সপ্তাহ তিনেক লাইনের চাকরির চেষ্টা করল। দীপংকর ওকে সাহায্য করতে চাইছিল। ওর নিজের অফিসে দুজন বাঙালি ছেলেকে ঢোকানোর পর, উদয়ের জন্যেও একরকম বলে রেখেছিল। রাতারাতি তো আর চাকরির ব্যবস্থা করা যায় না। একটু সময় লাগছিল। দেশে থাকতে নাকি ফারাক্কা ব্যারাজ প্রজেক্টে কিছুদিন চাকরি করেছিল। সে অভিজ্ঞতার মাথামুণ্ডু কিছুই উদয়ের রেসিউমেতে লেখা যাচ্ছে না। তাও দীপংকর অনেক মেজে ঘসে একখানা বায়োডাটা তৈরি করল। তার কপি করে আনা, উদয়কে ইন্টারভিউ এর জন্যে তৈরি করা, দীপংকর সব চেষ্টাই করছিল।

কিন্তু উদয় ধৈর্য্য ধরতে পারল না। তিন সপ্তাহের মাথায় ব্রংক্‌-এর একটা অফিসে সিকিওরিটি গার্ডের চাকরি নিয়ে নিল। অন্য ছেলেরা যে চাকরি নিরুপায় হয়ে করেছে, উদয়ের তো সেরকম মরীয়া অবস্থা হয়নি। দেশ থেকে ছশো-সাতশো

ডলার নিয়ে এসেছিল। তাছাড়া দীপংকর তো ছিল। উদয় একবারও মতামত নিলো না। তাও দীপংকর গায়ে পড়ে অনেক বুঝিয়ে ছিল—'আমি তো অফিসে চেষ্টা করছি। ততোদিন তুই একটা ব্যাংকে-ট্যাংকে কাজ নিয়ে নে। গার্ডের চাকরি করবি কেন? ওটা কোনো ভদ্র প্রফেশন হল? ব্রংক্স্-এর ওইসব পাড়ায় দিনের বেলায় খুন হয়...'

উদয় এককথায় উড়িয়ে দিল, 'ভদ্র প্রফেশন মানে কী? আমি কি চুরি ডাকাতি করছি? খুন-টুনের ভয় দেখাস না। দিনে দুপুরে ব্যাংকে হোল্ড-আপ হচ্ছে না।'

দীপংকরের খুব রাগ হোয়েছিল। এত চেষ্টা করে কী লাভ হল। উদয় যেন ইচ্ছে করেই এটা করল। দীপংকরের অফিসে চাকরি পেলে তো ওর ডিভিশনেই কাজ করতে হবে, সেটাই আসলে উদয় মেনে নিতে পারছে না। এইজন্যেই কায়দা করে এড়িয়ে গেল। অন্য কোথাও চেষ্টা ঠিকই করছে। চাকরি পেয়ে গেলে গার্ডের চাকরিটা ছেড়ে দেবে। উদয়ের এখন কিছু উপদেষ্টা জুটেছে। তাদের বুদ্ধিতেই চলছে। তারা তো জানে না ওর কি ব্যাকগ্রাউন্ড। রাজবাড়ির ছেলে যদি টুপি আর দারোয়ানের পোশাক পরে আমেরিকার অফিস পাহারা দিতে চায় দিক। দীপংকর আর সে নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

আশ্চর্য! দেশে থাকতে দীপংকর উদয়কে রাজার ছেলে বলে কখনো বাড়তি খাতির করেনি। অথচ আমেরিকায় ইমিগ্র্যান্টদের প্রাথমিক লড়াই এর দিনে, সস্তার হোটেলে আর পাঁচটা সাধারণ ঘরের ছেলেদের সঙ্গে উদয় যখন পেঁয়াজ, রসুন কেটে রান্নার জোগাড় দিতে লাগল, কার্পেটের ওপর কাগজ বিছিয়ে সকলের সঙ্গে বারোয়ারি মাংসে ভাত থেকে লাগল, বাসন মাজতে শুরু করল, ছাড়া জামাকাপড়ে বস্তা দুলিয়ে ওই বাজে পাড়ায় মাতালি আর বেশ্যার ভিড় ঠেলে রাস্তার লন্ড্রোম্যাটে কাপড় কাচতে যেতে লাগল, দীপংকরের বারবার মনে হল, মানায় না। উদয়কে আমাদের দলে মানায় না। ঝোঁকের মাথায় বিদেশে এসে পড়েছে। ওর সহজ সরল ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে সবাই যেন ওর ঘাড়ে কাজের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। চুল কাটার খরচ বাঁচাতে মোটা কল্যাণ তো একদিন উদয়ের হাতে কাঁচি ধরিয়ে দিল। উদয় কল্যাণের ঘাড়ে তোয়ালে ফেলে দিয়ে কচ্‌কচ্ করে চুলও কেটে দিল। আনাড়ি হাতে চুলের ছাঁটটা এত বিশ্রী হল যে, মোটা কল্যাণ যত গালাগাল দিচ্ছে, উদয়

ততোই মজা পাচ্ছে।

উদয়ের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা দেখে দীপংকর অবাক হয়ে যেত। সারাদিন সিকিওরিটি গার্ডের ডিউটি দিয়ে এসে সন্ধ্যেবেলায় রান্নাঘরে ঢুকত। আজ বাঁধাকপি ব্রকোলির ঘ্যাঁট রাঁধছে। কাল চিকেনের ছাল ছাড়িয়ে মাংস কাটতে বসছে, যে যা পারে করিয়ে নিচ্ছে। পনেরো-কুড়িজনের রান্না উদয় একাই নামিয়ে ফেলছে। এক ফোঁটা বিরক্তি নেই।

মাঝে মাঝে ড্রিংক করে উদয় বেশ 'হাই' হয়ে যেত। উইক-এন্ডে রাত জেগেই হৈ-হুল্লোড়। কোনোদিন খাওয়াদাওয়া মিটতেই গানের আসর। হারমোনিয়াম নিয়ে নিজের ঘরেই দল জোটাত উদয়। তবলা দুটো অবশ্য যাবে তাকে পেটাতে দিত না। কমবয়সী ছেলেগুলো অন্য হোটেল থেকে চলে আসত। গানের তালে তালে চামচে দিয়ে ফ্রাই প্যান বাজাত। তবে উদয় হাবিজাবি গান গাইত না। দীপংকর প্রথম উদয়ের কাছেই মেহেদী হাসানের নাম শুনেছিল। "রফ্‌তা রফ্‌তা" গজলটা ওর মুখেই প্রথম শোনা।

কমবয়সি ছাত্রগুলো গজল-টজল থামিয়ে ফ্রাইপ্যান বাজিয়ে "ধিতাং-ধিতাং" ধরতো। উদয় হাল ছেড়ে দিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে যেত।

সময়ের এই অপচয় দীপংকরের অসহ্য লাগত। উদয়ের কি ভবিষ্যতের চিন্তা নেই? আমেরিকায় গার্ডের চাকরি করেই জীবন কাটিয়ে দেবে?

উদয়ের কথা ভাবতে বসে দীপংকরের স্মৃতিতে হারানো সময়ের ছবি ভেসে উঠত। উদয়দের চিল্কীগড়ের সেই সাদা দুর্গের মতো রাজপ্রাসাদ, আলিপুরে ফোয়ারা আর শ্বেতপাথরের পরী দিয়ে সাজানো বাগানঘেরা বিশাল বাড়ি, অভিজাত চেহারার মানুষজন...কত কিছু মনে পড়ত। দীপংকর আশ্চর্য হয়ে ভাবত, সে তো কিছুই ভোলেনি। বৈভবের পিছুটান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে।

দীপংকর একদিন রেগে উঠে বলেছিল, 'তোর কোনো অ্যাম্‌বিশন নেই? ফালতু আড্ড দেওয়া আর গাদা গাদা রান্না করার জন্যে তুই দেশ ছেড়ে এতদূরে এলি? গার্ডের চাকরিতে বেশিদিন পড়ে থাকে না উদয়! এবার নিজের কেরিয়ারের কথা ভাব।'

উদয় রাগ করেনি। খানিক চুপ থেকে বলেছিল, 'তুই কোথাও একটা ব্যবস্থা করে দে। আমার দ্বারা ঘুরে ঘুরে চাকরি পাওয়া অসম্ভব।'

সেসময় দীপংকর আর ওকে সাহায্য করতে পারেনি। নতুন অফিসে চাকরি নিয়েছে। সেখানে তখন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতেই ব্যস্ত। বড় কোম্পানিতে সবেমাত্র ঢুকে অন্যের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করা শক্ত। দীপংকর চেষ্টাও করেনি।

চাকরি-বাকরি পালটাতে-পালটাতে দীপংকর একসময় নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ছেড়ে ওহায়ো চলে এলো। ততোদিন নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার্স্ ডিগ্রি করেছে। প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার-এর লাইসেন্স্ পরীক্ষায় পাশ করেছে। মাঝে যখন পেনসিল্‌ভানিয়াতে ছিল, উদয়ের সঙ্গে তখনো ফোনে কথা হত। উদয় তখন নিউ ইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানিতে টেক্‌নিশিয়ানের চাকরি করছে, মনে খুব প্রশান্তি। কার কাছে যেন তবলা শিখছে।

দীপংকর বিয়ে করল চুয়াত্তর সালে। বউ সুমনা ডাক্তার। আমেরিকায় এসে পরীক্ষা-টরীক্ষা পাশ করে হাসপাতালে রেসিডেন্সি শেষ করল। তারপর দুজনের চাকরির ব্যস্ততা, সংসার, ছেলেমেয়ে মানুষ করা—এইসব নিয়ে বছরগুলো হু হু করে পার হয়ে যাচ্ছিল।

ক্রমশ উদয়ের সঙ্গে দীপংকরের যোগাযোগ কমে আসছিল। উদয় মাঝে মাঝে খোঁজ নিত। দীপংকরেরই ফোন করা হয়ে উঠত না। মাঝে কার কাছে খবর পেল উদয় টেকসাসে চলে গেছে। একবার একটা ইন্ডিয়ান ম্যাগাজিনে ট্র্যাভ্‌ল্ এজেন্সি আর ভারতীয় মাশলাপাতির দোকানের বিজ্ঞাপনে উদয়ের ফোন নম্বর চোখে পড়েছিল। দীপংকর ফোন করতে উদয় অনেক খবর দিল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ট্র্যাভল্ এজেন্সি আর ইন্ডিয়ান গ্রোসারি স্টোর খুলে ব্যবসা করছে।

দীপংকর জিজ্ঞেস করেছিল, 'বিয়ে করেছিস?'

'অনেক দিন। তোর সঙ্গে কনট্যাক্ট নেই, তাই জানিস না।'

'কোথায় বিয়ে করলি? এখানে, না দেশে গিয়ে?'

'ইন্দোরে! তোরা একবার আয় না। আমিও তো তোর বউকে দেখিনি।'

দীপংকর সেদিন সেই ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল যে, বিয়েটা তাহলে উদয় দেশে গিয়েই করেছে। ইন্দোরে শ্বশুরবাড়ি মানে রাজবংশ-টংশ হবে হয়তো। নিউ ইয়র্কে থাকার সময় ব্রুকলীনের এক ডিভোর্সি মহিলাকে নিয়ে এধার-ওধার মিউজিক কন্‌সার্ট শুনতে যাচ্ছিল উদয়। সেই গ্রিক মহিলার সঙ্গে সাময়িক সম্পর্ক হয়েছিল হয়তো। যা হোক, সংসারী উদয়কে একবার দেখে এলেও হয়। দীপংকর হিউস্টনে

গেলে দেখা করবে ভেবেছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ড্যালাসে গেল দু-তিনবার হিউস্টনে আর যাওয়া হল না।

বছর দুই পরে অফিসের মিটিং-এ দীপংকর হিউস্টনে গেল। মাথার মধ্যে ঘুরছে, এবার উদয়ের সঙ্গে দেখা করবে। হোটেলে পৌঁছে ওদের কলেজের বন্ধু রণেনকে ফোন করল। পরে দিন বিকেলে অফিস ছুটির পর রণেন ওর হোটেলে চলে এলো। একথা সেকথার পরে দীপংকর জিজ্ঞেস করল, 'উদয়নারায়ণকে মনে আছে? রাইভঞ্জ দেব? ও এখানে থাকে জানিস?'

রণেন বলল, 'প্রায়ই দেখা হয়। তোর খবর নেয়। একটা ফোন করতে পারিস।'

'ভাবছি একবার দেখা করব। কোথায় থাকে জানিস?' রণেন ঘড়ি দেখে বলল, 'এখন যাবি? দোকানটা প্রায় ডাউন টাউনেই। মিনিট কুড়ির ড্রাইভ।'

রণেনের গাড়িতে যেতে যেতে নানা কথা হচ্ছিল। ও বলছিল ওর মেয়েরা মাঝে মাঝেই উদয়ের দোকানে আসতে চায়। দীপংকর বুঝতে পারছিল না ইন্ডিয়ান গ্রোসারি স্টোর আর ট্র্যাভল্ এজেন্সিতে ছোটদের কি আকর্ষণ থাকতে পারে।

রণেন একটা শপিং সেন্টারের পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করল। দীপংকরকে নিয়ে একটু হেঁটে গিয়ে একটা পিৎজার দোকানে ঢুকল। দীপংকর ভাবল অসময়ে রণেন তাকে পিৎজা খাওয়াতে নিয়ে এলো কেন?

ঠিক তখনই উদয়কে দেখতে পেল। দোকানের কাউন্টারে রাখা বড় বড় কাগজের বাক্সে গরম পিৎজা সাজাচ্ছে। পেছনে ওভেনের গনগনে আগুন। সেখান থেকে বড় বড় ট্রে বের করে আনছে। হুবহু পিৎজার দোকানদারের মতো ব্যস্ততা।

রণেন আর দীপংকরকে দেখে উদয়ের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গায়ের রং তামাটে মেরে গেছে। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুলে সামান্য পাক ধরেছে। গায়ে ইটালিয়ান দোকানদারের মতো রঙিন লম্বা টি-শার্ট। তবু চেহারায় এখনো সেই পুরোনো অভিজাত্য।

কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে দীপংকরকে একহাতে জড়িয়ে ধরল। উদয়ের শরীরে ঘাম, চীজ, টমেটো, পেঁয়াজ—সব কিছু মিলিয়ে দীপংকর অন্যরকম একটা গন্ধ পেল অথবা আরোপ করতে চেষ্টা করল। রূপকথার শর্তপূরণের দায় থেকে উদয় কবেই ছুটি নিয়েছে। তবু দীপংকর জিজ্ঞেস করল, 'তোর নিজের বিজনেস্ কে

দেখছে? নাকি এ দোকানটার ফ্র্যানচাইজ্ নিয়েছিস?'

উদয় হা হা করে হাসল, 'কেন, আমি এখানে কাজ করতে পারিনা?'

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় উদয় কিছুক্ষণের জন্যে ওদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। গাড়িতে যেতে যেতে দীপংকর আবার একই কথা জানতে চাইল। উদয় বলল, 'আগের বিজনেস বিক্রি করে দিয়েছি। এটা পাটনারশীপে চালাচ্ছি· ইটালীয়ান পার্টনার। আমাদের আরও দুটো পিৎজা স্টোর আছে।'

দীপংকর এবারও যেন স্বস্তি পেল। উদয় যে পিৎজার দোকানের কর্মচারী না হয়ে, তার অর্ধেক অংশের মালিক হয়েছে, এই অনেক। চাকরি-বাকরি যখন করবেই না, ব্যবসাই ভালো মতো চালিয়ে যাক। উদয়ের জীবনের ভালোমন্দ দেখার দায় কেউ কখনো দীপংকরের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। তবু উদয়কে কষ্ট করতে দেখলে কেমন যেন দুঃখ হয়।

ওদের সেদিন উদয়ের বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকা হল না। দীপংকরের হোটেলে রাতে বিজনেস ডিনার আছে। উদয় আর তার বউ অনেক করে বলা সত্ত্বেও ওদের বাড়িতে ডিনার করা সম্ভব হল না। উদয়ের বউ এর নাম ভাগ্যলক্ষ্মী। উদয় 'লছমী' বলে ডাকছিল। ইন্দোরের সুন্দরী কন্যা ইংরিজি, হিন্দি, ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলার সময় খুবই সৌজন্য দেখাল। চা খেতে খেতে গল্প হোচ্ছিলো। হঠাৎ বাইরের দরজা খুলে তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে বাড়ি ফিরল। মোমের পুতুলের মতো একটা বোন। আর তার ফর্সা রোগা, রোগা দুটো দাদা। উদয় কাছে ডেকে পরিচয় করাল, 'দিস্ ইজ ইওর দীপ্ আংকেল, মাই কলেজ মেট।'

ওদের নাম ওরা নিজেরাই বলল, 'রণজয়, সঞ্জয়, সোহিনী।'

হিউস্টন থেকে ফেরার পর আর কখনো ওদের সঙ্গে দীপংকরের দেখা হয়নি। এত বছর পর গল্প লিখতে বসে সে উদয়ের ভাবনাচিন্তাগুলো অনুধাবন করতে চেষ্টা করছিল। দীপংকর লিখছিল—অনেকদিন আমাদের মধ্যে যোগাযোগ নেই। তবু মাঝে মাঝে উদয়ের কথা মনে হয়। আমেরিকা চলে আসার পেছনে আমাদের কত জনের কত গল্প ছিল। সুখের এক অর্থ যদি প্রাচুর্য্য হয়, উচ্চাশার সংজ্ঞা যদি হয় আরও পড়াশোনা, বড় চাকরি—তবে সে সুখের মুখ অনেকেই হয়তো দেখেছে। আমার নিজের জীবনও কি সেই অর্থে সফল নয়? আমেরিকা আমাকে আশার অতিরিক্ত দিয়েছে। দেশে থাকলে একটা ভালো চাকরি নিশ্চয়ই

পেতাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আত্মীয়স্বজনকে যতখানি সাহায্য করতে পেরেছি, তা কখনোই পারতাম না। আমার উপার্জনের ডলার আমার বৃদ্ধ বাবাকে বেহালায় ছোট্ট বাগান ঘেরা নতুন বাড়িতে বসে শীতের রোদ পোহানোর অধিকার দিয়েছে। মা পাড়াপড়শীদের নিয়ে ভি.সি.আর এ আমার মেয়ের সুইট-সিক্সটিন পার্টির ছবি দেখেছেন। যোধপুর পার্কে সুমনার নামে ফ্ল্যাট কিনেছি। ডলারের জোরে দুই বোনের ভালো বিয়ে দিতে পেরেছি। বেহালার সেই ভাড়া বাড়িটাকে ক্রমশ যেন গতজন্মের পটভূমি বলে মনে হয়। আমার ভাই বোনেরা পড়াশোনায় তেমন ছিল না। আমার সিটিজেনশীপের দৌলতে ওরা আমেরিকায় চলে এসেছে। বাড়ি কিনেছে। গাড়ি চড়ছে। এইসব মধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্যে 'ইমিগ্রেশন' এক নতুন জীবনের সূচনা করেছে। আমরা সেই সত্তর ভাগ বাঙালির ছেলে, যাদের প্রথম প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল দমদম থেকে নিউ ইয়র্কের পথে।

শুধু জানতে ইচ্ছে করে—উদয়, তুই কেন এদেশে এসেছিলি? তোর তো প্রাচুর্য্য হাতের মুঠোয় ছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা যদি বলিস, সেও কি তোর পূর্ণ হয়েছে? জানিনা, কীসের আকর্ষণে আজও পড়ে আছিস। কে জানে? হয়তো সুখের অনুভবও আপেক্ষিক। আমার বউ সুমনা তোর ভাগ্যলক্ষ্মীর মতো স্বামীর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার এমন অপচয়, কিছুতেই মেনে নিতে চাইত না। আমরা 'কেরিয়ার' বুঝি। ইহুদীদের মতো আমাদেরও মধ্যবিত্ত রক্তে শিক্ষাই একমাত্র অহংকার, একমাত্র মূলধন। হয়তো সে জন্যে আমাদের অর্জিত সুখের সংজ্ঞাও আলাদা। তোর, আমার সকলেরই বোধহয় নিজস্ব কিছু আনন্দ আছে, চরিতার্থতা আছে। একজনের আনন্দের স্বাদ, চরিতার্থতার স্বরূপ অন্যজনের বোধের বাইরে।

আমি এর ভিত্তিতেই জীবনের সাফল্যের পরিমাপ করেছি। সেখানে কিছু গড়ে নেওয়া, কিছু জমিয়ে তোলার মধ্যে মূল উদ্দেশ্য ছিল—জন্মসূত্রে না পাওয়া যতকিছু, তাকে নিজের উদ্যম আর কর্মক্ষমতা দিয়ে অর্জন করা। শিক্ষা ছিল আমার হাতিয়ার। উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মিশেছিল সেই হাতিয়ারে শান দেওয়ার একাগ্রতা। একপুরুষে বনেদীয়ানা, অর্জন সম্ভব হয়না জেনেও আর নতুন করে মধ্যবিত্ত সম্পর্ক গড়ে তুলিনি। অবস্থাপন্ন পরিবারে বিয়ে করেছি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এভাবেই জীবনকে হিসেব করে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছি। যদিও জানি, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।'

দীপংকরের মনে পড়ল উদয় একদিন ক্লিনটন আর্মস্ হোটেলের ঘরে বসে বলেছিল, 'অ্যাচিভ্‌মেন্ট কথাটার তোর কাছে যা মানে, বেশির ভাগ লোকের কাছেই হয়তো তাই। আমার শুধু মনে হয়, এত লড়ে কি হবে রে? বেঁচে থাকার জন্যে একটা বেসিক্ স্ট্যান্ডার্ড মেইন্‌টেন করা নিয়ে কথা...'

সেদিন দীপংকর উদয়কে বলতে পারেনি, বেঁচে থাকার বেসিক স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে গিয়েই তার বাবার নাভিশ্বাস উঠে গেল। উদয় সে লড়াই দ্যাখেনি। তাই অনায়াসে ভেবে নেয় অ্যাচিভ্‌মেন্ট মানে অকারণ পরিশ্রম। ও কিছুটা ঝোঁকের মাথায় এদেশে চলে এসেছিল। যখন যেমন, তখন তেমনভাবে কাজকর্ম জুটিয়ে চালিয়ে গেল চিরকাল। বিয়ে করে বেসিক স্ট্যান্ডার্ডের জন্যেই নিশ্চয়ই ব্যবসার কথা ভেবেছিল। তিনটে পিৎজার দোকানের অর্ধেক মালিক হয়ে তার চেয়ে অনেক ভালোভাবেই তো রয়েছে। শরীরের পরিশ্রম ওকে বিশেষ ক্লান্ত করত না। শুধু মনটাকে ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধতে পারত না। খুব জটিল কোনো বিষয়ের মধ্যে যেতে চাইত না। হিউস্টনে শেষবার দেখা হতে দীপংকরকে হেসে বলেছিল, 'আমি এখন এদিকের নামকরা তবলচি জানিস? প্রত্যেক ফাংশানে বাজাচ্ছি। গান গাইতেও ডাকে। হারমোনিয়ামটা এখনো আছে।'

সেদিন উদয়ের চোখেমুখে প্রসন্নতার ছায়া পড়েছিল। আজ দীর্ঘদিন পরেও দীপংকর অনুভব করে—রূপকথার শর্তের মতো একটি সুখের ভাবনাকে সে সযত্নে বাঁচিয়ে রখেছে। যেন তেল রং-এ আঁকা বহু পুরোনো ছবি—অনুজ্জ্বল, তবু ঐতিহ্যময়। দীপংকরের দেখা একমাত্র রাজকুমার স্বেচ্ছা নির্বাসনেও তার রানি আর অরুণ, বরুণ, কিরণমালাকে নিয়ে সুখে আছে।

———

রাজা সলোমনের দরবারে

অ্যাঞ্জেলিকা গ্যাভিয়ারোর সঙ্গে আসা লোকজন চলে যাবার পরে আমি এই সংসারকে বাইরের মানুষের দৃষ্টি নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের সম্পর্কে অন্য লোকের বিচার-বিশ্লেষণ কেমন হওয়া সম্ভব, সে সব আন্দাজ করতে গিয়ে ভেবেছিলাম—এই পরিবেশের বাসযোগ্যতা নিয়ে নিশ্চয় তাদের কোনো সংশয় থাকবে না। আমাদের কি নির্ভর করার মতো মানুষ বলে মনে হয় না?

স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ্ ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসের লোকেরা যা যা জানতে এসেছিল, তার বেশির ভাগ উত্তর পেয়ে গেছে। আমাদের ইনকাম কত, কে কী কাজ করি, শরীরগতিক কেমন, এগুলো তো জানাতেই হল। তারপরেও কত প্রশ্ন। জানতে চাইছিল বাড়িতে মেড্ আর বেবি সিটার রাখি কিনা। আমাদের দুজনের কারুর অ্যালকোহলের প্রবলেম আছে কিনা, ড্রাগের ব্যাপার, পুলিশের রেকর্ড এমনকি শমীক আর পলার স্কুলের অ্যাক্টিভিটি পর্যন্ত জানতে চাইল। খবর নেহাত কম নেয়নি। চারজনকেই তো ফ্যামিলি সাইকোলজিস্টের সঙ্গে বসতে হল। ভদ্রলোকের ইভ্যালুয়েশনের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

সুজয় আর আমাকে সরিয়ে দিয়ে ওরা যখন শমীকদের ডাকল সে সময় রান্নাঘরে কফি তৈরি করতে গিয়েছিলাম। অ্যাঞ্জেলিকা সঙ্গে থেকে ট্রেতে কাপ প্লেট সাজাচ্ছিল। ওকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সবাইকে এত কথা জিজ্ঞেস করে? নাকি ইন্ডিয়ান বলে বেশি খোঁজখবর নিচ্ছে?'

'না। এটাই নিয়ম। বাইরে থেকে একটা ফ্যামিলিকে কতটুকু বোঝা যায়? অনেকরম ইনফরমেশন, ভেরিফিকেশনের দরকার হয়, বুঝতেই পারো?'

'তাতেও কিন্তু বিশেষ কিছু জানা যায় না। আজ একটা ইম্প্রেশনের ব্যাপার ছিল। সবাই বেশ তৈরি হয়ে বসেছিলাম।'

'জানি। তবে সোশ্যাল সার্ভিস থেকে যে টিমকে ইভ্যালুয়েট করতে পাঠায়, তারাও তো মোটামুটি অভিজ্ঞ লোক। কোথাও সন্দেহ থাকলে রিপোর্টে জানিয়ে দেয়। তখন আবার ফ্যাক্ট্স্ ফাইন্ডিং ভেরিফিকেশন, তারপর ডিসিশন্।'

অ্যাঞ্জেলিকা ডিনার পর্যন্ত থাকল না। প্রায় বিকেল হয়ে এসেছিল। পেছনের কাঠের ডেকে খাবারদাবারগুলো নিয়ে গেলাম। বার-বি-কিউ গ্রিলের ঢাকনা খুলে ভেতরে গোল গোল কাঠকয়লা সাজিয়ে দেবার সময় সুজয় বলছিল, 'চাকরির ইন্টারভিউতেও এত কথা বলিনি। তার ওপর তোমার কী স্টেটমেন্ট। আমাদের নাকি লাইফে ঝগড়া হয় না। শুনে সাইকোলজিস্টটা পর্যন্ত অবাক।'

'ওঁরা মোটেই ছোটখাটো ঝগড়ার কথা জানতে চায়নি। বাড়িতে বড় রকম অশান্তি কিছু আছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করছিল।'

ট্রেতে চিকেন সাজিয়ে সস্ ঢালতে গিয়ে খেয়াল হল শিশিটা ভেতরে ফ্রিজে রয়েছে। পলাকে নিয়ে আসতে বললাম। পলা ফিরে এসে স্যালাড কাটতে বসল। মুখ ভর্তি শশার টুকরো নিয়ে বলল, 'আমাকেও ফাইটের কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

সুজয় সামান্য বিরক্ত হল, 'দ্যাট ওয়াজ নট্ রাইট। নিজেরা যা বলেছি সেই তো যথেষ্ট। আবার বাচ্চাদের কাছে বাড়ির ঝগড়াঝাটির কথা জানতে চাইবে কেন?'

'তোমাদের ফাইটের কথা না। শমী আর আমি বেশি ফাইট করি কিনা, বলতে বলছিল। শমী আমাকে হিট্ করে কিনা, ড্যাড শমীকে কতবার হিট্ করেছে...' পলা এক নিশ্বাসে ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছিল।

সুজয় গ্রিল জ্বালিয়ে দিয়ে বলল, 'ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে গেল এ বাড়িতে মারধর খাওয়ার চান্স আছে বুঝলে ওরা তোমার মেয়েকে পাঠাবে না।'

শমীক ডেকের সিঁড়িতে বসে ম্যাগাজিন দেখছিল। সুজয়ের কথা শুনে হাসল, 'ড্যাড্ তুমি আমাকে কতবার মেরেছ ঠিক করে বলতেই পারলাম না। ভারবাল্ অ্যাবিউজের কথাতেও সময়মতো একটাও মনে পড়ল না। অথচ লাস্ট ইয়ারেও স্টুপিড বলেছ। অ্যাটলিস্ট থ্রি টাইমস্ 'ইডিয়ট' বলেছ।' পলা খুব হাসছিল।

খাওয়া দাওয়া মিটে যাবার পর ওরা ভেতরে গেল। কতক্ষণ ওক গাছের নীচে বসে বসে জেনির কথা ভাবছিলাম। বসন্তের বিকেলে বেশিক্ষণ আলো থাকে না। সন্ধের পর ঘরে ঘরে ল্যাম্প জ্বলছিল। শীত শেষ হলে দীর্ঘকাল বন্ধ থাকা জানলায় কাচ আর জালের শাটারগুলো অনেকখানি করে উঠিয়ে দিয়েছি। বসন্তের

হাওয়ায় জানলার পর্দা লণ্ডভণ্ড। বাড়ির ভেতর কে কী করছিল জানি না। শমীক আর পলা কাল হোমওয়ার্ক নিয়ে বসেছিল। এখন ওপরে কি নীচে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত বোধহয়। সুজয় নিশ্চয়ই ফ্যামিলি রুমে। টিভিতে এ সময় ইন্টারন্যাশনাল নিউজ থাকে। উঠে গিয়ে কী আর নতুন খবর শুনব? তার চেয়ে বাগানে বসে থাকি। আজকের দিনটার কথা ভাবি। খুব আশা করেছিলাম, আজই একটু আভাস পেয়ে যাব। অ্যাঞ্জেলিকা যাই বলুক, বাইরে গিয়ে ভেরিফিকেশন করে কী পাবে ওরা? শমীক, পলার স্কুলে গেলেও যা ওদের ডাক্তারের কাছে গেলেও তাই। একই খবর পাবে। আমাদের বাড়িতে চাইল্ড অ্যাবিউজের কোনো ঘটনাই নেই। দুরন্তপনার জন্যে শমীকে তবু ছোটবেলায় চড়-চাপড় মেরেছি। পলা তো একদিনও মার খায়নি। এমনিতেও কিছু মিথ্যে বলিনি। ওদের অসুখ-বিসুখের কথা জিজ্ঞেস করাতে শীতকালে যে মাঝে মাঝে শমীকের কানের পাশে সামান্য একসিমার মতো হয়, সেও বলেছি। এদেশে সব সম্ভব। পরে জেনির কখনো স্কিনের প্রবলেম হলে হয়তো শমীকের এক্‌সিমার খবর এনে ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস আমাদের দোষ দেবে। প্রত্যেকের সুখ-অসুখ আগে থেকে বলে দেওয়া ভালো।

কখন সুজয় বাইরে এসে বসেছিল। আমি জানি, ও এখনও নানা কথা ভাবছে। আমি যে শুধু শুধু একটা দায়িত্বে জড়িয়ে পড়ছি, ছেলে মেয়ে আট-দশ বছরের হয়ে যাবার পর নতুন করে জেনিকে এনে সমস্যা বাড়াচ্ছি—এ নিয়ে ও গোড়াতে বেশ আপত্তি করেছিল। কিন্তু শমীক আর পলা এমন হইচই লাগাল যে তিনজনের এত ইচ্ছে দেখে সুজনকে রাজি হতে হল।

উইলো গাছের নীচে চাপ চাপ অন্ধকারে হঠাৎ হঠাৎ জোনাকির আলো। কাঠবেড়ালিগুলো সন্ধে নামতে কাঠের ডেকের তলায় ঢুকে পড়েছে। ওখানে ওদের সারা বছরের আস্তানা। দুটো তিনটে মেঠো খরগোশও একপাশে থাকে। পাখিদের সাড়া নেই। বুনো হাঁসের ঝাঁক ডানায় ঝড় তুলে কখন গলফ্ কোর্সের দিক থেকে উড়ে গেছে। বাগানে একটানা ঝিঁঝির ডাক।

নিস্তব্ধতা ভেবে সুজয় বলল, 'তোমাকে প্রথম দিকে একটু ডিস্‌কারেজ করেছিলাম এই সব কথা ভেবেই। সোশ্যাল ওয়ার্কাররা যদি সব সময় এসে ইন্টারফিয়ার করে...।'

'বার বার কি আর আসবে? আজকেই তো সব দেখে শুনে গেল।'

'দ্যাখো! ঝামেলা না হলেই ভালো।'

'ঝামেলা আর কী? বেশি ভাবলেই ওরকম মনে হয়। সবাই মিলে একটা বাচ্চার দেখাশোনা করতে পারব না?'

'বাচ্চাটাই কতদিনে আসে দ্যাখো। ফর্মালিটির যা পর্ব দেখছি। তারপর ইন্ডিয়া যাওয়া নিয়েও প্রবলেম হবে মনে হচ্ছে।'

'কিচ্ছু প্রবলেম হবে না। শমীদের কত টুকুটুকু নিয়ে দেশে গেছি। একটু সাবধানে রাখলেই ঠিক থাকে। বেশিদিন তো থাকব না।'

'তুমি শিওর। ওরা জেনিকে আউট অফ্ কান্ট্রি যেতে দেবে?'

'বাঃ মুন্নার ছেলেকে নিয়ে দেশে গেল না ওরা?'

'রুণু, তুমি কিন্তু আসল ব্যাপারটা মনে রাখছে ন। মুন্নারা বাচ্চাকে আডপ্ট করেছে। ও তো লিগ্যালি ওদেরই ছেলে। ওদের সঙ্গে যেখানে খুশি যেতে পারে।'

আমি সত্যিই জেনিকে আনার শর্তগুলো ভুলে যাই। ওকে তো অ্যাডপ্ট করছি না। ফস্টার চাইল্ড হিসেবে বাড়িতে রাখতে চাইছি। আর সেই জন্যেই বেশি চিন্তা-ভাবনা না করে অ্যাঞ্জেলিকার কথায় রাজি হয়েছিলাম।

অ্যাঞ্জেলিকার সঙ্গে আমার ক্লেয়ারমন্ট স্কুলে কাজ করতে করতে আলাপ হয়েছিল। ও স্প্যানিশের টিচার। আমি স্কুল লাইব্রেরিতে ভলানটারি সার্ভিস করি। আর স্কুলের পেরেন্টস্ টিচার্স অর্গানাইজেশনের কিছু খুচরো কাজ। অ্যাঞ্জেলিকা বেশ ব্যস্ত মানুষ। দুটো-তিনটে সোশ্যাল সার্ভিস গ্রুপের সঙ্গে কাজ করে। গরিব স্প্যানিশ, কালো আর পর্টুরিক্যানদের জন্যে ওদের নানারকম প্রজেক্ট আছে। আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার সোশ্যাল কমিট্‌মেন্ট কতখানি? প্রায়ই তো বলো যে উইক্ এন্ডে তোমাদের কমিউনিটি নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকো।'

'আমাদের ক্লাব আছে। তার অনেক অ্যাক্‌টিভিটি থাকে। কিছু সোশ্যাল সার্ভিসও হয়। তবে ফান্ড রেইজ্ করে সাহায্য করার দরকার-টরকার হয় না। এমনিতে নিজেদের মধ্যে বেশ একটা সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি হয়েছে। এমার্জেন্সিতে সবাই সবাইকে সাহায্য করে।'

আসলে বারো মাস আমাদের ফাংশান আর পার্টিতে নেমন্তন্ন খাওয়ার কথা না বলে ওকে আমি ইন্ডিয়ানদের কালচারাল এক্সপোজার, রিলিজিয়াস কনফারেন্স, লিটারারি ম্যাগাজিন পাব্‌লিশ করা, এমনকি হেরিটেজ ধরে রাখা—এই সব ভালো

ভালো কথাগুলো বোঝাতে চাইছিলাম। যাতে আমার সামাজিক জীবন সম্পর্কে অ্যাঞ্জেলিকার বেশ ভালো ধারণা হয়।

কিন্তু অ্যাঞ্জেলিকা অন্য কথা বলল, 'তোমরা ইন্ডিয়ানরা মোর অর লেস সাকসেসফুল। অন্য ইমিগ্রান্টদের তুলনায়, এমনকি আমেরিকানদের তুলনায় তোমাদের অ্যাভারেজ ইনকাম যা, ওয়েল অফ সোসাইটি বলতে তাই-ই বোঝায়। আমেরিকার সোশ্যাল কাজের জন্যে তোমাদের আরও ইন্‌ভলভড হওয়া দরকার। এখন তো এটাই তোমাদের দেশ। তুমি নিজেও ইউ এস সিটিজেন...।'

সেদিন আর কথা বাড়াইনি। কিন্তু অ্যাঞ্জেলিকা মাঝে মাঝেই এসব প্রসঙ্গ তুলত। আমরা যে গাঁ বাঁচিয়ে বিদেশে আছি, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অধিকাংশ ভারতীয় শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। নিজেদের সুখ সমৃদ্ধির জন্যে যা কিছু পরিশ্রম। ছেলেমেয়েদের জন্যে যা কিছু সঞ্চয়। ক্লাট-ট্রাব যা গড়েছি, সেও নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্যে। প্রথম জীবনে কেরিয়ার নিয়ে হিমশিম, মধ্য জীবনে কালচার। অবসর জীবনে কমিউনিটি সেন্টার। এরপরে আমেরিকার সামাজিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? আমেরিকায় খাচ্ছি, পরছি, অথচ এ দেশের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে চাকরি নয়তো ব্যবসার সম্পর্ক ছাড়া তেমন কোনো যোগসূত্র অনুভব করছি না। অন্তত আমাদের জেনারেশনের মধ্যে বেশির ভাগই তাই। আর আমরা বাঙালিরা যে কী ভীষণ কমিউন্যাল্ সে তো দেখতেই পাই। এ দেশে এসেও নন্‌বেঙ্গলি শব্দটা ভুলিনি। আমাকে অ্যাঞ্জেলিকা বলে কিনা মেইন স্ট্রিমে যোগ দিতে? কমন কাজের জন্যে সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে? কখন কী করব?

কিন্তু কোনো ভাবনা যদি ক্রমাগত মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, এক সময় তার কিছু প্রতিক্রিয়া তো হবেই। অ্যাঞ্জেলিকার কথাগুলো ধীরে ধীরে আমার ভেতরে এক ধরনের আবেগ সৃষ্টি করছিল। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে একেকটা সেন্টার দেখতে যাই। অ্যাঞ্জেলিকা ছুটির দিনে প্যাটারসনের 'এভাস্ কিচেনে' গিয়ে গরিব, হোমলেস লোকেদের জন্যে বড় বড় হান্ডা ভর্তি ভর্তি স্যুপ তৈরি করে। নানা রেস্টুরেন্টে ঘুরে ঘুরে বাড়তি খাবারদাবার যোগাড় করে। কোনো দিন নু-আর্কে ব্যাটার্ড উইমেন্ শেলটারে যায়। মারধর খাওয়া স্প্যানিশ, পর্টুরিক্যান মেয়েদের কোর্টের কাগজপত্র দেখেশুনে দেয়। মামলা হলে সঙ্গে যায়। জবট্রেনিং সেন্টারের প্রোগ্রামে ঢোকানোর ব্যবস্থা করে। স্প্যানিশ ছাড়া যারা অন্য ভাষা জানে না, তাদের

সমস্যাগুলো ওর কাছেই বলে। ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসের জন্যে পর্টুরিক্যান আর কালোদের ফ্যামিলিতে কখনো কখনো কাউনসেলিং করতে যায়। সোশিয়োলজি, স্প্যানিশ, দুটো সাবজেক্টে মাস্টাস ডিগ্রি আছে ওর। কত ভাবে অ্যাঞ্জেলিকা সমাজের কাজে লাগছে। দেখে দেখে কেমন যেন প্রেরণা পাই।

ঠিক এই রকম সময়েই অ্যাঞ্জেলিকা বলেছিল, 'বুণু, তোমরা ফস্টার পেরেন্টস্ হবে? নিজেদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে যদি আর দু'একজন গরিব ছেলে মেয়েকে কিছুদিনের জন্যেও থাকতে দাও।' ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কী বলা উচিত। এখনই কি রাজি হওয়া যায়? অচেনা, অজানা দুটো ছেলে মেয়েকে হুট করে বাড়িতে আনা যায় না। কতদিনের ব্যাপার, তাও জানি না।

অ্যাঞ্জেলিকা বুঝেছিল আমি এখনই কথা দিতে পারব না। বলেছিল, 'তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো। ওদের খরচপত্রের জন্যে স্টেট থেকে সাহায্য করবে। সেদিক থেকে কোনো প্রবলেম হবে না। তোমাদের শুধু দেখাশোনার দায়িত্ব। ভালো পরিবেশ আর একটু মায়া মমতা পেলে ওরা ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়।'

একেবারে এক কথায় অনুপ্রাণিত না হলেও আমি যেন সে সময় দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানোর কোনো উপলক্ষ খুঁজছিলাম। প্রায়ই মনে হত, শুধু নিজেদের বৃত্তের মধ্যে জীবন কেটে যাচ্ছে। উদ্‌বৃত্ত নিয়ে কী অপচয়। সকালবেলা শমীক, পলাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি আসি। ঘরে ঘরে বিছানা তুলি আর ভাবি—এ বাড়িতে হেসে খেলে আরও দুটো বাচ্চা বড় হতে পারত। ওদের অপছন্দের জামা, জুতোগুলো স্যাল্‌ভেশন আর্মিতে দেবার সময় মনে হয়—যদি নিজে হাতে কাউকে দিতে পারতাম। বেঁচে যাওয়া খাবারদাবার নিয়েও সেই আক্ষেপ। এই সব অপচয়ের দুঃখ, দয়াধর্মের ভাবনা, হয়তো আমার মনের মধ্যে সমাজসেবার উপযুক্ত একটি অবস্থার সৃষ্টি করছিল। অথবা অনুরূপ একটি জমি তৈরি করছিল। অ্যাঞ্জেলিকার সেখানে যদি কোনো ভূমিকা থাকে, তবে সে বীজবপনের ভূমিকা। কয়েকদিন সময় নিয়ে, তারপর, আমি যে ফস্টার মাদার হবার জন্যে তৈরি—সে কথা অ্যাঞ্জেলিকাকে জানিয়ে দিলাম। সুজয়কে রাজি করাতে আমার খুব বেশি সময় লাগেনি।

বাড়িতে অনেক আলোচনার শেষে একটা ব্যাপারে সবাই একমত হলাম যে—একসঙ্গে দুটি বাচ্চার দায়িত্ব নেওয়া মুশকিল। পলার খুব ইচ্ছে—ওর চেয়ে একটু ছোট একটা মেয়েকে যদি নিয়ে আসি। তার মানে, বছর ছয়েকের মতো বয়স

হলে ঠিক হবে। শমীক কেন জানি না ওর বয়সি ছেলের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাল না। ওর কথা হল, 'ডিসিশনের ব্যাপারটা ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসেস ওপর ছেড়ে দাও। ওরা যাকে পাঠাবে, সে এসে থাকবে।' আর সুজয়ের এক কথা—'বাচ্চা মেয়েটেয়ে নিয়ে এসো। টিন এজার ছেলে, মেয়ে একদম নয়। আমি কিন্তু কোনো টেনশন নিতে পারব না, এখনই বলে দিচ্ছি রুণু।'

টিন এজারের কথা আমিও ভাবিনি। সে অনেক বেশি দায়িত্ব। আবার একেবারে কোলের বাচ্চা আনব কিনা বুঝতে পারছিলাম না। অ্যাডপ্‌শন তো নয়, যে যত ছোট হয়, ততই ভালো। ফস্টার হোমের জন্যে ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস থেকে কাগজে যে সব ছেলেমেয়েদের ছবি দেয়, বেশির ভাগই দেখি টিন এজার, কি তার চেয়ে একটু ছোট। সকলে যে অনাথ আশ্রম থেকে এসেছে, তাও নয়। অযত্নে, অত্যাচারে স্টেপফাদারের কাছে রেপড হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে—এরকম কত আছে। স্টেটের খরচে লোকে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বড় হয়। একটু বড় হয়ে গেলে সহজে কেউ অ্যাডপ্ট করতে চায় না। কবে আবার আসল বাবা, মা এসে ফেরত নেবার জন্যে ঝামেলা করবে কে জানে? দেখি, আমরা আবার ঠিক যে বয়সটা খুঁজছি, পাই কিনা। বছর চার-পাঁচের একটা ছোট্ট মেয়ে কি আর পাব না?

মনস্থির করেছি জেনে অ্যাঞ্জেলিকা গ্যাভিয়ারো খুব খুশি হয়েছিল। শুধু পরে একদিন বলেছিল, 'রুণু, এটা যে সাময়িক ব্যবস্থা, ভুলে যেও না যেন। খুব বেশি ইমোশন্যাল ইন্‌ভল্‌ভ্‌মেন্ট হয়ে গেলে ছাড়তে বড় কষ্ট হয়।'

'সে সময়ে কথা এখন থেকে ভেবে লাভ নেই। চেষ্টা করব অ্যাটাচ্‌মেন্ট আর ডিট্যাচ্‌মেন্টের মাঝামাঝি একটা ব্যালান্স যদি করা যায়। অভ্যেস করতে পারলে হয়তো নিজের ছেলেমেয়ের জন্যেও একদিন কাজে লাগবে।'

প্যাটারসনের সেন্টযোসেফ্‌ হস্‌পিটালে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসেস মিসেস বিয়াংকা। ওখানে প্রথম জেনিকে দেখলাম। ছ'সপ্তাহ আগে জন্মেছে। তারপর থেকে হাসপাতালেই পড়ে আছে। ওর পর্টুরিক্যান মার নাম মারিয়া গার্সিয়া। বাচ্চা হবার পর হাসপাতালে ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে। মিসেস বিয়াংকা বললেন, 'মারিয়ার আগের বাচ্চা দুটোও এখানেই হয়েছিল। তাদের পর্টুরিকোতে নিজের মার কাছে রেখে এসেছে। আমরা জেনির জন্যে সান যুয়ানে ফোন করলাম। দিদিমা আর কাউকে নিতে রাজি নয়। এ অবস্থায় স্টেটকে ফস্টার

হোমের ব্যবস্থাই করতে হবে।'

সাদা কম্বলের ঘোমটায় ঘেরা প্রসন্ন একটি মুখ। ঘুমের ঘোরে কখনো সামান্য চমকে উঠছে। মুহূর্তের জন্যে ক্ষীণ ভুরু আর কপালে অস্বাচ্ছন্দ্যের আঁকাবাঁকা ঢেউ। মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ। চোখের পাতা খোলে কী খোলে না, কান্নার স্বর তোলে কী তোলে না, আবার নিঃসাড় ঘুমে তলিয়ে যায়।

এই দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কীভাবে বলা যায়—আমার পছন্দ হচ্ছে না। এ জিনিস আমি খুঁজছি না। বাতিল করার জন্যে কী যুক্তি দেব আমি?

মিসেস বিয়াংকা কিছু আশা করছেন। উত্তর দেওয়ার জন্যে একটু সময় নিয়ে বললাম, 'মেয়েটা বড় সুন্দর। কিন্তু মিসেস বিয়াংকা, দেড়মাসের বাচ্চা নেওয়া মানে যে প্রায় সমস্ত সময়ই তাকে দেখতে হবে। এতখানি সময় বোধহয় দিয়ে উঠতে পারব না।' মিসেস বিয়াংকা বললেন, 'জেনিকে হলপিটালে আর বেশিদিন রাখা যাবে না। অথচ অ্যাডপশনে দেওয়ার কোনও উপায় নেই।'

'কেন? লোকে তো এইটুকু বাচ্চাই চায়?'

'এখনই কতজন নিতে চাইছে। কিন্তু ওকে অ্যাডপশনে দেওয়া যাবে না। অরফ্যান তো নয়। যে কোনওদিন ওর মা এসে মেয়েকে ফেরত চাইতে পারে। জেনির জন্যে এখন ফস্টার হোম পেলে সবচেয়ে ভালো হয়। বহুদিন পর্যন্ত মারিয়া না ফিরলে কিংবা ও নিজে থেকে দিয়ে দিতে চাইলে, তখন অ্যাডপশনে দেওয়ার কথা উঠবে।'

এরপর আর ছেলেমেয়ে খুঁজে বেড়াইনি। অ্যাঞ্জেলিকা জেনির জন্যে ভেবে দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি আর সুজয় কাগজপত্রে সই করে দিলাম। পলা বেশ খুশি। শমীকও বিজ্ঞের মতো বলল, 'ভালো হল। পলার এবার ম্যাচিউরিটি আসবে। কথায় কথায় কান্না আর নালিশ করা বন্ধ হবে।'

সুজয় অ্যাঞ্জেলিকার কাছ থেকে মারিয়া গার্সিয়ার বর কোথায়, সে লোকটাই বা মেয়েকে নিচ্ছে না কেন—এসব জানতে চাইছিল। অ্যাঞ্জেলিকা খোঁজখবর নিয়ে এসে বলল, 'মারিয়া গার্সিয়ার বরটর নেই। মাঝে মাঝে ক্র্যাক্ কোকেনের জয়েন্ট থেকে লোকজন জোটায়। নিজেরও আগে কোকেন অ্যাডিক্শনের ব্যাপার ছিল। এখন অনেক ভদ্র হয়েছে। মিসেস বিয়াংকা ড্রাগ রি-হ্যাব সেন্টার থেকে খবর এনেছেন।'

বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। জন্মসূত্রে জেনি যে পরিবেশ থেকে আসছে, সেই সামাজিক স্তর আর মানুষগুলো সম্পর্কে আমার কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। শুনেছি গরিব, অশিক্ষিত হিস্প্যানিকদের মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপারটা খুব বেশি। মারিয়ার জীবনযাত্রাও তো সেইরকম। জেনি এখন থেকে যে পরিবেশেই বড় হোক, ওর বংশধারা, সংস্কার কীভাবে কাজ করবে কে বলতে পারে? আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়ে আছে। তাদের একভাবে বড় করে তুলছি। ড্রাগ জয়েন্ট, ক্র্যাক কোকেন, মারিয়া গার্সিয়ার লোক ধরে ধরে মা হওয়া, বাচ্চা ফেলে রেখে চলে যাওয়া—ঘটনাগুলো আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। অথচ আমাকে বেশ অবাক করে দিয়ে সুজয় ভরসা দিল, 'অত ভাবছ কেন? ঐটুকু তো বাচ্চা। হয়তো বেশিদিন থাকবেও না। সোশ্যাল সার্ভিস্ করবে বলেই তো আনছ? এ সব কাজে কি আর কোনো চয়েস্ থাকে?

এখানেই আমাদের দুজনের মধ্যে চিন্তাধারার তফাত ছিল। সুজয় শুরু থেকে ফস্টার হোমের ব্যাপারটাকে এক ধরনের পারস্পেকটিভে দেখেছে। সমাজসেবা, অস্থায়ী সম্পর্ক, সাময়িক দায়িত্ব—এই ভাবনাগুলো ওর মাথায় থাকত। হয়তো সেই জন্যেই জেনির বংশধারা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ওর দুশ্চিন্তা ছিল না। যেন একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়ে সময়মতো শেষ করতে পারা নিয়ে কথা। অন্তত আমার সেরকম মনে হচ্ছিল। তখন আমি কোনো অনিত্য সম্পর্কের কথা ভেবে দেখিনি। জেনির সংস্কার নিয়ে সংশয়, বড় হয়ে সে তার মা, বাবার ধাঁচ পাবে কিনা, শমীক, পলার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে—এ ধরনের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা মনে এসেছিল। জেনি আসার পর আর ওসব নিয়ে ভাবিনি।

ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস আমাদের ফস্টার পেরেন্টস্ হিসেবে উপযুক্ত মনে করে যখন জেনিকে পাঠাল, তখন ওর বয়স তিন মাস পেরিয়ে গেছে। স্টেট থেকে ওর জন্যে সাহায্য নিতে চাইনি বলে শুধু হেলথ ইন্সিওরেন্স করিয়ে দিল। আর বছরের শেষে জেনির খাওয়া পরার খরচ দেখিয়ে ইনকাম ট্যাক্স থেকে কিছু বাদ দিতে পারি—সে কথাও কাগজপত্রে লেখা ছিল। আমরা জেনির ভার নিয়েছি বলে স্টেট যেন কত কৃতজ্ঞ। মিসেস বিয়াংকা বলছিলেন, 'অনেক মধ্যবিত্ত বাড়িতে ফস্টার হোম খুলেই ভালোভাবে সংসার চলে যায়।'

'তার মানে, রোজগারের ব্যাপারও থাকে? মাসে মাসে চারশো-পাঁচশো

ডলার পাবে বলে বাচ্চা রাখে নাকি?'

'ঠিক সেরকম কিছু নয়। ডেডিকেশন নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু অ্যাফোর্ড করতে না পারলে কী করবে? সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। দুটো-তিনটে গ্রোইং এজের ছেলেমেয়ের খরচ তো কম নয়। একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে নেয়। নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আরও তিন-চারজন ফস্টার চিলড্রেন মানুষ করে। গভর্নমেন্টের সাহায্য পেয়ে সবসুদ্ধু চলে যায় একরকম।'

বাঙালি মহলে জেনি বেশ কৌতূহল জাগাল। এখানে অনেকের অ্যাডপটেড ছেলেমেয়ে আছে। যাদের দেখি, সবাই দেশ থেকে এনেছে। ফস্টার পেরেন্টস্ হলাম বোধহয় আমরাই প্রথম। তাও আবার পর্টুরিক্যান কন্যা। জেনি নামটা কেউ পছন্দ করছে না। কিছু করার নেই। ওর নাম বদলানোর এক্তিয়ার নেই আমাদের। জেনিফার নামে যে ডাক্তার ডেলিভারি করেছিলেন, মরিয়া গার্সিয়া নাকি ভক্তিভরে তাঁর নামই রেখে দিয়েছে। তাই আমরাও জেনি বলেই ডাকছি। সুজয় আবার ঠাট্টা করে বলে, 'জেনিবালা সরকার। ওর ঠাকুমার নাম মণিমালা সরকার। জেনিকে একদিন চান করিয়ে মাথায় ঘোমটার মতো করে সাদা তোয়ালে জড়িয়ে সুজয়ের কোলে দিয়েছিলাম। জেনি ব্লন্ড। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সাদা ধবধবে ভেজা চুল দেখা যাচ্ছিল। মুখে একটি দুটি দাঁত। সুজয়ের দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসল। আর সেদিনই সুজয় বলল, 'আরে! এ তো মণিমালা সরকার।' সেই থেকে হল জেনিবালা। তারপর জেনিবালা সরকার।

জেনির দেড় বছর বয়স পর্যন্ত আমার বেশ টেনশন গেছে। স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয়। বার বার এটা সেটা নিয়ে ভোগে। আজ ধুম জ্বর, কাল কানে ইনফেকশন। একবার ব্রংকিয়াল অ্যাজমার মতো হয়ে নিঃশ্বাসের কষ্টে যায় যায় অবস্থা হল। কতবার যে মাঝরাতে উঠে উঠে হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে হয়েছে। মা-র স্বভাবচরিত্রের দোষেই বোধহয় মেয়েটা এমন রুগ্ন আর ক্ষীণজীবী। ওর অসুখবিসুখের বহর দেখে সামারে দেশে যাবার প্ল্যান বাদ দিতে হল। একটু বড় করে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

একদিন ইউথ্ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস থেকে দুজন ভলান্টিয়ার এসে উপস্থিত। এরকম হঠাৎ হঠাৎ তাঁরা চলে আসেন সেই প্রথম থেকেই। বুঝতে পারি, ওঁদের আসার কারণই হচ্ছে—আমরা কীভাবে জেনিকে দেখাশোনা করছি, তার খবর

নেওয়া। সেদিন যেন সময় বুঝে জেনি তার কপাল ফুলিয়ে বসল। সকালে টেবিলের কোণায় গুঁতো খেয়ে ভুরুর ওপর দিকটা ফুলে ঢোল। তার পরেও দুরন্তপনার শেষ নেই। কালশিটে নিয়েই সমানে দৌড়োদৌড়ি করে যাচ্ছিল। একজন ভলান্টিয়ার বেশ মনোযোগ দিয়ে নীল হয়ে যাওয়া জায়গাটা দেখছিলেন। তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'জেনির ওখানে কী করে লাগল?'

'সর্বক্ষণ দৌড়চ্ছে। আজ সোফা থেকে লাফাতে গিয়ে টেবিলের কোণায় ধাক্কা লাগল। কিছুক্ষণ বরফ দিতে তবে কান্না থামল। চোখটা খুব জোর বেঁচে গেছে।'

'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওনি?'

'ব্লিডিং হলে নিয়ে যেতেই হত। সামান্য ফুলে ওঠার জন্যে বরফ দিলে বেশ কাজ হয়। পরে দুটো বেবি অ্যাস্‌পিরিন্‌ দিতে ব্যথাও কমেছে মনে হল।'

'তোমার ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যাক, আর কোনো কিছু না হলেই ভালো। জেনি, জেনি, তোমার কপালে লাগল কী করে? হাউ ডিড ইউ গেট্‌ দ্যাট্‌ বাম্‌প?'

আমার এত রাগ হল যে চট করে কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। ওঁরা কি ভাবছেন মিথ্যে কথা বলছি? জেনিকে কেউ মারধোর করেছি? সেই জন্যে ডাক্তারের কথা তুলছেন? আমার কথা বিশ্বাস হয়নি বলে জেনিকে জিজ্ঞেস করছেন?

জেনি খুব সহজে ওঁদের সন্দেহ দূর করল। টেবিলের ওই কোণায় চলে গিয়ে হাত দিয়ে দিয়ে থাবড়া মারতে লাগল। আবার কপালে হাত দিয়ে কী কী সব বলতে চেষ্টা করল। হঠাৎ ওঁদের ছেড়ে দিয়ে আমাকেই টেবিল দেখিয়ে দেখিয়ে বাড়ি মারছে দেখে টেনে সরিয়ে আনলাম। কোলে ওঠার জন্যে হাঁটু ধরে ঝুলে পড়ল।

সুজয় সহজে উত্তেজিত হয় না। সন্ধেবেলা ঘটনাটা শুনে বলল, 'দেখছ তো এদেশে চাইল্ড অ্যাবিউজ্‌ নিয়ে কত কাণ্ড হচ্ছে। ডে কেয়ার সেন্টারে, বেবি সিটারের কাছে বাচ্চারা অ্যাবিউজড্‌ হচ্ছে না? ওঁদের সন্দেহ হলে দোষ দিতে পারো না।'

'এটা ডে কেয়ার সেন্টার? নাকি আমি পয়সার জন্যে বেবি সিটিং করছি? আশ্চর্য! দেড় বছরেও একটা ফ্যামিলিকে বিশ্বাস করতে পারছে না?'

'বুণু, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়। এখন এরকমই হয়েছে। নিজের বাচ্চার

জন্যে পুলিশে ধরছে, নিউজে দ্যাখো না। আজ পলার কোথাও কেটেকুটে যাক, ডাক্তার প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। আবার আলাদা করে পলাকে জিজ্ঞেস করবে। জেনির কেসটাও তাই। নিজের মেয়ে নয় বলে আমাদের আরও কেয়ারফুল থাকা দরকার।'

জেনি যে আমাদের কেউ নয়, এ কথা মাঝে মাঝে কত জনই মনে করিয়ে দেয়। সময় হলে জেনিও জেনে যাবে। আমাদেরই ওকে বলতে হবে। অবশ্য যদি সেই বয়স পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকে। কিন্তু একটু বড় হয়ে গেলে আর কেউ কি ওকে অ্যাডপ্ট করবে? তখন আমরা কী করব? মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে গেলে, অনেক কথা ভাবি। তিন মাস বয়স থেকে হাতে করে বড় করলাম। শমীদের কাছে শুনে শুনে মা বলে ডাকে। সকাল, সন্ধে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়। জেনি চলে যাবে ভাবতেও পারি না।

সেদিন মাস ছয়েক বাদে অ্যাঞ্জেলিকা এল। আজকাল আগের মতো দেখা হয় না। স্কুলের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছি। এখন সময় কাটানোর জন্যে তো জেনি আছে। অ্যাঞ্জেলিকা ওর জন্যে এক টিন চকলেট এনেছিল। আমরা বসে বসে কফি খাচ্ছি। জেনি টিন নিয়ে কসরৎ করছিল—টিনটা খুলে দিলাম। নিজে দুটো-একটা চকলেট মুখে পুরে আমাকে দিতে এল। নিচ্ছি না দেখে চটচটে হাতে অ্যাঞ্জেলিকাকে ধরিয়ে দিল। অ্যাঞ্জেলিকা হাসছিল। ও চকলেট হাতে নিয়ে বসে আছে দেখে জেনি হঠাৎ মাথা হেলিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'খাও, খাও!'

আজকাল জেনি মাঝেমধ্যে বাংলা বলতে চেষ্টা করে। শমীক আর পলার সঙ্গে যতক্ষণ থাকে উল্টোপাল্টা ইংরিজি চালিয়ে যায়। সোয়েটারকে বলে ফেটুর। ইয়েলোকে বলে লেলো। সুজয় প্রথম থেকে বলেছিল 'জেনিবালা'র সঙ্গে সকলে ইংরিজি বলবে। নয়তো পরে মেয়েটার ভাষা-বিভ্রাট হবে। অথচ এখন নিজেই অফিস থেকে ফিরে ওর সঙ্গে বাংলা বলে যাচ্ছে। একদিন ধরা পড়ে যাবার ভান করে বলল, 'দেখছিলাম বোঝে কিনা।'

আমি তো জানি ইংরিজিতে আদর করতে গেলে নিজের কানেই খুব স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলে ধরা পড়ে না। যেন কোথায় ফাঁক থেকে যায়। সুজয় ছাত্রজীবন থেকে আমেরিকায় আছে। তবু বুড়ির মতো ঘোমটা দেওয়া ছোট্ট জেনিকে দেখে ওর নিজের ঠাকুমার চেহারা মনে পড়ল। পর্টুরিকান মেয়ের নাম দিয়ে দিল

জেনিবালা সরকার। এরকমই আমাদের স্নেহের প্রকাশ। সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত। উচ্ছ্বাসের কি অনুবাদ হয়। তবু জেনির ভবিষ্যতের জন্যে ইংরিজিতে কথা বলা দরকার বুঝে ওর সঙ্গে সহজে বাংলা বলি না। কিন্তু ও ঠিক টুকটাক শিখে ফেলেছে। খাবার টেবিলে বসে বসে কথাগুলো শোনে। শমীক পলাকে যা বলি সব ওর বলা চাই। মাঝে মাঝে বলে ওঠে—'দাল্।' জল বলছে না ডাল বলছে, তাই নিয়ে ভাইবোনের কী রিসার্চ। শেষে ওরা বলল 'ঝাল বলছে।' পলা তো একটুতেই ঝাল, ঝাল বলে. আর জল খায়। জেনি ওই সব নকল করতে চেষ্টা করে। একদিন সুজয়কে বলে দিল, 'তক্কারি নিবি?' ওরা হেসে অস্থির।

অ্যাঞ্জেলিকা জেনির মুখে 'খাও, খাও' শুনে আন্দাজে ঠিক বুঝতে পারল। জিজ্ঞেস করল—'আমাকে ক্যান্ডি খেতে বলছে? তোমাদের ল্যাঙ্গায়েজ শেখাচ্ছ নাকি?'

'ঠিক শেখাব ভেবে বাংলা বলি না। আমরা ওর সঙ্গে ইংরিজিই বলছি। আসলে, বাড়িতে শুনে শুনে খানিকটা পিক্-আপ করছে।'

'খুব স্বাভাবিক। ছোটরা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি নতুন ভাষা শেখে। আর আমরা তো এমনিতেই বাই-লিঙ্গুয়্যাল্। জেনি শেষে তিনটে ভাষা শিখে যাবে।'

'কিন্তু ওকে স্প্যানিশ শেখাব কী করে?'

'শেখাতে হলে এখনই ঠিক সময়। না হয়, স্কুলে গিয়ে শিখবে। স্প্যানিশ জেনির মাতৃভাষা। শিখতে তো হবেই।'

অ্যাঞ্জেলিকা বুঝিয়ে দিয়ে গেল জেনি আমাকে মা বলে ডাকলেও ওর আর আমার ভাষা এক হবার নয়। তবে আমার সমাজসেবার নিষ্ঠা দেখে ওর ভালো লাগছে। এই ব্যস্ততার দেশে কত মূল্যবান সময় আর এনার্জি ক্ষয় করে এমন সৎ কাজ করে চলেছি, সে কথা ও বহুবার বলেছে। সত্যি বলতে কি প্রথম প্রথম নিজেও ভাবতাম, ঝোঁকের মাথায় এতটা জড়িয়ে পড়লাম। তখন ওই মহত্ত্ব-টহত্ত্বর কথা ভেবে নিতাম। সামাল দিতে না পারলে জেনিকে আবার ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসেস জিম্মা করে দিতে হত। ওরা নতুন ফস্টার পেরেন্টস্ ঠিকই পেয়ে যেত। শুধু শুধু আমাদের স্বার্থপরতা প্রকট হয়ে উঠত। আর এখন দু'বছর কেটে যাবার পরে জেনি যে সাময়িকভাবে আছে, সেই সত্যি কথাটাই ভুলে থাকতে চেষ্টা করি।

ইদানীং দেশে যেতে না পেরে মনটা বেশ ব্যস্ত হয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে

দেখলাম—জেনিকে অনায়াসে দেশে নিয়ে যাওয়া যায়। ফস্টার হোম থেকে যেমন ছেলেমেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যায়, সেইভাবে নিয়ে যাব। শমীক, পলার গরমের সময় লম্বা ছুটি। সবসুদ্ধু জুনের শেষাশেষি যাব ঠিক করলাম। জেনির অনেকদিন টয়লেট ট্রেনিং হয়ে গেছে। আর ডায়াপারের বোঝা বইতে হবে না। শরীরও অনেক ভালো হয়েছে। দেশের গরমে যা একটু কষ্ট পাবে। সে আর কী করা যাবে? শমীকরা তো দু-তিনবার গরম কালে গেছে। ফস্টার পেরেন্টস্ হবার কথা বাবা, মাকে প্রথমেই জানিয়েছিলাম। শশুর, শাশুড়িও জানেন। ওঁদের জেনিবালা সরকারকে দেখার ইচ্ছে হয়েছে। আমি অবশ্য ইচ্ছে করেই মারিয়া গার্সিয়ার কথা-টথা কিছু লিখিনি। দুদিনের জন্যে জেনিকে চোখে দেখবেন। অত ইতিহাস জানানোর দরকার কী?

মোটামুটি ফ্লাইটের তারিখ ঠিক হল। সময় মতো রিজার্ভেশন করে রাখা দরকার। জেনিকে ইন্ডিয়া বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি বলে ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসকে জানিয়ে দিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ্ ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সারভিসের অফিস থেকে চিঠি এল। বিশেষ দরকারে নু-আর্কের অফিসে দেখা করতে বলছে। ভাবলাম, জেনির পাসপোর্টের জন্যে বোধহয় ফস্টার পেরেন্ট হয়ে অ্যাপ্লাই করা যায় না। কিংবা ওকে ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়ার আগে কোনো ফর্মটর্ম ফিলাপ করতে হবে। সুজয় অফিস থেকে লাঞ্চের সময় বেরিয়ে আমাকে আর জেনিকে তুলে নিয়ে যাবে, এরকমই ঠিক হল।

নু-আর্কের ইউ এস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশনের বিশাল বাড়ির কাছাকাছি পার্কিং লটে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকতেই এলিভেটরের সামনে মিসেস বিয়াংকার সঙ্গে দেখা। জেনিকে নীচু হয়ে আদর করলেন। একসঙ্গে এলিভেটর উঠলাম। ছ'তলার দেখা করতে ডেকেছে। মিসেস বিয়াংকাও ওই ফ্লোরে নেমে পড়লেন।

সরকারি বাড়িগুলোর বিশাল বিশাল উইং। এক প্রান্ত থেকে ঘরের নম্বর খুঁজে খুঁজে প্রায় আর এক প্রান্তে চলে গেলাম। জেনি গুট্ গুট্ করে হাঁটছিল। মিসেস বিয়াংকাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জেনির ইন্ডিয়া যাবার ব্যাপারে কোনো প্রবলেম হবে না তো? আমাদের দেশে যাওয়া প্রায় ঠিক।'

মিসেস বিয়াংকা বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেন। জেনির জন্যে আমরা পিছিয়ে পড়ছিলাম। অনেকখানি এগিয়ে যেতে যেতে পেছন ফিরে বললেন, 'অফিসে এসো। ওখানে কথা হবে।'

আমরা একটু বাদে গিয়ে পৌঁছোলাম। ঘরে বিশেষ ভিড় নেই। বড় বড় আলমারি আর ফাইলভর্তি তাক ঘরটার দেওয়াল জুড়ে রেখেছে। একদিকের চেয়ারে পর পর বসে গেলাম। টেবিলের ওপারে দু'জন অফিসার। একপাশে মিসেস বিয়াংকা। আরও দূরে টেবিল ভর্তি কাগজপত্র বিছিয়ে দুজন মহিলা কী সব লেখালেখি করছেন। অফিসাররা জেনিকে লক্ষ্য করছিলেন। জেনি আমাদের চেয়ার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ মিসেস বিয়াংকা বললেন, 'আমি একটু জেনিকে কুকি কিনে দিতে নিয়ে যাই? নীচে ক্যাফেটেরিয়াতে অন্য কিছুও খেতে পারে।'

বুঝতে পারছিলাম না উনি হঠাৎ জেনিকে নীচে নিয়ে যেতে চাইছেন কেন? ও তো এখানে কিছু অসুবিধে করছে না। এতবড় বিল্ডিং-এ কোথায় কতক্ষণের জন্যে চলে যাবে, শেষে কাজ মিটে গেলেও আমরা উঠতে পারব না। জেনির মুখ দেখে মনে হচ্ছে নতুন লোকজন দেখে ঘাবড়েছে। জোর করে মেয়েটাকে কুকি খেতে পাঠানোর দরকার নেই। বললাম, 'থ্যাংক ইউ মিসেস্ বিয়াংকা! জেনি আসার আগেই লাঞ্চ খেয়ে এসেছে। এখন আর কিছু খাবে না বোধহয়।'

'আইসক্রিম খেতে পারে? মিসেস্ সরকার, ওকে কিছুক্ষণের জন্যে যেতে দিলে ভাল হয়।'

অফিসাররা যেন সেরকমই চাইছিলেন। সুজয় সোজাসুজি জানতে চাইল, 'জেনি থাকলে কথা বলাব অসুবিধে আছে?'

'আমাদের দিক থেকে নেই।'

সুজয় যেন কিছু বুঝে নিল। জেনিকে বলল, 'আমরা এখানেই আছি। তুমি আইসক্রিম কিনে আনো। মিসেস বিয়াংকাকে নিয়ে যাও।' সুজয় ওর হাতে তিনটে ডলার ধরিয়ে দিতে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেল।

সামনের টেবিলে রাখা জেনির ফাইল নাড়াচাড়া করতে করতে বয়স্ক অফিসারটি চশমা খুলে নিলেন। কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলাম না। একটু নার্ভাস লাগছিল। জেনির ব্যাপারে আমাদের দিক থেকে কোনোরকম অবহেলা অযত্নের খবর পেয়েছেন কি? যখন তখন কেসওয়ার্কাররা বাড়িতে এসে ওকে দেখে যায়।

কী জানি, কোথায় কী দোষ ত্রুটি পেল?

—'জেনিকে তোমরা বেশ যত্ন করে বড় করছ। কেসওয়ার্কারদের রিপোর্ট খুব ভালো।'

ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেল। জেনির জন্যে যদি শেষে চাইল্ড অ্যাবিউজ আর নেগ্‌লিজেন্সের অপবাদ নিতে হত, তারচেয়ে লজ্জার কিছু আছে? বিনা দোষে কী ঝামেলায় পড়তাম। সত্যি মিথ্যে প্রমাণ করাটা তো পরের কথা। হিউমিলিয়েশনের চূড়ান্ত হত।

যাক। জেনি যে আদর যত্নের মধ্যে মানুষ হচ্ছে, সে তো নিজেরাই বললেন। সুজয় ভদ্রতা করে ধন্যবাদ জানিয়ে একবার ঘড়ি দেখল। জেনি এসে পড়ার আগে কথাবার্তা হয়ে যাওয়া ভালো। মহিলা অফিসার রোস্যান জ্যানেট এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। বয়স্ক অফিসারটি রোস্যান্‌কে শুরু করতে বললেন। মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি উকিলের চিঠি পেয়েছ? জেনির ব্যাপারে?'

'উকিলের চিঠি! না, সেরকম কিছু তো পাইনি।'

'খুব সম্ভব পাবে। মাঝে একটা ঘটনা হয়েছে। প্রায় তিন বছর অপেক্ষা করে, জেনির ব্যাপারে আমরা মরিয়া গার্সিয়াকে স্যান্‌য়ুয়ানের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলাম। মা হিসেবে ওর অধিকার আর বেশিদিন যে বজায় রাখা যাবে না, জেনিকে অ্যাডপ্‌শনে দেবার আগে খবরটা তাকে জানানো দরকার ছিল। স্টেট্ ডিপার্টমেন্ট থেকে আইন অনুযায়ী এগুলো করতে হয়।'

সুজয় বলল, 'কিন্তু জেনিকে অ্যাডপ্‌শনে দেবার প্রশ্ন আসছে কেন? তোমাদের রিপোর্ট বলছে—আমরা ভালোভাবেই ওকে মানুষ করছি...।'

'ফস্টার হোম হচ্ছে এক ধরনের টেম্‌পোর‍্যারি অ্যারেঞ্জমেন্ট। জেনির জীবনের জন্যে কোনো পার্মানেন্ট সলিউশন্ নয়। তোমরা সাময়িক ওর দায়িত্ব নিয়েছ। চিরকাল যে রাখতে পারবে, এমন নিশ্চয়তা কিছু নেই। কলেজে পড়ানোর খরচও অনেক। ওর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আমরা নষ্ট করে দিতে পারি না। অ্যাডপ্‌শনে যে নেবে, সে নিজের মেয়ে থাকলে যা যা করত, জেনিকেও সেই সুযোগ দেবে। আশা করছি, পরিস্থিতি বুঝতে পারছ?'

আমি শুধু ভাবছিলাম, আমাদের অজান্তে কত কী ঘটে গেছে। এরা এরই মধ্যে জেনিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। খুঁজে খুঁজে মারিয়া গার্সিয়াকে চিঠি

দিয়েছে। অন্য জায়গায় ওকে অ্যাডপ্‌শনে দেবার বন্দোবস্ত করছে। অথচ আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। আমরা জেনির ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিচ্ছি? যে কোনো সময় ওকে পথে বের করে দিতে পারি? ওর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি? কীভাবে মানুষের সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়ে যায়। আমরা ফস্টার পেরেন্টস্ সত্যি কথাই। কিন্তু জেনিকে তো স্টেটের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে বড় করিনি। যা করেছি, নিজের মনে করেই করেছি। আর যদি ত্যাগ স্বীকার করেছি বলেও ভাবি, সে কি শুধু সমাজ সেবার জন্যে? এত দিনে ওর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি? ক্ষোভে দুঃখে কি যে বলব ভেবে পেলাম না।

তবু কী ঘটছে জানা দরকার। ওঁদের জিজ্ঞেস করলাম, 'জেনিকে কেউ অ্যাডপ্ট করতে চাইছে?'

'সেরকম সিচুয়েশন হলে, প্রথমে তোমাদের কাছে অ্যাপ্রোচ্ করার কথা। গভর্নমেন্ট জোর করে কাউকেই সে দায়িত্ব নিতে বলতে পারে না। ফস্টার পেরেন্টেসর ইচ্ছে না থাকলে তখন আর কোথাও পার্মানেন্ট ব্যবস্থা করতে হয়। আর, অ্যাডপশনের মধ্যে দিয়ে সেটা সম্ভব। তারপরে স্টেট আর লায়াব্‌ল্ থাকে না।'

সুজয় এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার অফিসারের কথা শেষ হতে বলল, 'ধরো, আমরা দুজনে জেনিকে অ্যাডপ্ট করতে চাই। কতদিনের মধ্যে ডিসিশন নিয়ে স্টেটকে জানাতে হবে?'

মনস্থির না করে সুজয় একথা বলবে না। কিন্তু তাহলে কেন আবার অতিরিক্ত সময় চাইছে? আমার ইচ্ছের কথা ও খুব ভালোই জানে। শুধু শুধু কথা দিতে দেরি করছে কেন? অধৈর্য হয়ে সুজয়কে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, টেবিলে ফোন বাজল।

মিসেস বিয়াংকার ফোন। জানতে চাইছেন এবার জেনিকে ওপরে নিয়ে আসবেন কিনা। অফিসার বলে দিলেন দশ মিনিট পরে আসতে। আমিও চাইছিলাম না মেয়েটা এ মুহূর্তে এ ঘরে আসুক। বয়সের তুলনায় ওর ভালোই বোধবুদ্ধি হয়েছে। একেবারে যে কিছু বুঝ না এমন নয়। সুজয়ের কথায় রোস্যান জ্যানেট বললেন— 'আমরা সেইরকম আশা করেছিলাম। কিন্তু এখন খুব সমস্যা হয়েছে। মারিয়া গার্সিয়া জেনিকে নিয়ে যেতে এসেছে। জন্মের পর থেকে জেনিকে দেখাশোনা করেনি বলে ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস থেকে এতদিন অপেক্ষা করে

শেষে ওর নামে চিঠি দেওয়া হল। জানানো হল—এরপর আর মেয়ের ওপর ওর কোনো অধিকার থাকবে না। এরকম খবর দেওয়াও দরকার। আসল মায়ের খোঁজপত্র পাওয়ার জন্যে স্টেটকে অপেক্ষা করতেই হবে।'

রোস্যানের কথার মাঝখানে ফোন বাজল। অন্য টেবিলে কেউ ফোনটা ধরল। আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম ক্রমশ ঘটনা আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। সুজয় জানতে চাইল—'মারিয়া থাকে কোথায়?'

'এখন এখানেই থাকে। নিউজার্সির সুপিরিয়র কোর্টে কেস করেছে। মারিয়া আর ওর এখনকার স্বামী হোসে আর্নেজ দুজনে মিলে মারিয়ার বায়োলজিক্যাল রাইট দেখিয়ে জেনিকে ফেরত চাইছে।'

সেদিন ঘটনার গুরুত্ব না বুঝে প্রথম দিকে ভেবেছিলাম জেনিকে আমরা জিতে নেব। অন্য কেউ অ্যাডপ্ট করার আগে তাকে আমরা পেয়ে যাব। আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছেই সব। যে মুহূর্তে জানলাম কে আমাদের আসল প্রতিপক্ষ, সেই মুহূর্ত থেকে ওকে হারাবার ভাবনায় বড় বিষণ্ণতার মধ্যে দিয়ে দিন কাটতে লাগল। অ্যাঞ্জেলিকা আসে। মিসেস বিয়াংকার কাছে যাই। আমাদের পুরনো উকিল মারভিন স্টাইনফেল্ডের অফিসে গিয়ে কী ভাবে কী করা যায় আলোচনা করি। অথচ ফস্টার পেরেন্টদের কনটেস্ট করার কোনো উপায় নেই। মারিয়া গার্সিয়ার কেসের ব্যাপারে স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস যা করার করছে। ওরা সাইকোলজিস্ট পাঠাল। জেনির সঙ্গে তিনি আমাদের সামনেই স্প্যানিশে কথা বললেন। সে একবর্ণ বুঝল না। ওঁর সঙ্গে জেনি পর্টুরিকো বেড়াতে যাবে কিনা ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করায় সবেগে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। প্যাটারসনে অন্য একটা বাড়িতে আরও দুজন বাচ্চার কাছে গিয়ে থাকবে কিনা জিজ্ঞেস করতে উল্টে জেনি তাঁকে খবর দিল, 'আমরা প্লেনে চড়ে ইন্ডিয়া যাচ্ছি।'

আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। পরে ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস থেকে খবর পেলাম, জেনি সম্পর্কে তাঁর ইভ্যালুয়েশন হল—এই পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে পাঠিয়ে দিলে ওর মনের ওপর খুব চাপ পড়বে। অ্যাঞ্জেলিকা ভরসা দিয়ে গেল—এই পয়েন্টগুলো কেসের জন্যে খুব কাজে লাগবে।

বাঙালি বন্ধুবান্ধবরা যে কীভাবে সাহায্য করবে বুঝতে পারছে না। কেউ

বলে সেনেটারকে লেখো। কেউ বলে লোক্যাল কংগ্রেস ম্যানের কাছে গেলে হয়তো কাজ হবে। কিন্তু আমেরিকান লিগ্যাল সিসটেমকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা নেই আমাদের। নিউজার্সির সুপ্রিম কোর্ট রুল করে দিয়েছে—নিজের মার অধিকার সবচেয়ে আগে। সে তার কর্তব্য করুক, না করুক, ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাক, দুচার বছরের মধ্যে ফিরে এলে তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে।

জেনির জন্যে সুপিরিয়র কোর্টের জাজ কার স্বার্থ দেখবেন? মেয়েটার স্বার্থ বিবেচনা করলে তো ওকে ওই অশিক্ষিত, দায়িত্বজ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর মা-র কাছে থাকতে দেওয়াই উচিত নয়। মারভিন স্টাইফেলড্ আইনের এক-আধটা ফাঁকফোকর খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছেন। অবস্থা বুঝে পরে সুপিরিয়র কোর্টে অ্যাপিল করব।

বাড়িতে সব সময় যেন চাপা টেনশন। জেনিকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করি। শমীক ভরসা দিয়ে বলে, 'ওদের ড্রাগের প্রবলেম থাকলে জেনিকে পাবে কিনা সন্দেহ। পেলেও বেশিদিন রাখতে পরবে না দেখো।'

'অদ্ভুত জেদ। যারা নিজেরা এত গরিব, আরও তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে আবার কীসের জন্যে জেনিকে চাইছে?'

'পভার্টি কিন্তু কোনো ক্রাইম নয় মা। ওখানে আমাদের কিছু এক্সট্রা পয়েন্টস্ নেই। শুধু ক্র্যাক কোকেন অ্যাডিকশন থেকেই ওদের ডিস্অ্যাড-ভ্যানটেজ থাকতে পারে।'

স্কুল থেকে ফেরার পর পলা মিউজিক টেলিভিশন দেখতে বসলে জেনিকে সেখান থেকে নড়ানো যায় না। ঘুরে ঘুরে কত রকম নাচের চেষ্টা। আজকাল পলার আর বেশিক্ষণ টিভি দেখতে ভালো লাগে না। এক একদিন মন খারপ করে নিজের ঘরের দরজা লক করে বসে থাকে। বুঝতে পারি কান্নাকাটি করে। জেনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডেকে ডেকে হয়রান। কচি গলার চিৎকার শুনতে পাই, 'হেই পলা। ওপন্ দ্য ডোর। লেট্ মি গেট্ ইন...'

রাতে শুয়ে শুয়ে সুজয় আক্ষেপ করে, 'কেন যে মেয়েটাকে প্রথম থেকে অ্যাডপ্ট করলাম না। সব রকম রেসপন্বিসিলিটি নিলাম। অথচ সময় থাকতে লিগ্যাল রাইট এসট্যাব্লিশ করতে পারলাম না।'

'জেনিকে তখনও অ্যাডপ্ট করা যেত না। সিচুয়েশন তো একই ছিল।'

দিনের বেলা বাড়িতে শুদু জেনি আর আমি। কাজের মধ্যে থাকি। তবু সারাক্ষণ কী যে এক অস্থিরতা। ভাবি, কেন আমি এ সবের মধ্যে গিয়েছিলাম? শমীক ছিল, পলা ছিল। অভাববোধ, নিঃসঙ্গতার দুঃখ বলে তো কিছু ছিল না। তবে কি সেই সমস্যাবিহীন জীবনকে খুব গতানুগতিক বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম? নাকি অ্যাঞ্জেলিকাকে দেখে দেখে নিজেকে নেহাত গণ্ডিবদ্ধ মানুষ বলে মনে হত? স্বার্থপর, সাধারণ, সংসারী মানুষ? সীমাবদ্ধতার সেই দৈন্য কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় কিছু কি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম? মহত্ত্বের উদাহরণ রাখার জন্য, ভারতীয় মেয়ে হিসেবে আমেরিকার সোশ্যাল কাজে নাম লেখানোর জন্যে, প্রথম দিকে জেনিকে কি উপলক্ষ হিসেবে নিয়েছিলাম? তবে এখন কেন সেভাবে চিন্তা করতে পারছি না? কেন বারবার অ্যাটাচমেন্ট আর ডিট্যাচমেন্টের মধ্যে ভারসাম্য হারাচ্ছি? আসলে আমরা কোনো শর্ত মনে রাখিনি।

শেষপর্যন্ত মারিয়া গার্সিয়ার আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল। স্টেট ডিপার্টমেন্টে অফ ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসেস কেসওয়ার্কাররা জাজকে অনেক অ্যাপিল করেও রাজি করাতে পারল না। জেনি যে সম্পূর্ণ অচেনা জগতে গিয়ে পড়বে, তার এতদিনের আশ্রয় হারিয়ে দারিদ্র্যের সংসারে গিয়ে কষ্ট পাবে, এই সত্যি কথাগুলো তিনি কানেই নিলেন না। কোর্ট থেকে আলাদা সাইকোলজিস্ট পাঠিয়েছিল। তিনি জেনিকে ইভ্যালুয়েট করার পর তাঁর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই জাজ রায় দিয়ে দিলেন। নিজের মা আর ভাইবোনদের নাকি কোনো বিকল্প নেই। সাড়ে তিন বছর বয়সেও জেনি অনায়াসে তাদের সঙ্গে থাকতে পারবে।

স্টেট থেকে আবার চিঠি পেয়ে নু-আর্কের অফিসে গেলাম। আমরা অ্যাপিল করতে চাই শুনে ওঁরা কিন্তু তেমন ভরসা দিলেন না। সুপ্রিম কোর্টের রুল নিয়ে আর কিছু করা যাবে না বলেই ওঁদের ধারণা। মারিয়া গার্সিয়া এখন বর ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছে। এ অবস্থায় জেনিকে ফিরিয়ে দিলেই ভালো। নয়তো নতুন করে কেসের ঝামেলায় পড়ে যাব।

জেনির দায়মুক্ত হবার নিয়মগুলো জেনে নিতে হল। দুজন কেসওয়ার্কার এক এক করে বোঝাতে লাগলেন, 'জাজ ফ্লোরিও ট্র্যানজিশন পিরিয়ড ঠিক করে দিয়েছেন। ছ'মাসের মধ্যে জেনিকে পুরোপুরি ফিরিয়ে দেবার সময় দিয়েছেন।'

সুজয় বলল, 'ঠিক বুঝলাম না। মাসের ছ'মাস কী করতে হবে?'

'প্রথম প্রথম সপ্তাহে তিনদিন করে জেনিকে নিয়ে মারিয়া গার্সিয়ার বাড়িতে যাবে। সঙ্গে একজন কেসওয়ার্কার থাকবে। ক্রমশ দিন আর সময় বাড়াতে হবে। তারপর তোমরা নিজেরা যাওয়া কমিয়ে দিও। এক সময় আর জেনির সঙ্গে যেও না। কেসওয়ার্কার নিয়ে যাবে। ওখানে বসে থাকবে। আবার ওকে তোমাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। আশা করা যায়, মাসতিনেক পর থেকে জেনি একা ওদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো দিনের বেলার ব্যাপার তো?'

'প্রথম দিকে তা-ই। তারপর, জেনি ওখানে রাতেও থাকতে শুরু করবে। ছ'মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে অভ্যেস করিয়ে দিলে ওর পক্ষে অ্যাডজাস্ট করতে খুব বেশি কষ্ট হবে না। আর এজন্যে তোমাদের হেলপ দরকার সবচেয়ে বেশি।'

বুঝতে পারলাম আর কিছু করার নেই। কোর্ট কেস করতে যাওয়া মানে হয়তো শুধু অশান্তি আর টানাপোড়েন সার হবে। আমরা ঠিক সেরম অ্যাগ্রেসিভ্ ধরনের মানুষ নই। ল'ইয়ার স্টাইন্‌ফেলড যাই বলুন, জেনিকে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্রথম যেদিন অ্যাঞ্জেলিকা গ্যাভিয়ারোর সঙ্গে জেনিকে নিয়ে প্যাটারসনে গেলাম, মারিয়া গার্সিয়ার মুখোমুখি হতে হবে ভেবে বেশ অস্বোয়াস্তি হচ্ছিল। কে জানে কেমন ব্যবহার করবে? চোখে তো দেখিনি কখনো। জীবনযাত্রার যেটুকু আভাস পেয়েছিলাম, তাতে তার ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ সম্পর্কেও সন্দেহ ছিল।

মেইন স্ট্রিটের কাছে পুরনো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর একতলায় মারিয়া আর হোসের সংসার। ডোরবেল বাজাতে ম্যাজিক আই দিয়ে কে যেন উঁকি দিয়ে দেখল। খানিকক্ষণ বাদে দরজা খুলে দিল। পর্টুরিক্যান লোকটির কোলে ছোট্ট বাচ্চা। অ্যাঞ্জেলিকা স্প্যানিশে পরিচয় দিতে যাচ্ছিল। লোকটি ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে ভেতরে যেতে বলল।

লিভিং রুমে গিয়ে বসলাম। ময়লা সোফার পাশে আর একটা সোফা বেড পাতা। দুটো মেয়ে বসে বসে টিভি দেখছিল। একজনের বয়স বছর আট-দশের বেশি হবে না, কি আরও কম। আর একজন বছর পাঁচেকের। লক্ষ্য করলাম জেনির মুখের সঙ্গে ছোটটার বেশ মিল। ওরা জেনিকে বারবার দেখছিল। কোলের ছেলেটা

নিশ্চয়ই হোসে আর্নেজের। হোসে, অ্যাঞ্জেলিকার সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলছিল। কাছেই টি মার্কেটে মাংস কাটার কাজ করে। মারিয়া দুধ কিনতে গিয়ে দেরি করছে দেখে যেন একটু অপ্রস্তুত ভাব। হোসে নিজে থেকেই জেনির সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছিল।

জেনির কাছে সাড়াশব্দ না পেয়ে হোসে বলল, 'স্প্যানিশ শিখতে বেশি দেরি হয় না। বাড়িতে থাকতে থাকতে শিখে যাবে।'

আসলে আমরা একটু আগে আগেই এসে পড়েছি। অচেনা এলাকা ভেবে হাতে বেশ সময় নিয়ে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু পাড়াটায় এসে বেশি ঘুরতে হয়নি। চট্ করে বাড়ির কাছাকাছি পার্কিং পেয়ে যাওয়াতে ওদের বাড়িতে আগেই পৌঁছে গেছি।

অ্যাঞ্জেলিকা মেয়ে দুটোকে প্রায় একসঙ্গেই জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের নাম কী?' বড়জন বলল, 'পাওলা।' শুনে জেনি বলে উঠল, 'পলা।' মেয়েটা সাড়া দেবার মতো করে হাসল। ছোটটাকে আবার নাম জিজ্ঞেস করাতে দিদির গা ঘেঁসে ঘেঁসে গাম চিবোতে লাগল। একটু পরে গোলাপি চিউইংগাম সুদ্ধু জিভ বের করে বলল, 'কারলা।'

ডোরবেল বাজল। বড়জনের পেছন পেছন ছোটটাও উঠে গেল। বাইরে গলার আওয়াজ। কেন যে মনে হচ্ছে, এবার বোধহয় নাটকের মতো কিছু একটা ঘটে যাবে। কতদিন ধরে এই মুহূর্তের কথা ভেবেছি। নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরি করতে চেয়েছি। আজ আমার সংযত থাকার কথা। সহজভাবে মারিয়ার সঙ্গে কথা বলার কথা। তবু সে এসেছে জেনেও জেনিকে আমি কোল থেকে নামালাম না। শক্ত করে দু'হাতে ধরে রাখলাম।

মারিয়া ঘরে এল। তার সঙ্গে জেনির সাদৃশ্য ধরা যায়। বয়স বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। তামাটে গায়ের রং। এক মাথা ঘন চুল কাঁধ ছাড়িয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। ক্লান্ত, বিষণ্ণ মুখ। এক দুর্বল প্রতিপক্ষের মতো দূরে দাঁড়িয়ে। যেন আমাদের করুণার অপেক্ষায়।

কে কাকে করুণা করে? মারিয়া কি জানে না জেনিকে সে সারা জীবনের জন্যে অধিকার করে বসে আছে? শুধু তিন বছরের দায়িত্ব নিয়ে আমি কি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি? মারিয়া জেনির কাছাকাছি এল। ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রথম কথা

বলল, 'জেনি!' তারপর হাঁটু ভেঙে বসে জেনিকে কোলে তুলে নিল। বিড়বিড় করে স্প্যানিশে কিছু বলছিল। দেখলাম জেনির গালে গাল ঠেকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে।

জেনি বেশ থতমত খেয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ। অ্যাঞ্জেলিকা আমার হাত ধরে সামান্য চাপ দিল। আমার ভেতরে কী ঘটে যাচ্ছে, ও ছাড়া কেউ কেই বা বুঝবে? জেনি জোর করে মারিয়ার কোল থেকে নেমে পড়ল। আমার কাছে এসে বাড়ি যাব বলে অস্থির করতে লাগল। যখন ওঠার তোড়জোড় করছিলাম, মারিয়া বারবার জিজ্ঞেস করছিল আমরা 'এস্‌পযানিয়ল' জানি কিনা। জেনি জানে কিনা? কেউ ওদের ভাষা জানি না বলাতে খুব হতাশ মনে হল। নিশ্চয়ই ভেবে পাচ্ছিল না কী ভাষায় মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে? চলে আসার সময় অ্যাঞ্জেলিকাকে স্প্যানিশে বলল, 'অনেকদিন পুয়েতোরিকোতে ছিলাম। তবে ইংরিজি জানি।

ওর বর হোসে আর্নেজ আবার অভয় দিল, 'জেনি শিগ্‌গিরই স্প্যানিশ বলবে।'

সেদিন অফিস থেকে ফিরে সুজয় এমন কোনো কথা তুলল না যাতে আবার সেই মন খারাপ করা কথাবার্তা শুরু হয়। বেশ আগ্রহ দেখিয়েই যেন জানতে চাইল, 'ওদের বাড়িঘর কেমন দেখলে? হোসে লোকটা কী করে? অ্যাটিচিউড ভালো তো?' আমি বুঝতে পারছিলাম সুজয় মারিয়ার প্রসঙ্গে আসতে চাইছিল না।

শমীক, পলা বারবার জিজ্ঞেস করছিল জেনি ওখানে কীভাবে রি-অ্যাক্ট করছে? ওর ভাইবোনেরা কত বড়?

একসঙ্গে কত প্রশ্নের জবাব দেব? তবু যা দেখে এসেছি, মোটামুটি বললাম। রাতে জেনি শুয়ে পড়ার পরে আমরা ফ্যামিলি রুমে গিয়েছিলাম। সুজয় শেষ পর্যন্ত মারিয়ার কথা জিজ্ঞেস না করে পারল না। ওই নাটকীয় মুহূর্তের বিবরণ দেওয়া যে আমার পক্ষেও কষ্টকর হবে। এই ভেবেই বিকেল থেকে বেশি প্রশ্ন করেনি। কিন্তু আমিও তো না বলে পারছিলাম না। নিজের লোক ছাড়া কেই বা বুঝবে? শুধু জেনিকে ফিরিয়ে দিতে হবে বলে নয়, মারিয়া আর হোসের বাড়ির অবস্থা দেখে এসে আরও যেন মন খারাপ হয়ে আছে।

সুজয় বলল, 'মেয়েটার যে কী ভবিষ্যৎ! ভাবলে দুঃখ হয়।' পলা যেন খুব মিনতি করে বলল, 'তুমি জেনির গড্‌মাদার হতে পারো না? তাহলে ও এখানে এসে থাকতেও পারবে। আমরা ভিজিট্ করব। গিফট নিয়ে যাব।'

শমীক বলল, 'আমাদের উচিত ওদের টাইম টু টাইম হেলপ করা। অবশ্য যদি কন্‌ট্যাক্ট রাখতে দেয়। শুধু জেনিকে গিফট না দিয়ে আরও কিছু করা যায়।'

আসলে জেনি কষ্টে থাকবে ভেবেই ওদের এত চিন্তা। বললাম, 'জেনি ওখানে সেট্‌ল করে যাক। তারপর তোমাদের প্যাটারসনে নিয়ে যাব।'

জেনিকে কেসওয়ার্কাররা সত্যি কথা বলার দায়িত্ব নিয়েছে। মারিয়া যে তার আসল মা আর ছোট্টবেলায় জেনিকে হারিয়ে ফেলার পর এতদিন বাদে খুঁজে পেয়েছে, এরকমই বোঝানোর চেষ্টা চলছিল। আর আমরা হচ্ছি খুব দয়ালু পরিবার। জেনিকে বড় দয়া করেছি। কিন্তু অতটুকু মেয়ে কি এসব বোঝে? মারিয়ার বাড়িতে যাবার দিন এলে কেসওয়ার্কারদের দেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। গাড়িতে ওঠার সময় কান্নাকাটি। আমি সঙ্গে যাই না। জেনি ফিরে এসে বিকেলে নালিশ করে, 'আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো দেয়ার। আই ডোন্ট লাইক্ টু কল্ হার মামি।' কোনোদিন বলে, 'আই নো, ইউ আর মাই মামি। রাইট মা?'

তখন আমি সেই নিষ্ঠুর ধর্মাবতারের কথা ভাবি। ইচ্ছে হয় জেনিকে তাঁর সামনে নিয়ে যাই। শুধু তাঁর অবিবেচনার জন্যে একটি শিশুর এমন যন্ত্রণা আর টানাপোড়েন। তবু হুকুম নড়চড় হবার উপায় নেই। মারিয়াদের ভাষা বোঝে না বলে ওর আরও কষ্ট। সারাদিন অচেনা পরিবেশে কাটিয়ে যখন বাড়ি আসে, তখন আমাদের কাউকে ছাড়তে চায় না। রাতে ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে। কিন্তু কী করব? এভাবেই ওকে অভ্যেস করাতে হবে। তারপর, একদিন আর ফিরবে না। ধীরে ধীরে সেও সহ্য হয়ে যাবে। বিচারক কত অভিজ্ঞ মানুষ। বলেছেন, 'নিজের মা, ভাইবোনের কখনো বিকল্প হয় না। তবে এতদিন পর্যন্ত আমরা জেনির কে ছিলাম?'

দেখতে দেখতে জেনির যাবার সময় হয়ে এল। মাঝে বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। তিন বছর আগে বসন্তকালে জেনি এসেছিল। আর এখন গ্রীষ্ম শেষ হতে চলেছে। আজ বাগানে বার-বি-কিউ করলাম। অ্যাঞ্জেলিকা আর মিসেস বিয়াংকা এসেছেন। জেনি বেশ কয়েকদিন পরে প্যাটারসন থেকে আজ ওঁদের সঙ্গেই ফিরল।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে সবাই বাগানে বসেছিলাম। মিসেস বিয়াংকা বলছিলেন, 'কী তাড়াতাড়ি সময় চলে যায়। মনে হচ্ছে এই সেদিন তুমি সেন্ট যোসেফে গিয়ে জেনিকে দেখলে। খুব ছোট বাচ্চা চাও না বললে। পরে আবার

ওকেই নিয়ে এলে।'

'আমরা সবাই জেনিকে খুব এনজয় করেছি মিসেস বিয়াংকা। ও আমাদের বাড়িটাকে ভরিয়ে রেখেছিল। এজন্যে অ্যাঞ্জেলিকার কাছে, আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।'

আজকাল আমি আর সুজয় নিজেদের মধ্যেও এই সব কথাই বলি। জেনি কেন শুধুমাত্র বিষণ্ণতার স্মৃতি হয়ে থাকবে? আমরা তো তাকে শৈশব থেকে বড় করে তোলার আনন্দ পেয়েছি। একটি শিশুর উপস্থিতির মাধুর্য কি মুহূর্তে মুহূর্তে উপভোগ করিনি? জেনির মধ্যে দিয়ে আমরা পরস্পরের ধৈর্য দেখেছি। একজন অন্যজনের চোখে মহৎ হয়ে উঠতে চেয়েছি। কখনো অসুস্থ জেনির জন্যে কত উদ্বেগে রাত কেটেছে। হাসপাতালে গেছি। বাড়িতে দুটো ছোট ছেলেমেয়ে ঘুম ভেঙে বসে থেকেছে। জেনি আমাদের এক অভিজ্ঞতা। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনার অবিমিশ্র অনুভূতি।

আমার কথার পর শুধু সুজয় একবার বলল—'খুব চেষ্ট করেও জেনির ভবিষ্যতের ভাবনা একেবারে ছেড়ে দিতে পারছি না। অথচ কীভাবে যে হেলপ্ করা যায়?'

আইসক্রিমের গাড়ির ঘণ্টা শুনে জেনি ছুটতে ছুটতে আসছিল। সুজয়ের পকেটে ওয়ালেট নেই। আবার বাড়ির ভেতর জেনিকেই পাঠাতে হবে। কিন্তু জেনি এদিক এল না। বাগান দিয়ে দৌড়ে রাস্তার দিকে চলে গেল। জানলা দিয়ে পলা চিৎকার করে বলল, 'হেই জেন, স্যামি ডাজ্‌ন্ট ওয়ান্ট এনি...।' ভাবলাম ওরাই ওকে ডলার দিয়েছে। জেনির গলা শুনতে পেলাম, 'টু ভেনেলা ডাবল্ স্কুপ্। চকলেট স্প্রীংক্‌লস্।'

সুজয়ের কথার সূত্র ধরে অ্যাঞ্জেলিকা বলল, 'মারিয়া আর হোসে মিলে চালিয়ে নিতে পারবে। মিট-কাটারদের রোজগার খারাপ নয়। ইউনিয়ন আছে। অনেক বেনিফিট আছে। মারিয়াও পরে কাজকর্ম শুরু করতে পারবে।'

জেনি আবার এদিকে আসছে। দু'হাতে দুটো বড় বড় ভ্যানিলা আইসক্রিমের কোন্। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তোমাকে আইসক্রিম কিনতে ডলার দিল?'

'মারিয়া দ্য আদার মামি।'

জেনি তবে মারিয়াকে মা বলছে। সেই গরিব মা ওর হাতে ক'টা ডলার

দিয়েছে। সেইজন্যে সুজয়ের কাছে আইসক্রিমের দাম চাইতে আসেনি।

নাকে মুখে ভ্যানিলা, চকলেট মেখে জেনি আমার আরও কাছে চলে এল। নিজের আইসক্রিমটা টর্চের মতো তুলে ধরে বলল, 'ইউ ওয়ান্ট এ লিক্?'

'না, তুমি শেষ কর। পলারটা তো গলে যাচ্ছে জেনি?'

'হ্যাভ এ লিক্ ড্যাড। ইটস গুড...।' জোর করে সুজয়কে একটু খাইয়ে দিয়ে জেনি দোতলার জানলার দিকে ঘুরে চিৎকার করল, 'হেই পাওলা। কাম অন্। ক্যানট্ হোলড ইট এনি মোর...।'

বলতে বলতে দুই কনুই দিয়ে গড়িয়ে পড়া চকলেট মেশানো দুধ চেটে নিল। এই প্রথম আমি জেনির রূপান্তর লক্ষ্য করলাম। ধীরে ধীরে অন্য এক পরিবার, ওকে আকর্ষণ করছে। মারিয়াকে আজ আমার কাছে অন্য মানুষ বলে চেনাল। এই মুহূর্তে মারিয়ার কিনে দেওয়া আইসক্রিম হাতে ধরে পলাকে নয়, যেন ওর ওই বাড়ির বোন পাওলাকেই ডাকছে। ওর জীবনে আমাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে এসেছে। সুজয়ের জেনিবালা সরকার আবার কখন জেনি গার্সিয়া হয়ে গেছে।

———

গৃহযুদ্ধের শেষে

ম্যাডিসন হোটেলের ককটেল লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে কাবেরী যখন বিয়েবাড়ির ভিড়ে দেবজিৎকে খুঁজছে—সনৎ এসে হাসতে হাসতে খবর দিল, 'এত বছর বাদে দেবু ওর হারানো গার্লফ্রেন্ডকে ডিসকভার করেছে! তোমার জন্যে ড্রিংক আনতে গিয়ে ওখানেই ভিড়ে গেছে। জিন অ্যান্ড টনিকটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল।'

কাবেরী ভুরু কুচকে বলল, 'কী অদ্ভুত! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। একটা লোককে চিনি না...'

সনৎ কাবেরীকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চলো, ওরা তোমার জন্যে ওয়েট করছে। ইন ফ্যাক্ট, আমিও বিশেষ কাউকে চিনি না। মারিয়া অফিস ছেড়েছে প্রায় দু'বছর। তা-ও দেখছি বিয়েতে কয়েকজনকে ডেকেছে।'

ওরা এগিয়ে যেতে যেতে একটা ছোট জমায়েতের মুখোমুখি হল। একদল আমেরিকান মহিলা, পুরুষ হাতে পানীয়ের গেলাস নিয়ে গল্প জুড়েছে। ককটেল লাউঞ্জের দু'ধারে, লম্বা লম্বা টেবিলে সাজানো অ্যাপেটাইজার্সের স্টেশনের সামনে লাইন পড়ে গেছে। কিউবানদের বিয়ের পার্টি মানে অনেক লোকজন, বিরাট জাঁকজমক। কাবেরী দুপুরবেলায় চার্চে মারিয়ার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ভেতরে-বাইরে যত ভিড় দেখছে, আগে কোনো আমেরিকানদের বিয়েতে সেরকম দেখেনি।

লোকেদের পাশ কাটিয়ে লাউঞ্জের ওপাশে পৌঁছে কাবেরী দেবজিৎকে দেখতে পেল। এক আমেরিকান মহিলার দিকে ঝুঁকে পড়ে গল্প করছে। সনৎ ওদের কাছে গিয়ে বলল, 'হিয়ার ইজ ইয়োর প্রিটি ওয়াইফ। নাউ, টেক কেয়ার অফ হার। আমি এবার স্ন্যাকস নিতে যাচ্ছি।'

দেবজিৎ কাবেরীর পিঠে হাত রেখে আলাপ করাল, 'আমার বউ কাবেরী। এ হচ্ছে ক্যারেন। অনেক বছর পরে আমাদের দেখা হল।'

ক্যারেন হাত বাড়িয়ে দিল, 'নাইস মিটিং ইউ! আমি ডেভকে ইন্ডিয়ায় মিট

করেছিলাম। 'বোধহয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে। আজ ডেভ তো আমাকে চিনতেও পারেনি।' দেবজিৎ হাসল, 'তখন কলেজের ছাত্রী ছিলে। এখন সেই চেহারাটাই মনে পড়ছে। কিন্তু তুমি যে কী করে চিনতে পারলে!'

ক্যারেন এক চোখ টিপে হেসে উঠল, 'কারণ, তুমি এখনও আগের মতো হ্যান্ডসাম আছ।'

উঁচু হিল পরে কাবেরীর পা ব্যথা করছিল। এসে পর্যন্ত বসতে পারেনি। দেবজিৎ না একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়েছে, না ওর জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে অ্যাপেটাইজার নিয়ে এসেছে। তার ওপর অর্ধেক বুক, পিঠ খোলা এই মহিলার সঙ্গে এত বকবক করছে যে, কাবেরীর বিরক্ত লাগছে। ডিনারেও এক টেবিলে বসতে হলেই হয়েছে। দু'গেলাস ওয়াইন খেলে দেবজিতের ফুর্তি বেড়ে যায়। সঙ্গে ইনি বসলে তো সোনায় সোহাগা! কাবেরী দেবজিৎকে বলল, 'আমাকে একটা চেয়ার এনে দেবে? আর দাঁড়াতে পারছি না।'

দেবজিৎ বলল, 'চলো, ওদিকে সোফায় বসবে। আমাদের তো খাওয়াও হয়নি। তোমাকে বসিয়ে আমি স্ন্যাকস নিয়ে আসছি।'

কাবেরীর গলায় ঝাঁঝ ফুটল, 'আর কখন অ্যাপেটাইজার খাবে? এবার তো ডিনারে গিয়ে বসতে হবে। আশ্চর্য! গল্পে এমন মত্ত হয়ে গেল যে, আমাকে ডেকে আনার কথাও মনে হল না! কে ওই দেঁতেল মহিলা?' দেবজিৎ হাওয়া বুঝে তাড়াতাড়ি খাবার আনতে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলল, 'আরে, সনৎকে তো ওই জন্যেই পাঠালাম। দাঁড়াও, ফিরে এসে সব বলছি।'

সাতটার সময় ওরা যখন ব্যাঙ্কোয়েট ডিনারে বসল, দশজনের টেবিলটা ভরে যেতে কাবেরী আশ্বস্ত হল। ক্যারেন ধারেকাছে নেই। বোধহয় ড্যান্স ফ্লোরের অন্য দিকটায় বসেছে। সনতের বউ রীনা ইন্ডিয়া গেছে। সনৎ একাই দেবজিৎদের টেবিলে বসেছে। বাকি আমেরিকানরা ওদের অফিসের সহকর্মী। কাবেরী তাদের বউদের সঙ্গে খেজুরে আলাপ চালিয়ে যাওয়ার ফাঁকে দেবজিৎকে লক্ষ্য করছিল। একটু যেন উচাটন ভাব।

লাইভ ব্যান্ডের বাজনা দিয়ে রিসেপশন শুরু হতে ডিসক জকি তার গালের সঙ্গে লাগানো মাইক্রোফোনে নবদম্পতির শুভ আগমন ঘোষণা করল। তার আগে ওদের বাবা, মায়েরা হাত ধরে জোড়ায় জোড়ায় হেঁটে ঢুকলেন। তারপর ব্রাইডস

মেইডস, গ্রুমস মেন তারাও হাত ধরাধরি করে আনন্দে প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। সবশেষে তুমুল হর্ষধ্বনি আর ব্যান্ডের বাজনার তালে তালে মারিয়া আর তার বর মিগেল বিশাল হলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

এরপর লাগাতার নাচ, গান, শ্যাম্পেন, টোস্ট বক্তৃতা, আবার নাচ, গান, কেক কাটা, ফুলের তোড়া ছোঁড়াছুঁড়ি, যা যা হয়ে যাচ্ছিল, তার ফাঁকে দেবজিৎ কাবেরীকে নিয়ে ড্যান্স ফ্লোরে একটু নেচে নিল। নাচের পর টেবিলে ফিরছে না দেখে কাবেরী তাড়া দিল, 'ডিনার সার্ভ করছে। টেবিলে চলো। খাওয়া হলেই উঠে পড়ব। কখন সেই বেলা বারোটায় বেরিয়েছি।' দেবজিৎ রেগে উঠল, 'সবেতেই এত ইরিটেশন কেন? এসে পর্যন্ত দেখছি রাগ রাগ ভাব! একটা দিন আমি অফিসের কলিগদের সঙ্গে গল্প করতে পারব না? মারিয়া আমার ডিপার্টমেন্টে ছিল। মিগেল এখনও আমাদের অফিসে আছে। বিয়েতে ডেকেছে। ওদের সঙ্গে কথা না বলেই চলে যাব?'

কাবেরী কথা না বাড়িয়ে টেবিলে ফিরে এল। স্যালাড, স্যুপ দিয়ে খাওয়া শুরু হয়েছে, তখনও দেবজিতের দেখা নেই। একটু পরে ফিরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'এখনও ঘাসপাতা চিবোচ্ছ?'

'স্যুপটা কেমন?'

কাবেরী উত্তর দিল, 'ভালো। তোমার স্যুপটা তো ঠান্ডাই হয়ে গেল। সিট ডাউন, ডিনারের সময় কেন যে ঘুরে বেড়াও।'

দেবজিৎ খাওয়া শুরু করার একটু পরেই মারিয়া আর মিগেল ওদের টেবিলে সকলের সঙ্গে কথা বলতে এল। সঙ্গে ভিডিয়ো ক্যামেরা ঘাড়ে ফটোগ্রাফার। ওদের সঙ্গে টেবিলের দশজনের ছবি উঠল। এক সময় মারিয়ার বাবা, মা-ও এসে আতিথেয়তা করে গেলেন।

হঠাৎ কাবেরী দেখল ক্যারেন এদিকে আসছে। দেবজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে ক্যারেনের দিকে হাত তুলতে মহিলা কাছাকাছি এল। 'ডেভ, আমার ই-মেল অ্যাড্রেসটা রাখো। তোমার যে বিজনেস কার্ডটা দিলে, সেটা হারিয়েছি মনে হচ্ছে। এনিওয়ে, তুমি-ই মেল করো। আবার কখনো দেখা হলে ভালো লাগবে।'

'দেখা হতেই পারে। রেড ব্যাংক তো খুব দূরে নয়।' বলতে বলতে দেবজিৎ ক্যারেনের 'ই-মেল-এর ঠিকানা পকেটে রাখল। ক্যারেন ওদের 'গুডনাইট' বলে

হলের দাজার দিকে গেল। ফ্লোরে তখন উদ্দাম নাচ চলেছে। পার্টি শেষ হওয়ার মুখে দেবজিৎরা উঠে পড়ল।

বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে যেতে যেতে দেবজিৎ বড়লোক কিউব্যান আমেরিকানদের কথা বলছিল। এরা ফিদেল কাস্ত্রোর জমানা ছেড়ে অনেক বছর আগে হাভানা থেকে আমেরিকায় চলে এসেছিল। মারিয়ার বাবা ডাক্তার। আত্মীয়, বন্ধুরাও শিক্ষিত বড়লোক। কাবেরী জিজ্ঞেস করল, 'ওই ক্যারেনকে তো কিউব্যান কিউব্যান মনে হল না। তোমার সঙ্গে কলকাতায় দেখা হল কী করে?'

'কলকাতায় নয়, দিল্লিতে। কলেজ থেকে ইন্টারন্যাশনাল ইউথ ফেসটিভ্যালে প্রোগ্রাম করতে গিয়েছিলাম। ক্যারেনদের একটা দল গিয়েছিল নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে। সবাই ইয়ুথ হস্টেলে ছিলাম। ওদের নিয়ে আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি গিয়েছিলাম। তখন আমাদের কম বয়স। একদল ইয়াং আমেরিকান ছেলেমেয়ের সঙ্গে জুটে গিয়ে ক'দিন খুব হইচই করেছিলাম।'

'ওরা কলকাতায় যায়নি?'

'সবাই নয়। দু-চারজনের সঙ্গে ক্যারেন গিয়েছিল। তখন আবার শান্তিনিকেতন, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর গেলাম। ক্যারেন বাঙালি ডিনার খেতে আমাদের বাড়িতেও এসেছিল। ঠাকুমা ওঁর ইংরেজি একবর্ণ না বুঝলেও থালায় ঘি দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'বাটার'। ওই একটা ইংরেজিই উনি বলতেন। কারণ দাদুর নাম ছিল মাখনলাল...'

দেবজিতের হাসি, থামিয়ে দিয়ে কাবেরী জানতে চাইল, 'তোমার সঙ্গে তারপর আর কনট্যাক্ট ছিল না?'

'ছিল। কিছুদিন চিঠি লেখালেখি হল। তারপর যা হয়। তবে ক্যারেন অ্যান্ডারসন নামটা ভুলে যাইনি। আজ টেবল কার্ড নেওয়ার সময় লাস্ট নেম 'এ' খুঁজতে গিয়ে আচার্যের পরেই অ্যান্ডারসন চোখে পড়ল। ঠিক তখনই ক্যারেন ওর কার্ডটা তুলতে এসে আমাকে চিনতে পারল।'

'ওর বরটরকে দেখলাম না। একা এসেছিল নাকি?'

'তাই হবে। বলছিল ওর হাসব্যান্ড ক'বছর আগে মারা গেছে। মারিয়া নয়, মিগেলদের ফ্যামিলি থেকে ইনভিটেশন পেয়ে এসেছে। বোধহয় ওদের নেবার-টেবার হবে।'

বাড়ি ফেরার পর বিয়েবাড়ির সাজগোজ ছেড়ে রাতের পোশাক পরতে পরতে কাবেরী হঠাৎ বলল, 'তুমি তো এদেশে এসে অবধি ইস্ট-কোস্টে আছ। ওর খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করোনি?'

দেবজিৎ সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমার কি ধারণা আমরা দুজনেই প্রিটেন্ড করছিলাম? হ্যাঁ, যদি তখন দেখা হয়েও থাকত, তোমার কিছু বলার নেই বিকজ, আই ওয়াজ নট আ ম্যারেডম্যান। তোমার কাছে আমার কোনো কমিটমেন্ট ছিল না।' কাবেরী রেগে উঠে বলল, 'ঠিক আছে। আর চিৎকার করতে হবে না। শুয়ে পড়।'

দেবজিৎ ল্যাম্প শেডের সুইচ বন্ধ করে বিছানায় পাশ ফিরে শুল। কাবেরীর অবাস্তব কথা শোনার আর ধৈর্য নেই। আজ এত বছর বাদে ক্যারেনকে দেখে ও যে কিছুক্ষণ গল্প করেছে, তাতেই কাবেরীর রাগ হয়ে গেল। কেন যে এমন ইনসিকিউরিটিতে ভোগে? এত বছরেও দেবজিৎকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। হয়তো আবার সেই পুরনো নাটক শুরু হবে। ছেলেমেয়েকে ফোন করে নিজের সন্দেহের আভাস দেবে। ওরা নিশ্চয়ই কথাগুলো বিশ্বাস করে না। তবু ম্যারেজ কাউন্সেলিংয়ের উপদেশ দেবে। ছেলেটা চুপচাপ থাকে। কিন্তু মেয়ে যে কখন কার পক্ষে, দেবজিৎ ঠিক বুঝতে পারে না। দেবজিৎ রাজি হলেও কাবেরী ম্যারেজ কাউন্সেলরের কাছে যেতে চাইবে না। কিছুদিন মন মেজাজ ঠিক থাকবে। তারপর আবার তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে অশান্তি করবে। তুমি কেন নাটকের রিহার্সাল দিতে গিয়ে বারবার স্নিগ্ধাকে রাইড দেবে? পার্টিতে ড্রিংক নিলেই কেন ইয়াং মেয়েদের পিঠে হাত দিয়ে দিয়ে গল্প করো? দূর থেকে দেখে আমারই, অস্বস্তি হয়। একদিন যখন কেউ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের চার্জ আনবে, সেদিন বুঝবে কেন সাবধান করতাম।

অভিযোগ শুনে শুনে দেবজিৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, দু'গেলাস ওয়াইন খেলে মাঝে মাঝে একটু 'টিপসি' হয় না যে তা নয়। তা বলে একে তাকে জড়িয়ে ধরছে, এটা একদম বাজে কথা। কাবেরীকে তো বোঝাতে পারে না কত মেয়েই নিজে থেকে এসে ওর সঙ্গে গল্প করো। ও যদি একটু পিঠে হাত রেখে কথা বলে, তাতে এত রেগে যাওয়ার কী আছে। কিন্তু ওকে বোঝাবে কে?

কাবেরী ঘরে এসে কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। দেবজিৎ তখনও জেগে আছে। মনের বিক্ষিপ্ত ভাবটা কেটে গিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া

ভাবনার আসা যাওয়া। অনেক বছর আগের হারানো সময়ের অনুসঙ্গ, আবেগ উচ্ছ্বাসের স্মৃতি নিয়ে কখন ক্যারেন অ্যান্ডারসন এসে দাঁড়িয়েছে। দেবজিৎ বড় সংগোপনে সেই অস্তিত্ব অনুভব করছিল। প্রেম নয়, বন্ধুত্ব নয়, শুধু কিছু মোহাবিষ্ট মুহূর্তের উন্মাদনার স্মৃতি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঘন সবুজ অন্ধকারে জীবনের প্রথম চুম্বনের গাঢ় অনুভূতি।

ক্যারেন নিউইয়র্কে ফিরে এসে চিঠি দিয়েছিল। দেবজিৎ বেশিদিন যোগাযোগ রাখতে পারেনি। ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল, নতুন চাকরির ব্যস্ততার খেয়ালও হয়নি কখন ক্যারেনের চিঠি আসা বন্ধ হয়েছে। দু'বছর পরে ওহায়োতে পিএইচডি করতে এসে প্রথম প্রথম মনে হত ক্যারেন অ্যান্ডারসন হয়তো এখনও নিউ ইয়র্কে থাকে। তবু কখনো খোঁজ নেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রায় মধ্যবয়সে এসে দেখা হল। এই সামান্য আনন্দটুকুও কাবেরী সহজভাবে নিতে পারছে না। তন্দ্রার মুহূর্তে দেবজিৎ ক্যারেনের পুরনো চেহারাটা মনে আনতে চেষ্টা করছিল।

মাঝে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। কাবেরীর মাথায় এখন অন্য চিন্তা। অ্যারিজোনায় ওদের মেয়ে অমৃতার বাচ্চা হবে। ডাক্তার তারিখ দিয়েছে জুনের মাঝামাঝি। কাবেরী সেই মতো প্লেনের টিকিট কেটে বসে আছে। তার মধ্যে উলটো পালটা যোগব্যায়াম করতে গিয়ে দেবজিতের কোমরে বেমক্কা টান ধরল। ভুজঙ্গাসনের আশু প্রতিক্রিয়ায় হট ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে শুয়ে পড়ল। দু'দিন বাড়িতে থেকে এখন বেঁকতে বেঁকতে অফিস যাচ্ছে।

কাবেরীর ঘাড়ে এখন সব কাজ। বেসমেন্ট থেকে ভারী হার্ড টপ সুটকেসটা সবে টেনে টেনে দোতলায় তুলেছে, দরজায় টুং-টাং শব্দ। বাড়ির বাইরের ছাদে, খোলা রেন পাইপে জমে থাকা ডালপালা, পাতাপত্তর পরিষ্কার করতে দুটো লোক এসে হাজির। কাবেরীর মাঝে মাঝে সোমবার ছুটি থাকে। ঠিক দিন বুঝে দেবজিৎ 'গাটার ক্লিনিং' কোম্পানিকে আসতে বলে নিজে অফিসে পালিয়েছে।

কাবেরী দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে ওদের কাজ শুরু করতে বলে আবার সুটকেসটা নিয়ে তিন তলায় উঠছে, দরজায় ধুমধাম আওয়াজ। কী জ্বালাতন। মাঝ সিঁড়িতে স্যুটকেস রাখা যায় না। কাবেরী যতক্ষণে তিনতলায় গেস্ট-রুমে পৌঁছল, ততক্ষণে পেছনের বাগানে লোক দুটোর হল্লা শোনা যাচ্ছে। জানলায় উঁকি দিয়ে দেখল তারা জলের কলের সামনে দাঁড়িয়ে সবুজ পাইপ নিয়ে বক্তৃতা করছে।

কাবেরী জানলা থেকে চিৎকার করল, 'কী হয়েছে? আবার দরজা নক করছিলে কেন?'

ঢ্যাঙামতো হিসপ্যানিক লোকটা ওপর দিকে মাথা হেলিয়ে বলল, 'বাগানের কলে তো জলই আসছে না। তোমরা কি ওয়াটার ভালভ বন্ধ করে রেখেছ? 'ইউ বেটার চেক ইট অ্যান্ড ওপন দ্য ভাল্‌ভ।'

কাবেরী ক্রমশ রেগে যাচ্ছে। হাঁটুর ব্যথা নিয়ে কতবার ওপর নীচ করবে? মে মাস পড়ে গেল, তবু দেবজিৎ গ্যারেজের সিলিং-এর খোপের মধ্যে বাগানের কলের চাকাটা খুলে দেয়নি। দু-একবার মনে করাতে যাও কানে তুলবে না। বেশি কিছু বলতে গেলেই বিরক্ত!—'তুমি আজকাল এক কথা চোদ্দোবার বল।' কিন্তু এখন কাবেরীকে মইয়ে চড়তে হবে। সেই নভেম্বরে দেশে যাওয়ার আগে দেবজিৎ জলের চাকা বন্ধ করেছিল। শীত বসন্ত পেরিয়েও খেয়াল থাকল না।

কাবেরী খুব সেফটি কনশাস। রবারের গোবদা চটি পরে মইয়ে চড়বে না। মোজাবিহীন পায়ে আধময়লা পুরনো স্নিকার গলিয়ে গ্যারাজে নামল। অটোম্যাটিক গ্যারাজ ডোর খুলে বাইরে গিয়ে লোক দুটোকে দেখতে পেল না। তার মানে বাগানে কলের সামনে বসে আছে। বেঁটে মইটা টেনে এনে কাবেরী ধপধপ করে উঁচু সিলিং অবধি পৌঁছল। কায়দা করে চৌকো খোপের মুখটা যদি বা খুলতে পারল, জলের চাকা নাড়ায় কার সাধ্য? দেবজিৎ এমন টাইট মেরেছে, এখন ওকেই অফিস থেকে ধরে আনা উচিত। কাবেরীর হাত কনকন করছে। আবার ধপ ধপ করে মই থেকে নেমে কাবেরী ড্রাইভ-ওয়ে দিয়ে পেছনের বাগানে্ গেল। সেও কয়েকধাপ কাঠের সিঁড়ি ভাঙা। আজ হাঁটুর ব্যথা মোক্ষম চাগাড় দেবে।

লোক দুটো কাবেরীকে দেখে এগিয়ে আসতেও গলায় মিনতি ফুটিয়ে বলল, 'তোমরা একটু হেল্প করবে? আমার বর এমন শক্ত করে ভাল্‌ভ বন্ধ করেছে! আমার তো হাতে আর্থ্রাইটিস। চাকাটা ঘোরাতেই পারছি না।'

ঢ্যাঙা লোকটা বেঁটে লোকটাকে কাবেরীর সঙ্গে গ্যারাজে পাঠাল। ওরা কাজকর্ম শেষ করে চলে যাওয়ার পর কাবেরী ড্রাগ স্টোরে 'এপসম' সল্ট কিনতে গেল। দেবজিতের ব্যথা তো সারছে না। এখন বলছে ওটা নাকি সায়াটিকার পেইন। তবু ডাক্তারের কাছে যাবে না। সন্ধ্যেবেলায় বাথটবে প্রচণ্ড গরম জল জমিয়ে গাদাখানেক এপসম সল্ট ঢেলে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে থাকে। বলে শবাসনে

হাইড্রোট্রিটমেন্ট। পয়ে ছ্যাঁকা লাগলেই চিৎকাব, 'ওহ! কাবেরী গরম জলের কলটা বন্ধ করো। আমি ওইদিকে মাথা করে শুয়ে আছি।

শবাসনে হাইড্রোট্রিটমেন্টে বাড়ির গ্যালন গ্যালন গরম জল আর এক বাক্স এপসম সল্ট শেষ করে দেবজিৎ নাকি বেশ উপকার পেয়েছে। এখন বাড়িতে জল আছে, নুন নেই। তাই কাবেরী নুন কিনতে চলেছে। লাইব্রেরির কাজের পরে বিকালে বাড়ি ফিরে এমনিতেই বেশি সময় পায় না। এখন একদিকে অ্যারিজোনায় যাওয়ার তোড়জোড়, অন্যদিকে দেবজিতের জন্যেও চিন্তা রয়েছে। যাওয়ার আগে ওর জন্যে সপ্তাহ খানেকের রান্না করে ফ্রিজে রেখে যেতে হবে। বাকিটা বাঙালি ক্যাটারার আরতির কাছ থেকে আনার কথা। সে আবার গাড়ি চালিয়ে খাবার পৌঁছে দেয় না। মনে হয় ততদিনে দেবজিতের ব্যথাট্যথা সেরে যাবে।

সেদিন সন্ধ্যের পর দেবজিৎ যখন বাথরুমে হাইড্রোট্রিটমেন্টে জলমগ্ন হয়ে আছে, অ্যারিজোনা থেকে ফোন এল। অমৃতার বর জেরি খবর দিল বিকাল থেকে হঠাৎ অমৃতার পেটে ব্যথা শুরু হওয়ার ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ডাক্তার বলছেন ওর ওয়াটার ব্রেক করে যাওয়ায় বোধহয় আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাচ্চা হয়ে যাবে।

কাবেরী উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিতার কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে? আমি তো কালকের আগে পৌঁছতেও পারব না। টিকিট চেঞ্জ করতে হবে...। জেরি আশ্বাস দিল, 'শি ইজ্ ও.কে.। আমার মা স্কটসডেল থেকে আজ রাতেই চলে আসছেন। ইউ টেক ইয়োর টাইম।'

কাবেরী বাথরুমে ঢুকে মেয়ের খবর দিতে দেবজিৎ নুন জলে চানের আরাম ছেড়ে সটান উঠে পড়ল। এখনই কাবেরীর প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করতে হবে। ওর নিজের এখন যাওয়া মুশকিল। সপ্তাহের মাঝখানে অফিসের কাজে ক্যানাডা যেতে হবে। এদিকে মেয়েটা কষ্ট পাচ্ছে ভেবেও খারাপ লাগছে। জেরির মা আসুক, যেই আসুক, ডেলিভারির সময় ওর মা, বাবা কেউ কাছে থাকবে না ভাবতেই দেবজিতের মনখারাপ লাগছিল। কাবেরী এর মধ্যে সুটকেস গোছাতে শুরু করেছে। দেবজিৎ তাড়াতাড়ি কম্পিউটার চালিয়ে ফিনিক্স-এ যাওয়ার টিকিটের ব্যবস্থা করতে বসল।

পরদিন লাইব্রেরি থেকে ছুটির বন্দোবস্ত করে কাবেরী যখন ফিনিক্স-এর

ফ্লাইটে উঠল, ততক্ষণে অমৃতার ছেলে হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও এর আগে কোনো এয়ার লাইনস-এ ফিনিক্স-এর ডিরেক্ট ফ্লাইট পাওয়া গেল না।

ফিলাডেলফিয়া থেকে ফিনিক্স চার ঘণ্টার পথ। অমৃতারা চ্যান্ডলার নামে যে শহরে থাকে, এয়ারপোর্ট থেকে খুব বেশি দূর নয়। জেরির বাবা, মা কাবেরীকে নিতে আসবেন। কাবেরী ভাবছিল এত তাড়াহুড়ো করেও মিতার বাচ্চা হওয়ার আগে পৌঁছতে পারল না। জুন মাসে প্লেনের রিজার্ভেশন করা ছিল। ইচ্ছে ছিল ওখানে গিয়ে অমৃতাকে বেবি শাওয়ার দেবে। সাধ খাওয়ানের মতো এই ব্যাপারটা আমেরিকানদের মধ্যেও আছে। জেরির মা সুজ্যানও সে সময় স্কটসডেল থেকে আসবে বলেছিল। কাবেরী মিতার জন্যে কলকাতা থেকে নতুন শাড়ি, হিরের দুল কিনে আনল। কোথায় কী? এখন মিতা আর বাচ্চাটাকে দেখার জন্যে মন অস্থির হচ্ছে। জেরির পাঠানো ডেলিভারিরুমে তোলা ঘুমন্ত বাচ্চার ছবি দেখে মুখখানা ঠিক বোঝাও গেল না। ছবিতে মিতাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আগের দিন পর্যন্ত অফিস করে এসেছে। ওই এক কথা। এখন থেকে বাড়িতে বসে বসে কী করব? মেটারনিটি লিভ পরে বেশিদিন নেব। তার মধ্যে 'স্পেশ্যাল ইয়োগা' ক্লাস চলছে, মেডিটেশন চলছে। আমেরিকান হেল্‌থ স্পা আর যোগাসেন্টারগুলো পয়সা আদায়ের কত ফন্দিই যে বার করেছে। এদিকে মিতার ধারণা ওইসব জায়গায় ভরতি হলে নাকি কাবেরীর হাঁটু ব্যথা সেরে যেত, মন প্রফুল্ল হয়ে যেত। মেয়ের উপদেশে তার বাবা ভিডিয়ো ক্যাসেট চালিয়ে যোগ ব্যায়াম করতে গিয়েছিল। এখন তার ঠেলা বুঝছে। হঠাৎ কাবেরীর খেয়াল হল ক্যাটারার আরতি দাসের ফোন নম্বরটা দেবজিৎকে দিয়ে আসা হয়নি। নিজেও কিছু রান্না করে রাখার সময় পায়নি। যাক এত ভেবে লাভ নেই। ছাত্র জীবনে দেবজিৎ তো খেয়ে পরে বেঁচে ছিল। এখনও চালিয়ে নেবে।

আগের রাতে কাবেরীর এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। প্লেনে বসে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছিল। এয়ার হস্টেস এসে স্যান্ডউইচ, প্রেটজেল আর কফি দিয়ে গিয়েছিল। যাত্রীদের খাওয়া শেষ হলে ওরা জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যাওয়ার পর কাবেরী কম্বল জড়িয়ে ঘুমের চেষ্টা করল।

যখন ঘুম ভাঙল দীর্ঘপথ অনেকটাই পার হয়ে এসেছে। জানলার বাইরে চড়া রোদ। আবার সেই কাছের আকাশ, ভেসে যাওয়া হালকা মেঘ, বহুদূরের রুক্ষ পাহাড়, বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দেখতে দেখতে সময় কাটানো। প্লেন নীচে নামতে শুরু

করেছে। ক্রমশ মরুভূমি কাছে আসছে। অ্যারিজোনার স্থানীয় সময় এখন দুপুর একটা। ফিলাডেলফিয়ায় বিকাল হয়ে গেছে। কাবেরী ল্যান্ডিং-এর জন্যে সিট বেল্ট বেঁধে নিল।

অমৃতা যেদিন চারদিনের ছেলে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরল, তার তিনদিন পরে বিনা নোটিসে দেবজিৎ এসে উপস্থিত। ক্যানাডার মিটিং শেষ করে সোজা এসেছে। মেয়েকে সারপ্রাইজ দেবে বলে ওদের কাউকে কিছু জানায়নি। যখন এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এসে পৌঁছল, জেরি তখন অফিসে। উটকো লোক ডোর বেল বাজাচ্ছে ভেবে কাবেরী দরজা খুলছিল না। শেষে অমৃতাই দরজা খুলে বাবাকে দেখে আনন্দে অস্থির। জড়িয়ে ধরে ছোটবেলার মতো একটু কেঁদেও নিল। ভেতরে ঢুকে দেবজিৎ হাসতে হাসতে বলল, 'আমার কি মিটিং-ফিটিং এ মন বসছিল? কাজ শেষ হতেই অফিসে জানিয়ে দিয়ে চলে এলাম। কোথায় রে? তোর ছেলে কোন ঘরে?'

ততক্ষণে কাবেরী নাতিকে কোলে নিয়ে চলে এসেছে। বলল, 'এখন দূর থেকে দ্যাখো! জামাকাপড় চেঞ্জ করে তারপর কোলে নিও। দ্যাখো তো, মুখটা সুদীপের মতো লাগছে না?'

দেবজিৎ কোনো সাদৃশ্য খুঁজছিল না। সাদা পুতুলের মতো ঘুমন্ত শিশুটিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে দেখতে কেমন এক পূর্ণতার প্রশান্তি অনুভব করছিল। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, 'তুই কে রে? আমাদের মাখন দাদু?'

ওদের হাসাহাসি, কথাবার্তার মাঝে গ্যারাজে গাড়ির শব্দ শুনে মিতা অবাক হল, 'জেরি ফিরে এল যে? আজ কোর্টে একটা হিয়ারিং আছে বলে ফিরতে একটু দেরি হবে বলেছিল।'

দেবজিত হেসে উঠলো, 'কেন? ল ইয়াররা পেটারনিটি লিভ নেয় না? নাকি তোর মেটারনিটি লিভ শেষ হলে তখন জেরি ছুটি নেবে?'

জেরি ঘরে ঢুকে দু'হাত ছড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'হাই বাবা! আমাকে তুমি সারপ্রাইজ দিতে পারলে না! সুদীপ ফোন করেছিল। ও বুঝতে পারেনি তুমি আমাদের কিছু না জানিয়ে চলে আসছ।'

মিতা বলল,'তাহলে তুমি বাবাকে পিক-আপ করতে গেলে না কেন? বাবা কার সার্ভিস নিয়ে এল!'

'আমি তখন কোটে।' সুদীপের কাছে কোনো ফ্লাইট ইনফর্মেশন নেই। হিয়ারিং শেষ হওয়ার পর তাই একবার বাড়িতে খোঁজ নিতে এলাম। আমার মনে হচ্ছিল বাবা আমাদের সারপ্রাইজ দিতে চাইছে। সো, আই ডিড নট কল ইউ!'

কাবেরী জিজ্ঞেস করল, 'সুদীপ কবে আসতে পারবে কিছু বলল? এখন এলে সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত।'

দেবজিৎ উত্তর দিল, 'এই তো সবে লন্ডন থেকে বস্টনে ফিরেছে। আমার মতো বয়স নাকি যে চাকরি থাকলেও হয়, গেলেও হয়...'

জেরি হাসল, 'দেন টেক ইয়োর হেফটি রিটায়ারমেন্ট প্যাকেজ। কাম টু অ্যারিজোনা। এনজয় ইয়োর গ্র্যান্ড কিড।'

তারপর হাত ধুয়ে এসে বাচ্চাকে খানিক আদরটাদর করে জেরি অফিসে ফিরে গেল।

এখানে সন্ধে নামতে দেরি হয়। বিকালের পরে গরম হাওয়ার তাপ কমে এলে দেবজিৎ বাড়ির সুইমিং পুলে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল। এখন দুটো দিন বিশ্রাম। তারপর ফিরে গিয়ে অফিসে রাজ্যের কাজের চাপ। একেক সময় মনে হয় অকুপেশনটাই জীবনের একমাত্র প্রি-অকুপেশন। বাকি সময়টা জলের স্রোতে ভেসে থাকার মতো। চাকরি ছেড়ে দেব বললেই কি ছাড়া যায়? ছাপ্পান্ন বছর বয়সে বেকার বসে থাকা ভাবাই যায় না। এই বেশ আছে। সুদীপ বস্টনে। মিতারা এখানে। দেবজিৎ কাবেরী ওদের চাকরিবাকরি, ক্লাব, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নিজেদের জায়গায়। সাঁতার কাটতে কাটতে দেবজিতের মনে হল কোমরের বেয়াড়া ব্যথাটাও চলে গেছে।

দেবজিৎ ফিলাডেলফিয়া ফিয়ে যাওয়ার পর এক শনিবারে অমৃতা আর জেরি কাবেরীর কাছে ওদের ছেলে রণকে রেখে সিনেমায় গেল। রাতে ডিনার খেয়ে ফিরবে। কাবেরীও চাইছিল ওরা ছুটির দিনে নিজেদের মধ্যে একটু সময় কাটাক। নাতিকে রাখার কোনো সমস্যা নেই। সে দু'ঘণ্টা পরে পরে দুধ খায় আর ঘুমোয়। অমৃতা রণকে বাইরের দুধ খাওয়ায় না। নিজের দুধ পাম্প করে ছোট ছোট বোতলে ভরে ফ্রিজে রেখে গেছে।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পরে কাবেরী বাড়িতে দেবজিৎকে ফোন করল। তখন ওখানে রাত ন'টা বেজে গেছে। কেউ ফোন ধরল না। দেবজিৎ কি বাড়িতে নেই?

কাবেরী দেবজিতের সেল ফোনে ওকে পেল। বেঙ্গলি কমিউনিটি সেন্টারে সাহিত্য সন্ধ্যায় গিয়ে বসেছে। আসর ভাঙলে অনিন্দ্যর বাড়িতে ডিনার খেয়ে ফিরবে। তখন ওখানে কেউ জোরে জোরে কবিতা পড়ছিল। দেবজিৎ 'কাল কথা হবে বলে' ফোন রেখে দিল। যে কথাটা কাবেরী এখানে দেবজিৎকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায়নি, এখনও তা জানা হল না।

মুভি হল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে অমৃতা মাকে ফোন করল। রণের খবর নিয়ে, মা-র খাওয়া হয়েছে কিনা জেনে নিয়ে ফোন রাখার সময় বলল, 'ঠিক আছে। পরে শুনব।'

জেরি লক্ষ্য করল অমৃতা হঠাৎ বিরক্ত হয়েই যেন কথা শেষ করে দিল। ও জিজ্ঞেস করল, 'ইজ এভরি থিং ও. কে? মা কি টায়ার্ড ফিল করছে? দেন উই ক্যান ক্যানসেল দ্য রিজর্ভেশন...' অমৃতা মাথা নাড়ল, 'না, ডিনার করেই ফিরব। বেশি দেরি করব না। বাড়ি গিয়ে রণকে দুধ খাওয়াতে হবে।'

রেস্তোঁরায় খাবারে অর্ডার দিয়ে অমৃতা অপ্রসন্ন মুখে বসেছিল। জেরি বুঝতে পারছে ও মা-র কোনো কথায় বিরক্ত হয়েছে। নিজে থেকে আবার জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবছে, অমৃতার কথায় উদ্বেগ ধরা পড়ল, 'জেরি, শি হ্যাজ স্টার্টেড দ্যাট এগেন। আবার সেই সন্দেহের বাতিক শুরু হয়েছে। বাবাকে কোনোদিন শান্তি দেবে না।'

জেরি ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল, 'ডোন্ট গেট সো আপসেট। উনি এখন এখানে আছেন। আমরা ওঁকে বোঝাতে পারি। তুমি চাইলে ওঁকে ম্যারেজ কাউন্সেলরের কাছে নিয়ে যেতে পার। মাঝে মাঝে কেন ওঁর এরকম সন্দেহ হয়, তাঁর কারণটা খুঁজে দেখা দরকার।'

'এর একটা ব্যাক গ্রাউন্ড আছে, তুমি তো জানো। মা বিয়ের পর থেকে সেই যে এক অদ্ভুত ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগতে শুরু করেছিল। তার থেকেই বোধহয় একটা ইনসিকিউরিটি ডেভেলপ করে গেল। কে জানে? এখন এত বয়সেও বাবাকে বিশ্বাস করতে পারে না।'

জেরি বলল, 'বয়সটা কোনো ব্যাপার নয়! যদি কেউ সন্দেহ করে তার স্বামীর অন্য মহিলাদের ভালো লাগে, সে কোনো সময়ই সন্দেহমুক্ত হতে পারে না। বিকজ, শি ওয়ান্টস টু বিলিভ দ্যাট।'

ওয়েটার খাবার দিয়ে গেছে। ওদের বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল। অমৃতার মন ভালো নেই বুঝে জেরি ওদের বাড়ির অশান্তির কোনো সুরাহা করা যায় কি না চিন্তা করছিল। জেরি নিজে ক্রিমিন্যাল ল ইয়ার। ওর এক বন্ধুর স্ত্রী ফ্যামিলি ল ইয়ার। তার কাছে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। যদিও অমৃতার ধারণা যত অশান্তিই হোক, ভারতীয় পরিবারে ম্যারেজ কাউন্সেলিং-এ যাওয়া একরকম লজ্জার ব্যাপার। বিশেষ করে এই বয়সে পৌঁছে। অথচ সমস্যাটা তো থেকেই যাচ্ছে। জেরির মনে হয় অমৃতার নিজের শান্তির কথা ভেবেও ওর বাবা-মাকে ম্যারেজ কাউন্সেলিং-এ পাঠানো দরকার।

ওরা বাড়ি ফিরে দেখল রণ জেগে উঠে কাবেরীর কোলে শুয়ে খেলা করছে। কাবেরী খুব সহজ গলায় বলল, 'এবার তুই ওকে খাওয়াবি তো? আমি আর লাস্ট বোতলটা দিইনি। এর মধ্যে দুবার হাগু হয়ে গেছে।'

অমৃতা বলল, 'এক মিনিট। আমি চেঞ্জ করে নিই।'

সে রাতে আর বিশেষ কথাবার্তা হল না। রবিবার দিনও জেরি বাড়িতে থাকায় কাবেরী বা অমৃতা কেউই ওই প্রসঙ্গ তুলল না। সোমবার জেরি অফিস চলে যাওয়ার পর অমৃতা যোগা সেন্টারে গেল। ফিরে এসে লাঞ্চের পর মাকে জিজ্ঞেস করল, 'পরশু কী হয়েছিল বলো তো? বাবার ওপর আবার রাগ হল কেন?'

কাবেরীর গলার স্বরে চাপা অভিমান, 'তোকে বলে কী হবে? তোর তো ধারণা আমি অকারণ অশান্তি করি।' অমৃতা মা-র কাছাকাছি এল, 'না, সব সময় তা ভাবি না। জানি, তোমারও একটা কষ্ট আছে। বাবা সেটা বুঝে উঠতে পারে না।'

'বোঝার চেষ্টাই করে না। আমার সম্পর্কে ওর কোনো অ্যাটাচমেন্ট আছে বলে তোর মনে হয়?'

'আবার সেই অভিমানের কথা বলছ। কী হয়েছে বলবে তো! সেদিন বাবা তোমায় কল করেছিল?'

'এতদিনের মধ্যে করার ফোন করতে দেখেছিস? আমিই করেছিলাম। তখন কবিতা শুনতে বসেছিল। ভালো করে কথার উত্তরও দিল না। মিতা, আই থিংক আই ক্যান্ট পুট আপ এনি মোর...'

কাবেরীর মুখ রাগে থমথম করছে। অমৃতা এই মুখ, বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর চেনে। সে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে বলছ না কেন? এই তো বাবা ঘুরে গেল।

তখন থেকেই দেখছি তুমি বেশ আপসেট। তোমার কি এখানে ভালো লাগছে না?'

কাবেরীর গলার স্বর নরম হল, 'তাহলে তো তোর বাবার সঙ্গে ফিরেই যেতাম। এখানে তোদের সঙ্গে অনেক শান্তিতে আছি। অ্যাট লিস্ট, তোরা ভালো আছিস দেখে শান্তি পাচ্ছি।'

'তোমাদেরও তো ভালো থাকা দরকার মা। দূরে থেকে আমি কত কষ্ট পাই বুঝতে পার না?'

কাবেরী চোখের জল মুছল, 'চেষ্টা তো করি মিতা। ভাবি ওকে আর কিছু বলব না। কিন্তু একেক সময় এমন ব্যবহার করো। এবারে তো সেভাবে কোনো কথাও বলিনি। অথচ জানি যে ও আমার কাছে ব্যাপারটা লুকোচ্ছে। স্বীকার করার সাহস নেই বলেই অত মেজাজ দেখিয়ে চলে গেল।'

অমৃতা কিছু বুঝতে পারছে না। বাবা মাত্র দুদিন ছিল। রণকে নিয়ে সময় কাটাল। সারাক্ষণ হাসছে, গল্প করছে। মা-র সঙ্গে কখন রাগারাগি হল? মা, বাবাকে ও নীচে বেডরুমে শুতে দিয়েছিল। হয়তো রাতে শোওয়ার সময় ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। মা ঠিক কী বলতে চাইছে?

কাবেরী শুরু করল, 'সেদিন ওর ফ্লাইটের আগে সুটকেসে জামাকাপড় গুছিয়ে দিচ্ছিলাম। ও তখন বাথরুমে। স্যুটের জ্যাকেটটা ঠিকমতো ভাঁজ করতে গিয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ পেলাম। ক্যারেন অ্যান্ডারসনের ই-মেইল অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর লেখা ছিল। ও তার মানে এটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে।'

অমৃতা জিজ্ঞেস করল, 'ক্যারেন কে? বাবার কোনো কলিগ? বিজনেসট্রিপ-এ তার কন্ট্যাক্ট নাম্বার সঙ্গে থাকতেই পারে। হয়তো নিজের ব্ল্যাক বেরি'তে তুলে রাখার পর কাগজটা পকেটে থেকে গেছে।'

কাবেরী থামিয়ে দিল, 'না, অফিসের কেউ নয়। একটা ওয়েডিং-এ গিয়েছিলাম। সেখানে ওই সিঙ্গল মহিলাটি তোমার বাবাকে চিনতে পারল। কবে স্টুডেন্ট লাইফে ইন্ডিয়া গিয়েছিল। তখন তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দিল্লিতে, কলকাতায় দুজনের কয়েকবার দেখা হয়েছিল। যা মনে হল, তখন হয়তো ওদের মধ্যে একটা ইনফ্যাচুয়েশন ডেভেলপ করেছিল। হতেই পারে, আমি সেসব পুরনো কথা নিয়ে অশান্তি করতে চাই না...।'

'দেন হোয়াই আর ইউ মেকিং এ বিগ ডিল আউট অফ ইট? ওই কাগজটা

থেকে কী প্রমাণ করতে চাইছ? আজ এত বছর পরে বাবা ওই মহিলাকে ডেট করছে? আর ইউ গোইং ক্রেজি? মা, প্লিজ, এভাবে কোনো কিছু অ্যাসিউম করে নিও না।'

মেয়ের কথায় কাবেরী বলে উঠল, 'তাহলে ও এত বিশ্রীভাবে রি-অ্যাক্ট করল কেন? বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমার হাতে কাগজটা দেখে ফেরত চাইল। ওর নাকি ক্যারেনের অ্যাড্রেসের কথা মনেই ছিল না। বিয়েবাড়ির স্যুটটা বিজনেস ডিনারে পরে যাওয়ার পর পকেটে খুঁজে পেয়েছে। আমাকে বলল, 'ওটা আমাকে দাও।' আমি বললাম, কেন? ওকে কন্ট্যাক্ট করার কী আছে?' ও তখন কাগজটা টেনে নিয়ে বলল, 'দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস। আমার ভদ্রতা বোধ বলছে ক্যারেনকে একটা ই-মেইল করা উচিত। যাবার সময় তুমি শুধু শুধু আমার মেজাজ খারাপ করে দিও না।'

অমৃতা বলল, 'এত কিছু হয়ে গেছে, আমরা বুঝতেও পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, যাবার সময় বাবা যেন একটু গম্ভীর হয়েছিল। ভাবলাম আমাদের ছেড়ে যেতে মনখারাপ লাগছে। মা, তুমি এই অশান্তিটা না করলেও পারতে। বাবা এত ডিপ্রেসড হয়ে একা একা ফিরে গেছে। তুমি কি বাবার বয়সটার কথাও ভাব না?' কাবেরী বুঝতে পারল এখনও মেয়ের সমস্ত সহানুভূতি তার বাবার ওপরেই রয়ে গেছে। মিতা, সুদীপ, কাউকেই ও কোনোদিন কিছু বোঝাতে পারবে না। দেবজিতের ওপর ওদের অন্ধ বিশ্বাস। ভালো, তাই নিয়েই থাক। কাবেরী যে কেন এদের কাছে দুঃখের কথা বলতে আসে।

রণের ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ এল। অমৃতা উঠে যাচ্ছে দেখে কাবেরী বলল, 'এসব কথা জেরিকে কিছু বলিস না। আমার জন্যে ভাবিস না। ঝগড়া-ঝাঁটি যাই হোক, মানিয়ে নিয়ে তো আছি।' অমৃতা কোনো উত্তর দিল না।

দু-চারদিন কেটে যাওয়ার পর অমৃতার খেয়াল হল এর মধ্যে আর দেবজিতের ফোন আসেনি। কাবেরীর সঙ্গে কোনো কথা হলে জানতে পারত। অমৃতা সন্ধের পর নিজেই ফোন করল। দেবজিৎ তখন হেলথ স্পা থেকে বেরিয়ে পাড়ার গ্রিক ডাইনারে রাতের খাওয়া সেরে বাড়ি ফিরছে। গাড়ির স্পিকার ফোনে কথা বললে পুলিশ সেল ফোনে কথা বলার জন্যে ভায়লেশনের টিকিট দেবে না। অমৃতা বাবার খবর পাচ্ছে না জেনে দেবজিৎ জানাল ও এর মধ্যে দু'বার কাবেরীকে

ফোন করেছিল। অমৃতারা ভালো আছে জানিয়ে কাবেরী ফোন রেখে দিয়েছে। অসময়ে ফোন করলে বাচ্চার ঘুম ভেঙে যায় বলে বারবার ফোন করতেও বারণ করেছে।

অমৃতা জানে মার মন-মেজাজ ভালো নেই। আজ নিজে থেকেই কথাটা তুলল, 'বাবা, মাকে নিয়ে আমরা বেশ চিন্তিত। লেটলি খুব লেফট-আউট ফিল করছে। ভাবছে আমরা সবাই ওকে ইগনোর করছি।' দেবজিৎ অসহিষ্ণু হল, 'ইন দ্যাট কেস হোয়াট অ্যাম আই সাপোসড টু ডু? বল, আমার কী করা উচিত?'

বাবার দায়সারা জবাবে বিরক্ত হয়ে অমৃতাও গলার স্বর উঁচু করল, 'ফার্স্ট অফ অল, সি নিডস ইয়োর কমপ্যাশন। তুমি যাবার আগে কী বলেছিলে বাবা? মা খুব হার্ট হয়েছে।'

স্পিকার ফোন বন্ধ করার আগে দেবজিৎ শুধু বলল, 'এখন গাড়ি চালাচ্ছি। বাড়ি গিয়ে কথা হবে।'

তারপর কাবেরী দু'সপ্তাহ অ্যারিজোনায় ছিল। জেরির ইচ্ছে সত্ত্বেও কাবেরীকে আমেরিকান ম্যারেজ কাউন্সেলরের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। ওর ধারণা ভারতীয় পরিবারের দাম্পত্য অশান্তির কারণগুলো আমেরিকান সাইকোলজিস্টকে ঠিকমতো বোঝানো যায় না। অমৃতা বুঝতে পারল তর্ক করে লাভ নেই। তাছাড়া শুধু কাবেরী কেন, দেবজিতেরও কাউন্সেলিং দরকার। তার চেয়ে ফিলাডেলফিয়াতে বা ওদের কাছাকাছি কোনো শহরে ভারতীয় সাইকোথেরাপিস্ট-এর খোঁজ নেওয়া যাক।

শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ হল। ফিলাডেলফিয়ার উইমেন্স অর্গানাইজেশন "দিশা"র পরিচালিকা জয়ন্তী দেশপাণ্ডের কাছে ডঃ অচিরা ব্যানার্জি নামে একজন সাইকোথেরাপিস্টের নামধাম পাওয়া গেল। অমৃতা ইচ্ছে ছিল মহিলাকে ফোন করে বাবা, মা-র জন্যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও করে নেয়। দেবজিৎ রাজি হল না। বলল কাবেরী ওখানে পৌঁছনোর পর ওরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে। কাবেরী আবার গাঁইগুঁই করছিল। এখন তার আপত্তির কারণ অন্য। বলল, 'বাঙালি থেরাপিস্টের কাছে যাব? সেই হয়তো আমাদের ঝগড়ার কথা অন্য জায়গায় গল্প করবে।'

জেরি একটু বিরক্ত হল, 'দ্যাট ডাজ নট হ্যাপন। প্রফেশনাল এথিকস অনুযায়ী সেটা কেউ করে না। ডাক্তার কি তার পেশেন্টের অসুখের কথা অন্য লোককে বলে?'

মা-র অজ্ঞের মতো মন্তব্যে অমৃতা অপ্রস্তুত হল। বাংলায় বলে উঠল, 'এসব বোলো না। আমাদের ইন্ডিয়ান ডাক্তারা মোটেই এরকম ইরেসপনসিবল নয়। তোমার সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু রাখী পিসি, নূপুরমাসি এরা কখনো তোমাকে অন্য কারুর অসুখের কথা বলে? তোমরা কিন্তু ওদের হেল্পও নিতে পারতে। কাবেরী কথা ঘোরানোর জন্যে হাসতে লাগল। মনে মনে বলল, আমাদের নগেন ঘোষাল একাই একশো। তার হাইড্রোসিল কাটা হল, কার বউ-এর ওভেরিয়ান সিস্ট ধরা পড়েছে, কে তার বউ-এর ক্যানসারকে আলসার বলে চালাচ্ছে, কে সেক্স ড্রাইভ বাড়ানোর জন্যে ভায়াগ্রা পিল-এর প্রেসক্রিপশন নিয়ে গেল, সব খবর নগেন ডাক্তার চাউর করত। কাবেরী যদি বোঝে এই রুচিরা না অচিরা মহিলা ওদিকের অনেক বাঙালিকে চেনে, তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দেবে। তবে আগে থেকে জানাও সম্ভব নয়। দেখা যাক দেবজিৎ কী বলে?

দেবজিৎ গত কয়েকদিন ধরে বিচিত্র এক মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে। কাবেরী প্রায় মাস দেড়েক এখানে নেই। কাজের দিনগুলো দেবজিৎ বাঁধাধরা রুটিনমতো চলেছে। সারাদিনের অফিসের পরে সন্ধে থেকে কয়েক ঘণ্টা ছিল নিজের সঙ্গে নিজের থাকার নিরবচ্ছিন্ন স্বাচ্ছন্দ্য। টিভি'র অনুষ্ঠান দেখেছে। বই পড়েছে, গান শুনেছে। ইন্টারনেট খুলে রাজ্যের খবর জেনেছে। ই-মেইল পেলে উত্তর দিয়েছে। এক-আধ দিন অন্তর অ্যারিজোনায় আর বস্টনে অমৃতা, সুদীপকে ফোন করেছে। কাবেরী ফিরে এলে দেবজিতের সন্ধেবেলাগুলো খুব যে অন্যরকমভাবে কাটবে, এমন নয়। রাতে শোওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে তাড়া দেওয়া ছাড়া কাবেরী আজকাল আর অকারণে শান্তিভঙ্গ করে না। সেদিক থেকে আগামীকাল কাবেরী ফিরে আসছে বলে দেবজিতের নিরাশ হওয়ার কিছু ছিল না। শুধু একটাই ভাবনা ওকে মুহূর্তের জন্যেও স্বস্তি দিচ্ছে না। মাঝে ওই গতানুগতিক জীবনযাপনের গণ্ডি ভেঙেও এমন এক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যার কোনো ব্যাখ্যা ওর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। কাবেরীর মুখোমুখি হওয়ার সময় যত কাছে আসছে, দেবজিতের মনে হচ্ছে আমার ছুটির দুটো দিন এভাবে কাটানোর কথা ছিল না। ক্যারেনের সঙ্গে কখনো কোনো ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট হয়নি। ওকে একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। এত বছর পরে দেখা যদি বা হল, ও তো সিঙ্গল মহিলা, ইনটিমেট হতে চাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। ও জানে ওর হারানোর মতো কিছু নেই। কিন্তু আমি তো কাবেরীকে ছেড়ে যাইনি। আমাদের ছেলে মেয়ে আছে। নো ওয়ান ইজ দ্য ওনার

অফ হিজ ইনস্টিংক্টস, বাট কন্ট্রোলিং দেম, দ্যাট ইজ সিভিলিজেশন...। এই সব বোধ, কাবেরী, মিতা, সুদীপের কাছে আমার সততার দায়বদ্ধতা, কোনো কিছুই সে মুহূর্তে মাথার মধ্যে কাজ করেনি। নাকি কাবেরী আমায় বিশ্বাস করে না বলে আমার ইনস্টিংক্ট তার সুযোগ নিয়েছিল? ক্যারেনের কাছে দু'রাত থেকে আসার পর দেবজিৎ বুঝতে পারছিল ও কাবেরীর কাছে শেষ পর্যন্ত হেরে গেছে। অপরাধবোধের তীব্র গ্লানিতে ওর অহংবোধ যখন প্রায় বিধ্বস্ত, কাবেরী ফিরে এসে বলল, 'তোমাকে খুব টায়ার্ড লাগছে। আমি ছিলাম না বলে ইচ্ছেমতো রাত অবধি জেগে থাকতে নাকি? খাওয়াদাওয়াও তো তেমনি হয়েছে। আর এতদিনের জন্যে ছেলেমেয়ের কাছে যাব না।'

দেবজিৎ বলল, 'তুমি আরও আগে ফিরে আসতে পারতে মিতা তো বাচ্চার জন্যে ন্যানি রেখেছে বলল।'

কাবেরী অবাক হল, 'তুমিই আমায় বেশিদিন থাকতে বলেছিলে। আমি তো ভাবি, আমি এখানে না থাকলেই তুমি ভালো থাক।'

দেবজিতের গলার স্বর ক্লান্ত শোনাল, 'না, কাবেরী, ভালো ছিলাম না। এখন মনে হয় অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। এবার একটা বোঝাপড়ায় আসতে হবে।'

কাবেরী ভয় পেল, 'বোঝাপড়া মানে? আমার সঙ্গে থাকবে না?'

দেবজিৎ কাছে এল, 'বোঝাপড়া মানে দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, অ্যাডজাস্টমেন্ট। যদি চাও, কাউন্সেলিং-এ যেতে পারি।'

খানিক চুপ করে থেকে কাবেরী উত্তর দিল, 'কিন্তু ওখানে গিয়েও তো তর্ক হবে। তুমি বলবে আমি তোমাকে অকারণ সন্দেহ করি। আমি বলব, তুমি আমাকে ছেলেমেয়ের সামনে, বাইরের লোকের সামনে উলটোপালটা কথা বলো। একটুতে রেগে ওঠো। একদিন এমন কথাও বলেছ যে, আমাকে বিয়ে করেছিলে বলে রিগ্রেট করো।'

দেবজিৎ কাবেরীকে কাছে টানার চেষ্টা করল, 'তোমার যা বলার সব বলো। আমি মেনে নেব।'

কয়েকদিন পরে ক্যারেন অ্যান্ডারসনের টেক্সট মেসেজের উত্তরে দেবজিৎ ই-মেইল পাঠাল—আমার স্ত্রী কাবেরী ফিরে এসেছে। ম্যারেজ কাউন্সেলিং-এ যাবার আগে নিজেরা নতুন করে পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করছি। তোমার সঙ্গে দেখা

হওয়া ছিল ঘটনাচক্র। তারপর দেখা করার ব্যাপারটা ঘটে গেল নিজেদের ইচ্ছেয়। কে জানে? হয়তো নিজেকে চেনার জন্যে এমন এক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। বলতে পার এখন আমার রিডেমপশনের পিরিয়ড চলেছে। আশা করছি আমাদের বিবাহিত জীবনে শান্তি ফিরে আসবে। তুমি ভালো থেকো।

সাইকোথেরাপিস্ট ডঃ অচিরা ব্যানার্জির অফিসে গিয়ে কাবেরী আশ্বস্ত হল। মহিলা গুজরাটি, বাঙালি বিয়ে করেছেন। কথাবার্তা বলে কাবেরীর মনে হল, অচিরা এ তল্লাটের বাঙালিদের চেনেন না। ব্যবহারে খুবই প্রফেশনাল। প্রথমেই জানতে চাইলেন ওদের দাম্পত্য সমস্যাটা কী? বললেন, 'আমি দু'ভাবে কাউন্সেলিং করি। প্রথমে আলাদা আলাদাভাবে আপনাদের সমস্যার কথা শুনব। তারপর একসঙ্গে আলোচনা হবে। সুতরাং প্রত্যেকবার দুজনের আসার দরকার নেই।'

সেদিন দেবজিৎ ওয়েটিং রুমে বসে রইল। কাবেরীকে অচিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'কত বছর বিয়ে হয়েছে? অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবলেম কি প্রথম থেকেই ছিল? না, এই মধ্যবয়সে এসে ছোটখাট কারণে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন?'

কাবেরী উত্তর দিল, 'বিয়ে হয়েছে ত্রিশ বছর। আসলে আমাদের বিয়েটাই হয়েছিল অদ্ভুতভাবে। আর সেই জন্যেই বোধহয় দেবজিৎ আমাকে মন থেকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি।'

অচিরা প্রশ্ন করলেন—'অদ্ভুতভাবে বিয়ে হয়েছিল মানে?'

কাবেরী বলল, 'দেবজিৎ পিএইচডি শেষ করার আগে বিয়ে করতে কলকাতায় গিয়েছিল। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ। দেবজিতের মা-র পছন্দ করা সুন্দরী মেয়ে। বিয়ের দুদিন আগে একদল ছেলে দেবজিৎদের বাড়িতে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করল। তাদের মধ্যে একটি ছেলের সঙ্গে ওই মেয়েটি রেজিস্ট্রি করে বসেছিল। তারপর আমেরিকার পাত্রর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে ওই ছেলেটির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। কিন্তু সে ছাড়বে কেন? সরাসরি দেবজিৎদের বাড়ি গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রির সার্টিফিকেট দেখাল।'

অচিরা বললেন, 'তারপর? বিয়ের সম্বন্ধ তো ভেঙে গেল? দেবজিতের সঙ্গে কি মেয়েটির আলাপ হয়েছিল?'

'কলকাতায় পৌঁছে দেবজিৎ তাকে নিয়ে দু-একবার বেরিয়েছিল। তাতেই মুগ্ধ! আসলে ওদের বাড়িতে সকলের খুব ফরসা রঙের ওপর ঝোঁক। তো, সেই

মোমের পুতুলকে নিশ্চয়ই ওর খুব পছন্দ হয়েছিল।'

'দেন হোয়াট হ্যাপনড? হাউ ডিড হি ফাইন্ড ইউ আউট?'

'ও কোথায় পাত্রী খুঁজতে যাবে? ওর বাবা, মা-ই আবার বিয়ে ঠিক করলেন। আসলে আমাদের এক আত্মীয় ওদের পাড়ায় থাকতেন। ওই তারিখেই বিয়ে দেওয়ার জন্যে ওঁরা পাগলের মতো পাত্রী খুঁজছেন জেনে ওই আত্মীয় আমার বাবাকে খবর দিয়েছিলেন। ওঁরা এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে পছন্দ করে গেলেন। পরদিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।'

'কিন্তু আপনার স্বামী আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করেননি, এরকম ধারণা হয়েছিল কেন? এত বছর একসঙ্গে আছেন। দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছে। অ্যাকসেপটেন্স না থাকলে কি সেটা সম্ভব হত? কেন আপনার এ কথা মনে হয়?'

'আসলে দেবজিতের এক্সপেকটেশন হয়তো অন্যরকম ছিল। আমি মোটামুটি পড়াশোনা করলেও ওর পছন্দের সঙ্গে আমার পছন্দ মেলাতে পারি না। বাড়িতে, গাড়িতে সারাক্ষর ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক ভালো লাগে না। কবিতা-টবিতা খুব একটা বুঝি না। টিভিতে আমার সোপ অপেরা দেখার নেশা নিয়েও মন্তব্য করে। কুমার শানু আমার ফেভারিট সিঙ্গার। সেটাও দেবজিতের কাছে হাসির ব্যাপার। আসলে আমাকে ও সব দিক থেকেই খুব সাধারণ মনে করে।' কাবেরী উঠে আসার আগে অচিরা বললেন, 'নেক্সট উইকে দেবজিতের সঙ্গে কথা বলব। তারপর আপনারা একসঙ্গে আসবেন। আপনাদের সমস্যা কিন্তু খুব বড় কিছু নয়। অনেকটাই হচ্ছে দুজনের 'ইগো'র লড়াই। অশান্তির একটা প্রধান কারণ কী জানেন? অ্যারোগেন্স। আপনাকে আমার প্রচণ্ড জেদি বলে মনে হয় না।'

ফেরার পথে গাড়িতে কাবেরী সাইকোথেরাপিস্টের শেষ কথাটা বলতে দেবজিৎও যেন মনে মনে মেনে নিল। রসিকতা করে বলল, 'হ্যাঁ, মহিলা তো অন্তর্যামী। দেখা যাক আমাকে আবার কী বলেন।'

শনিবারে সুদীপ বস্টন থেকে এল। এখনও অ্যারিজোনায় মিতার ছেলেকে দেখতে যাওয়ার সময় পায়নি। ভাইবোনে সপ্তাহে হয়তো একবার ফোনে কথা হয়। কাবেরী, দেবজিৎ যে ম্যারেজ ফাউন্সেলিং-এ যাচ্ছেন, খবরটা মিতার কাছে শুনেছে। যদিও সুদীপ ওঁদের এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল না। ছোটবেলাতে বাড়িতে এত ঝগড়াঝাঁটি দেখেনি। কিন্তু ওর বারো-চোদ্দো বছর বয়স থেকেই বুঝতে পারত মা,

বাবার মধ্যে সম্পর্কটা যেন ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠছে। মা যতই চিৎকার, চেঁচামেচি করুন, শেষ পর্যন্ত বাবার জেদ বজায় থাকে। মা বাবাকে 'উওম্যানইজার' বলেন। রীতিমতো অবিশ্বাস করেন। সুদীপের খুব খারাপ লাগলেও এসব ঝগড়ার মধ্যে থাকতে চায় না। বাবার চেহারা, অ্যারিস্টোক্রেসি, বড় চাকরি, সাহিত্যবোধ, নাটক করার ক্ষমতা অনেক কিছু নিয়েই তাঁর এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আছে। মহিলারা তাঁকে পছন্দ করেন। মা-র ইনটেলেকচুয়্যাল লেভেল ঠিক বাবার মতো নয়। কিন্তু তার জন্যে বাবা মাকে রেসপেক্ট করবেন না, ধমক দিয়ে থামিয়ে রাখবেন, এই অবজ্ঞার ব্যাপারটা সুদীপ সহ্য করতে পারে না। এ নিয়ে ছোটখাট প্রতিবাদও করেছে। ইদানীং লক্ষ্য করেছে ও বা মিতারা বাড়িতে এলে বাবা একটু সতর্ক থাকেন।

এবার সুদীপ দুদিনের জন্যে এসে মা-র সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাল। কাবেরী জানতে চাইছিল সুদীপের বান্ধবী মেঘা প্যাটেলকে কি ও বিয়ে করার কথা ভাবছে। কোনো সদুত্তর না পেয়ে তখন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ওদের ম্যারেজ কাউন্সেলরের কাছে যাওয়ার কথাটা কাবেরী, দেবজিৎ কেউই তুলল না। সুদীপ বস্টনে ফিরে গিয়ে মিতাকে ই-মেইল পাঠাল—বাবা এত ডিভোটেড হাসব্যান্ড হয়ে গেছে দেখে অবাক লাগছে! কাউন্সেলিং-এর জন্যে? না, জেরির ইনফ্লুয়েন্স?

অচিরা ব্যানার্জির সঙ্গে একা কথা বলার দিন দেবজিৎ আর কাবেরীকে সঙ্গে নিল না। ভদ্রমহিলা সম্পর্কে কাবেরী যাই বলুক, দেবজিৎ ওঁর প্রশ্ন করার ধরনটা ঠিক পছন্দ করছিল না। বোঝাই যাচ্ছে, ইন্ডিয়ান উইমেন্স গ্রুপে থেকে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স-এর ভিকটিমদের কাউন্সেলিং করেন মানে মহিলা ঘোর ফেমিনিস্ট। নয়তো শুরুতেই দেবজিৎকে জিজ্ঞেস করবেন কেন, 'আপনার স্ত্রীর ধারণা আপনি পারিবারিক চাপে পড়ে ওঁকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্ত্রীকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি। ধারণাটা কি ভুল?'

দেবজিৎ উত্তর দিল, 'প্রথম ধারণা ভুল নয়। আমাদের বিয়ের ঘটনা নিশ্চয়ই শুনেছেন? আসলে অ্যারেঞ্জনড ম্যারেজে রাজি হয়েছিলাম বলে, বাবা-মাকে আর বাধা দিইনি। সে সময়ও ছিল না।'

দেবজিৎ কথা থামিয়ে কিছু ভাবছিল। অচিরা আগের প্রশ্নে ফিরে এলেন, 'কিন্তু বিয়ের পরে কাবেরীকে গ্রহণ করতে কি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন? এটা তো ঠিক,

নিজের স্ত্রী সম্পর্কে মানুষের কিছু প্রত্যাশা থাকে...'

দেবজিৎ মাথা নাড়ল, 'না, আমি মেনে নিয়েছিলাম এটা আমাদের ডেসটিনি। কাবেরীকে অ্যাকসেপ্ট করতে না চাইলে এত বছর একসঙ্গে আছি কেন?'

'তাহলে আপনাদের সমস্যা কোথায়? মানসিকতার মিল হয়নি?'

'যতখানি মিল হলে আনন্দ পেতাম, তা হয়নি। তবে আজকাল আর সে কথা ভাবি না। স্ত্রী হিসেবে কাবেরী খুবই লয়্যাল। সংসারের সম্বন্ধে অসম্ভব ডেডিকেটেড। একটা সময় আমি অফিসের কাজে বেশ কিছুদিন করে বাইরে থাকতাম। ছেলেমেয়ে তখন ছোট। কাবেরী একাই তখন ওদের দেখাশোনা করেছে। সমস্যা হচ্ছে আমার সঙ্গে ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর অভাব। সেনস অফ ওভার পজেশন থেকে বোধহয় কাবেরী এক ধরনের ইনসিকিওরিটিতে সাফার করছে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। এটা আমাদের দুজনের পক্ষেই পেইনফুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

অচিরা বললেন, 'হ্যাঁ, কাবেরী ওঁর সন্দেহের কথা বলেছেন। আপনার কালচরাল অ্যাকটিভিটির সঙ্গে উনি নিজে যেহেতু ইনভলভড হতে পারেন না, হয়তো সে জন্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন। সেই অভিমান থেকেও এ ধরণের ভাবনা আসতে পারে।'

দেবজিৎ বিরক্ত হল, 'আপনার কি ধারণা আমি ক্লাব অ্যাকটিভিটি ছেড়ে দিলে কাবেরী নিশ্চিন্ত হবে? ও তো আমার অফিসের মহিলা কলিগদের নিয়েও মাঝে মাঝে সন্দেহ করে। একবার এক মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দু'সপ্তাহের জন্যে ইউরোপে কাজে যেতে হয়েছিল। ফিরে আসার পর কাবেরীর কত রকম প্রশ্ন। ও মনে করে এনিথিং ইজ পসিবল।'

অচিরা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মন্তব্য করলেন, 'এরকম যে ঘটে না তা তো নয়। চাকরির জায়গায় একস্ট্রাম্যারিট্যাল অ্যাফেয়ারের জন্যে কত বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। সেনেটর, কংগ্রেস ম্যান, গভরনররা পলিটিক্যাল কাম্পেনে বেরিয়ে মহিলা ফটোগ্রাফার আর ক্যাম্পেন ওয়ার্কারদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন না? স্ত্রীরা কেন ভয় পায় বোঝেন? অবশ্য আমি এখনও ধরে নিচ্ছি না যে আপনার এরকম কোনো ইনটিমেট রিলেশনশিপ হয়েছিল, যার জন্যে কাবেরী বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন।'

অচিরার শেষের কথাটার জন্যে দেবজিৎ প্রস্তুত ছিল না। মহিলা কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন? নাকি কায়দা করে দেবজিৎকে কোনো স্বীকারোক্তিতে আসতে বাধ্য

করার চেষ্টা! ও কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছে বুঝে অচিরা যেন সহৃদয়ভাবে জানতে চাইবেন, 'আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। কখনো কি এমন ঘটেছিল?'

দেবজিৎ যেন দ্বিধাগ্রস্ত। এক মুহূর্ত চিন্তা করে মিথ্যে বলল, 'না, কাবেরীর সন্দেহের পেছনে এরকম কোনো ঘটনা ছিল না।'

ওদের আলাদাভাবে কাউন্সেলিং শেষ হয়েছে। আর দু-একটা দিন যেতে হবে। ওঁর থেরাপির প্রভাব আর কাবেরী, দেবজিতের নিজেদের চেষ্টায় বাড়িতে মোটামুটি শান্তি ফিরে আসছে। শুধু কাবেরী লক্ষ্য করছে দেবজিৎ যেন একটু চুপচাপ হয়ে গেছে। মিতা, সুদীপের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় অদ্ভুত শান্ত, সংযত ভাব। কাবেরী ভাবে দেবজিতের জেদ, অহংকার, ওকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার অভ্যাস—স্বভাবের এই দিকটা কি সত্যিই সাইকোথেরাপি করে বদলে গেল? হতে পারে। অচিরা ব্যানার্জি তো দুজনের দোষগুণ নিয়েই আলোচনা করতেন। কাবেরী নিজেও এখন ভেবেচিন্তে কথাবার্তা বলছে। ক্যারেন অ্যান্ডারসন সম্পর্কে নিজের সন্দেহের কথা অচিরাকে জানিয়েছিল। দেবজিৎ নাকি বলেছে এ সবের কোনো ভিত্তি নেই। শুনে কাবেরী স্বস্তি পেয়েছে। ইদানীং মনে হয় জীবনের কটা বছরই বা বাকি? আরও আগে কাউন্সেলিং-এ গেলে হয়তো অনেক অশান্তি এড়ানো যেত। ওর নিজের দুঃখ, অভিমানের কথা ছেলেমেয়ে বুঝলেও বাবাকে তো বোঝাতে পারেনি। সব কথা বলাও যায় না। তবু মিতার চেষ্টাতেই অচিরা বানার্জির মতো একজন প্রফেশনাল মানুষের সাহায্য পাওয়া গেল।

অ্যারিজোনার বাড়িতে অমৃতা অফিস যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, কাবেরীর ফোন এল, 'মিতা, কাল মাঝরাতে বাচ্চু ফোন করেছিল। মার স্টোক হয়েছে।'

অমৃতা বলল, 'সে কী? আমি তো লাস্ট উইকে দিদাকে কল করেছিলাম। কত কথা বললেন। হঠাৎ কী হল?'

'ব্লাড প্রেশার তো ছিলই। বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। ওরা হসপিটালে ভরতি করেছে। তখনও জ্ঞান ফেরেনি। মিতা, আমি আজ বিকেলের ফ্লাইটে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। জানি না গিয়ে কী দেখব।'

'একা যাচ্ছ? বাবা বোধহয় এত শর্ট নোটিসে ছুটি নিতে পারছে না?'

'ও যদি পরে যায় তো যাবে।'

'মনটা খারাপ লাগছে। দিদা বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন রণকে নিয়ে কবে

কলকাতায় যাব।'

কাবেরী বলল, 'আমার সঙ্গে পরশুও মা-র কথা হয়েছে। আসলে শরীর খারাপ হলেও তো বলতে চান না। বাচ্চু বলল, আয়াকে না ডেকে মা নিজে নিজে বাথরুমে যাচ্ছিলেন। বোধহয় তখনই মাথা ঘুরে পড়েছেন। কী বলবি বল? এখন সারাটা পথ শুধু চিন্তা নিয়ে যাব।'

অমৃতা উদ্বিগ্ন হল, 'তোমার একা যাওয়ার ব্যাপারেও আমার চিন্তা হচ্ছে। ইটস এ লং ট্রিপ। মা, আমি অফিসে গিয়ে তোমাকে আবার ফোন করছি। এর মধ্যে দিদার বাড়িতেও দেখি কাকে পাই। নয়তো ছোটমাসিকে কন্ট্যাক্ট করছি।'

দেবজিৎ কাবেরীকে নিউইয়র্ক থেকে প্লেনে তুলে দেওয়ার পরে বাড়ি ফিরে শ্বশুরবাড়িতে ফোন করল। শুনল হাসপাতালে শাশুড়ির জ্ঞান ফিরেছে। অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তারপর মিতা, সুদীপের সঙ্গে কথা হল। দিদা ভালো আছে জেনে ওরা আশ্বস্ত। এখন শুধু কাবেরীর কলকাতায় পৌঁছনোর খবরের অপেক্ষা।

সেই খবর বড় অদ্ভুতভাবে এল। প্রথমবার দিল্লির এয়ার ইন্ডিয়ার অফিস থেকে। দ্বিতীয়বার ইউ এস এমব্যাসি থেকে। এয়ার ইন্ডিয়া জানাল—প্লেন যখন দিল্লিতে পৌঁছয়, সব যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পরেও মিসেস কাবেরী আচার্য নিজে সিট-এ ঘুমিয়ে ছিলেন। এয়ার হোস্টেসরা আর ফ্লাইট ক্যাপ্টেন তাঁকে অসুস্থ মনে করে হুইল চেয়ারে নামানোর ব্যবস্থা করেন। এয়ারপোর্টের ডাক্তারের নির্দেশে কাবেরীকে অ্যাম্বুলেন্স করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এরপর দেবজিৎ যেন ওই হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

দেবজিৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো দিল্লির হাসপাতালে ফোন করল। কোনোভাবে মেডিকেল সুপারের সঙ্গে কথা বলা যাচ্ছে না। অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে কেউ কাবেরীর খবর দিতে পারছে না। পেশেন্টের অ্যাডমিশন হয়েছে কি না সেটা পর্যন্ত সঠিক জানা গেল না। দেবজিৎ মরিয়া হয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে ফোন করল। অনেক চেষ্টার পর একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল কাবেরীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে তার পরের কোনো খবর নেই।

এ মুহূর্তে দেবজিতের নিজেকে খুব অসহায় লাগছে। কাবেরী কোথায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, এখন কেমন আছে, কিছুই তো কেউ জানাতে পারছে না। প্রচণ্ড

উৎকণ্ঠায় ওর মাথা কাজ করছে না। দিল্লিতে চেনাশোনা কাউকে ফোন করে সাহায্য চাইবে? কিন্তু তার আগে ছেলেমেয়েকে জানানো দরকার। তাড়াতাড়ি দিল্লি পৌঁছনোর জন্যে নিজের ফ্লাইট রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মিতা, সুদীপকে ফোন করে কাবেরীর কথা জানাতে মিতা অস্থির হয়ে পড়ল। প্রায় তখনই ঠিক করল জেরির মার কাছে রণকে রেখে ও যেভাবেই হোক দিল্লি যাবে। সুদীপ বলল, 'এরকম এমার্জেন্সিতে এখনই আমাদের দিল্লির এমব্যাসির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করা উচিত। এখন ওখানে অফিস আওয়ার। আমি ফোন করছি।'

মিতা বারবার বলল, 'মা-র তো সুগারের প্রবলেম নেই। নাকি হার্ট অ্যাটাক হল? প্লেনে নিশ্চয়ই শরীর খারাপ হয়েছিল। স্টুয়াডেসরা যদি নাও খেয়াল করে, অন্য প্যাসেঞ্জাররাও কেউ বুঝতে পারল না? জেরি সাসপেক্ট করছে মা-র পায়ে ব্লাড ক্লট হতে পারে...

অন্য লাইনে ফোন আসছে বুঝে দেবজিৎ সেটা ধরতেই শুনতে পেল দিল্লির ইউ এস এমব্যাসি থেকে একজন অফিসার কথা বলতে চান। ও নিজের পরিচয় দিতে তিনি বললেন, 'খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনার স্ত্রী কাবেরী আচরিয়া আজ এখানে এ আই এম এস-এ মারা গেছেন। এ অবস্থায় আপনাকে আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

কথাগুলো দেবজিতের অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। সুস্থ মানুষ প্লেনে উঠল। পথে এমন কী হল যে এরা বলছে কাবেরী মারা গেছে? দেবজিৎ বিভ্রান্ত, 'দ্যাট সাউন্ডস ইমপসিবল! হাউ কুড ইট হ্যাপেন? আপনি জানেন আমার স্ত্রীর কী হয়েছিল?'

'ওঁর পাসপোর্টের সঙ্গে ডেথ সার্টিফিকেট ইউ এস এমব্যাসিতে জমা পড়েছে। আমাদের মেডিকেল অফিসার কজ অফ ডেথ ভেরিফাই করেছেন। মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী কাবেরী আচারিয়া পালমনারি এমবলিজম-এ মারা গেছেন। পায়ে ডিপ ভেইন থ্রম্বসিস থেকে ব্লাড ক্লট ওঁর লাংসে পৌঁছে গিয়েছিল।'

'হসপিটালে কোনো ট্রিটমেন্ট হয়েছিল? ওরা ইমিডিয়েটলি ব্লাড থিনার ইনজেকশন দিয়েছিল? এখানে তো এমার্জেন্সি সার্জারি করে। হোয়াই ডিড নট দে কন্ট্যাক্ট আস?' দেবজিৎ চিৎকার করতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল।

অফিসার সহানুভূতির সঙ্গে বোঝালেন, 'হসপিটাল অথরিটি জানিয়েছে চিকিৎসার সময় পাওয়া যায়নি। উনি অ্যাম্বুলেন্সে মারা গেছেন। মিস্টার আচারিয়া,

আমরা দুঃখিত যে এই সময়েও কয়েকটা কাজের কথা বলতে হচ্ছে।' সেই কঠিন কথাগুলো অনুমান করে দেবজিৎ শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কাবেরী এখন কোথায়?'

'বডি এখনও হসপিটাল মর্গে রাখা আছে। আপনি কি দিল্লিতে আসছেন? নয়তো বডি ইউ এস এ পাঠানোর জন্যে এয়ার লাইন্সের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে। হোয়াট এভার ইউ ডিসাইড, ইফ ইউ নিড এনি হেলপ, প্লিজ লেট আস নো।'

এমব্যাসির অফিসার তাঁর কর্তব্য সমাধান করে ফোন রেখে দিলেন। দেবজিৎ তখনও ধাতস্থ হতে পারেনি। কোথায় কোন হাসপাতালের মর্গে কাবেরীর দেহ পড়ে আছে। কী অদ্ভুত মৃত্যু! বিশ্বাস হয় না ও আর কোনোদিন এ বাড়িতে ফিরে আসবে না। মিতা, সুদীপ ভাবতেও পারবে না মা-র সঙ্গে ওদের আর এ জীবনে দেখা হবে না। এ মুহূর্তে সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ দেবজিৎকেই জানাতে হবে। হাতে আর সময় নেই। যেভাবেই হোক ওকে দিল্লি পৌঁছতে হবে।

পরের দিন ফ্লাইটে দেবজিৎ আর সুদীপ দিল্লি চলে গেল। অ্যারিজোনা থেকে মিতা পৌঁছল কলকাতায় ওর ঠাকুমার বাড়িতে। কাবেরীর মা তখনও হাসপাতালে। তাঁকে না জানিয়ে কাবেরীর শেষকৃত্য হল।

ফিলাডেলফিয়া ফিরে এসে মিতা, সুদীপ ইসকনের মন্দিরে মা-র কাজ করল। জেরি রণকে নিয়ে এসেছে। দুদিন পরে মিতাকে নিয়ে ফিরে যাবে।

মাঝের কয়েকটা দিন মিতার প্রায় ঘোরের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। বাবা আর ছোটভাই-এর কথা ভেবে যত কষ্টই হোক, ওর তো আর থাকা সম্ভব নয়। মিতার মনে হল ওরা যদি মা, বাবার কাছাকাছি কোথাও থাকত। মা বলত তোর বাবার কিছু হলে আমি একা থাকতে পারব না। কলকাতায় ফিরে যাব। মাঝে মাঝে তোদের কাছে আসব। সেই মা, বাবার ওপর পুরোপুরি ডিপেনডেন্ট মা শেষ পর্যন্ত বাবাকে একা রেখে চলে গেল।

যাওয়ার সময় দেবজিৎকে জড়িয়ে ধরে মিতা বলল, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা...কান্নায় ওর স্বর বুজে এল। দেবজিৎ বলল, 'আমি ঠিকই থাকব। ইউ টেক কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ অ্যান্ড ইয়োর ফ্যামিলি। মা তোদের কাছে গিয়ে খুব খুশি হয়েছিল। রণকে দেখে গেছে। এই সব কথাগুলো ভেবে কষ্ট ভুলে থাকার চেষ্টা কর।'

কাবেরী মারা যাওয়ার পর কয়েক মাসে কেটে গেছে। মিতা, সুদীপের সঙ্গে

দেবজিতের মাঝে আর দেখা হয়নি। ওর বন্ধুবান্ধব, অফিসের লোকজনদের সমবেদনা জানানোর পালা শেষ হয়েছে। তবু তারা খোঁজখবর নেয়। দেবজিৎ অফিস যায়। বাড়ি ফেরে। তবু তারা খোঁজখবর নেয়। দেবজিৎ অফিস যায়। বাড়ি ফেরে। সন্ধের পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এখন শুধু নিজের সঙ্গে থাকা! এক সময় দেবজিৎ তার নিজস্ব পরিসরে ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলো উপভোগ করার জন্যে কাবেরীকে উপেক্ষা করত। কাবেরী এই "স্পেস"-এর ব্যাপারটা বুঝতে চাইত না। অভিমান করত, রেগে যেত। আজ দেবজিতের অফুরন্ত সময়। অথচ বেশিক্ষণ ইন্টারনেটে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। টিভি দেখতে ভালো লাগে না। বই পড়তে বসে ক্লান্তি আসে। তীব্র একাকিত্বের অনুভব থেকে দেবজিতের রাতের ভাবনার মধ্যে কাবেরীর ছায়াশরীর ফিরে ফিরে আসে। কখনো সেই বিষণ্ণ মুখ প্রশ্ন করে—'আমাকে ভিড়ের মধ্যে ফেলে রেখে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' দেবজিতের মনে পড়ে কাবেরী মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলত। বারবার সেই একই গল্প।

'জানো, স্বপ্নে দেখলাম আমি বাচ্চাদের নিয়ে একটা অচেনা স্টেশনে বসে আছি। ভিড়ের মধ্যে আমাদের বসিয়ে রেখে তুমি কোথায় যে চলে গেলে। ট্রেন এসে গেল। লোকজন ছুটে যাচ্ছে। আমি বাচ্চাদের হাত ধরে পাগলের মতো তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

আবার কখনো বলত, 'স্বপ্নে দেখলাম আমি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমাাকে ফেলে রেখে অনেক লোকজনের সঙ্গে চলে গেলে। আর ফিরেই এলে না।'

আধো তন্দ্রায় দেবজিৎ নিজের মনে বলে ওঠে—আমাদের ফেলে রেখে তুমি কোথায় চলে গেলে কাবেরী?

এক ঝড়বৃষ্টির রাতে দেবজিতের ঘুম আসে না। কখন সেই ছায়াশরীর কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে—আজ সত্যি কথা বলো দেবজিৎ। তুমি কখনো আমাকে ঠকাওনি? আমার সব সন্দেহ তবে মিথ্যে ছিল?

গোপন পাপবোধের তীব্র গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে দেবজিৎ বলতে থাকে—শুধু একবার কাবেরী। একবার তোমাকে মিথ্যে বলেছি। সেই প্রবঞ্চনার আঘাত তুমি সহ্য করতে পারতে না কাবেরী। আমাদের সংসার ভেঙে যেত। তখন আমরা গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত। সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। তুমি তো শান্তি

নিয়েই চলে গেছ। আজ আর আমাদের কী আসে যায়?

এই স্বীকারোক্তি, কাবেরীর সঙ্গে নিঃশব্দ সংলাপের শেষে ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম আসে। ভোরের অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। আবার একটা কর্মব্যস্ত দিন। সন্ধেয় বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়ার পর অন্ধকারে বাগানে বসে থাকা। নিঃসঙ্গ মুহূর্তে দেবজিৎ জীবনের হিসেব মেলাতে বসে। এখনও চাকরিটা আছে। বন্ধু-বান্ধব আছে। ছেলে, মেয়ের কাছে বেড়াতে যাওয়া আছে। দেশে গিয়ে ভারতদর্শন করা যায়। ভাবনাগুলো ক্রমশ দেবজিৎকে বেঁচে থাকার জন্যে উজ্জীবিত করে। ভাবে ভাবে একলার জীবন হয়তো এভাবেই কেটে যাবে।

———

করালী দখলদারের ইতিবৃত্তান্ত

নিউজার্সির 'সাগরিকা' ক্লাবের সেক্রেটারি মরালী মজুমদারকে ফোন করে নতুন মেম্বার করালী দখলদার যখন আত্মপরিচয় দিয়েছিল, মরালী ভারী আশ্চর্য হয়েছিল। অদ্ভুত নাম তো! পদবিটা কি আগ্রাসী! অথচ নাম, পদবি মিলিয়ে মরালীর সঙ্গে যেন ছন্দবন্ধনে বাঁধা। ক্লাবে ঢুকেই লোকটা কী কী করতে চায়, তার ফিরিস্তি শুনতে শুনতে মরালী ভাবছিল করালী ক্ষমতা দখল করতেই ঢুকেছে নাকি? এই ছোট্ট বাঙালি সমাজে এর মধ্যেই তার কাণ্ডকারখানার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

করালী দখলদার নিজের জীবনকে ক্রমশ ইসুময় করে তুলছে। তার একেকটি বায়নাক্কা সামলাতে কিছু লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। গত বছর সাহিত্যিক হবে বলে 'আন্তরিক' পত্রিকার সম্পাদক সুজন দাশগুপ্তর সঙ্গে কী রাগরাগি। আদিরসের ময়ান-টয়ান দিয়ে করালী এমন সব খাস্তা গল্প লিখে পাঠাচ্ছিল, যে গভীররাতে পাঠ করে সুজনকে কানে, মাথায় জলের ঝাপটা দিতে হয়েছে। নিজের নাম মাহাত্ম্য বজায় রাখতে সুজন কাহাকেও কুবাক্য বলে না। কিন্তু করালীর রচনাবেগ রুখতে তাকেও স্পষ্ট কথা বলতে হয়েছিল, কি সব রগরগে নাম! 'জঙ্ঘায়, জঙ্ঘায় সংঘাত', "অতলান্তিক উলঙ্গ উর্বশী', দুটো গল্প পড়েই সুজন করালীকে ফেরত পাঠিয়েছিল। করালী কদিন মারমূর্তি ধরেছিল। ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

'সাগরিকা' ক্লাবে প্রথম বছরদুয়েক করালী বেশ খাটাখাটুনি করল। দুর্গা পুজোর সময় হেঁইও বলে ঠাকুরের একচালা ভারী মূর্তি কাঁধে তুলতে যাচ্ছে। রান্নাঘরে বিশাল, বিশাল ঢেক্‌চির মধ্যে ত্রিশূলের কায়দায় কাঠের খুন্তি ধরে খিচুড়ি নাড়ছে। পিক্‌নিক-এ গিয়ে গাদা গাদা বাসন মাজছে। করালীর বউ তো বরের কর্মকাণ্ড দেখে অবাক!

আসলে করালী তখন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হওয়ার বাসনায় বাসন মেজে, রান্না করে সবাইকে ইমপ্রেস করছিল। ক্রমশ সকলের সঙ্গে তার কী মধুর ব্যবহার।

একবছর ধরে বাইশজন মহিলাকে আলাদা করে উইক্-ডে তে ঘরে বাইরে লাঞ্চ খাওয়াল। মরালীর মতো বেকার গৃহবধূদের বাড়িতে 'সাগরিকা' ক্লাবের ভূত, ভবিষ্যৎ নিয়ে তার কত গভীর আলোচনা। আর চাকুরেদের অফিস থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে "ম্যাড্রাস গার্ডেনে" দোসা, ইড্‌লি খাইয়ে কত শলাপরামর্শ। সাগরিকার আসন্ন ভরাডুবি ঠেকাতে করালী তার ক্যাপ্টেন্ হতে চায়। মরালীরা যেন গাধাবোটের ছদ্মবেশ পরা দিশারী। করালীর চোখে তাদের তখন নবমূল্যায়ন হচ্ছে। বাইশজন মহিলাই ভাবছে—আমি নইলে মিথ্যে হবে করালীর ভোট জেতা।

এর কারণ, করালী প্রত্যেককে আড়ালে বুঝিয়েছে ক্লাব চালাতে গেলে এমন অসাধারণ কর্মী মহিলার সাহায্য না পেলে নবযুগ আনা যাবে না।

মরালীরা সবাই তখন কমরেড। শকুন্তলাকে করালী টোপ দিয়েছিল—তোমাকে হিরোইন না করলে, এবার গৌতম দাসের হাত থেকে পুজোর থিয়েটার কেড়ে নেব। শকুন্তলা পরে বনানী আর সুমনার কাছে খবর পেল ওদেরও করালী এক টোপ দিয়েছে। তিনজনে কি হাসাহাসি। ওদিকে করালী সব ফিল্‌ডে কাজ গোচ্ছাছিল। দুর্গা পুজোর মিটিং-এ তমালিকে একটা চোখ ছোট করে মিটমিটিয়ে হেসে বলেছিল, 'দুধগরদে তোমায় যা মানায় না! তুমি কিন্তু পুজোর কাজে লীড্ নেবে প্লিজ!' "সাগরিকার" রাঙাবউদি আর ছন্দাদির হাত থেকে সন্দেশের থালা আর ফল কাটার ছুরিগুলো কেড়ে নেবে তো? ওনাদের মাতব্বরী বন্ধ করতে হবে।'

তমালি কি আর মাল চেনে না? তবু দুধগরদের শাড়ির গ্যাস খেয়ে সামান্য গোলাপী হয়ে বলেছিল, 'যাঃ ওঁরা কতদিনের ভেটারেন। নৈবেদ্যতে এক্সপার্ট! দুঃখ পাবেন না?'

করালীর মৃদু হাসি, 'পুরোনোদের তাড়াতেই তো এসেছি। মার মার করে সবকটা ফাউন্ডার মেম্বারদের তাড়াব। মৌরসী পাট্টা? এ বলে আমার বাড়ির বেস্‌মেন্টে ক্লাবের "আরকাইভ" হবে। ও বলে আমরা বর বউ মিলেমিশে লাগাতার ট্রাস্টি বোর্ড আর কমিটির মেম্বার হয়ে বসে থাকব। সে বলে আমার জামাইবাবুকে 'সাগরিকা'র কলকাতা ব্র্যাঞ্চের লাইফ্ এজেন্ট করে দিতে হবে। তার মানে ওখান থেকে আর্টিস্ট পাঠিয়ে কমিশনের ডলার হাতাবে। পুরোনোদের জবরদখল ভাঙব এবার।'

তমালি ভয় পেয়ে রাঙাবউদিকে ইনফর্মেশন দিতেই ক'টা উইকেট পড়ে

গেল। কিন্তু করালী সাংঘাতিক ক্যাম্পেন চালাচ্ছিল। ইলেক্‌শনের দিন অর্ধেক লোককে মরালীরা চিনতেই পারছিল না। বড় বড় ভ্যান্ এসে ক্লাবের পার্কিং লটে থামছিল। নিউইয়র্ক, কানেটিকাট, পেনসিলভানিয়ার নাম্বার-প্লেট দুলছে আর ভ্যানের পেট খালি করে নেমে পড়ছে অচেনা বাঙালি দঙ্গল। এরা সময় থাকতে চাঁদা দিয়ে ক্লাবের মেম্বার হয়েছে। অনেকের চাঁদা নাকি করালী নিজের পকেট থেকে দিয়েছিল।

মরালীরা করালীর প্রতিপক্ষে রাঙাবউদিকে দাঁড় করিয়ে ভারী নিশ্চিন্তে ছিল। ফাউন্ডার মেম্বার হিসেবে উনি ক্লাবের জন্যে কম খাটেননি। উনি আর ওঁর স্বামী ক্লাবের "রাঙাদা" (গগন মিত্র) দুজনেই মাথা ঠান্ডা মানুষ বলে সুনাম আছে। ক্যান্‌ডিডেট ধুরন্ধর করালী দখলদারকে কি মেম্বাররা সাপোর্ট করবে?

এর মধ্যে করালী কয়েকজনের মগজধোলাই এর চেষ্টা করেছিল। একদিন খুব দরকারি কথা আছে বলে মরালীকে ফোন করেছিল। বলেছিল, 'মরালী, আপনাকে সবাই এত হিংসে করে! সত্যি! হাতে পাওয়ার আসুক। ওদের হিংসে আরও বাড়িয়ে দেব।'

সেকথা শুনে মরালীর যে মন খারাপ হয়নি তা নয়। নিজেকে বাইশজনের জিঘাংসার ভিকটিম বলে ভাবা যায়? করালী তখন ফোনেই নাকি নাকি সুরে গাইছিল, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী...'

গানের শেষ কথাটা ভুল। তাছাড়া করালীর সবকথা মরালী বিশ্বাস করতে চায়নি। ছোটবেলায় সুচিত্রা মিত্রের ছাত্রী ছিল বলে ক্লাবের সব ফাংশানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া ছাড়া ওর আর কি দোষ যে, লোকের রাগ হতে পারো? আর, বাইশজন মহিলার একসঙ্গে এত হিংসুটে হওয়া সম্ভব নয়। সুখে-দুঃখে বিপদে আপদে এদের দেখছে না মরালী? করালী নির্ঘাৎ দু-চারজনের রাগঝালের খবর বার করে এনে ওকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল।

অবশেষে ক্লাবের ভোটের দিন এল। সারাদিন ধরে রাঙাবউদির বুড়ো বয়সে গর্ভযন্ত্রণা চলছিল। অথচ করালীর মুখে অনবিল হাসি। নিজের বউকে আনেনি ভোটের উত্তেজনা সইতে পারবে না বলে। আর মরালী, তমালিদের মতো গাধাবোটদের কি টানাপোড়েন! চারদিকে যা কোর্টকাছারি, মামলা-মকোদ্দমা চলছে। নিউইয়র্কে এক ক্লাবের দুর্গাঠাকুর নিয়ে দু'দলের হাতাহাতি। যারা প্রতিমা দখল করে রেখেছে, তারা অন্যদলকে ঘটপুজোর উপদেশ দিয়েছে। ক্লাবের ক্ষমতা দখল নিয়ে

বাঙালিদের বন্ধুবিচ্ছেদও হচ্ছে। কিন্তু তারই মধ্যে ছোটখাটো মতান্তর নিয়েও "সাগরিকা" তো দিব্যি ভেসে চলেছে। কে জানে এবার কে হাল ধরতে আসবে। গত এক বছর ধরে মাঝে মাঝে গোপন বৈঠকের খবরও শোনা গেছে। রাঙাবউদি আর করালীর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে খেয়ে কিছু উপেদষ্টার অগ্নিমান্দ্য হওয়াতে তারা অ্যান্টাসিডও সাপ্লাই দিয়েছে।

করালী আর রাঙাবউদির মধ্যে জব্বর প্রতিযোগিতা হল। সারাদিন রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ। মরালীরা কেউ ঝেড়ে কাশেনি। করালীর সাপোর্টারদের হাতে বড় বড় পোস্টার। তাতে লেখা—"ভোট ফর করালী"। অন্যদিকে রাঙাবউদির মাদ্রাজি ছেলের বউ মীনাক্শী হাতে হাতে কাগজ বিলোচ্ছে। তাতে লেখা—'পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।' ও নিশ্চয়ই প্রবাদের মানেটা জেনে নিয়েছে। সেকেন্ড জেনারেশন 'কনভিন্সড্' না হয়ে কাজ করবে না।

ভোটের আগে দুই ক্যান্ডিডেট্‌কে হারমোনিয়ম বাজিয়ে আলাদা আলাদা গান গাইতে হল। কালচারাল ক্যাম্পেন। রাঙাবৌদি ধরা গলায় কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গাইলেন, 'পুরানো জানিয়া চেওনা আমারে আধেক আঁখির কোণে...।' রাঙাদা রঙিন ট্যিসু দিয়ে নাক ঝাড়লেন। মরালীরা দ্রবীভূত। 'আপনারে ঝর্না দেয় ত্যাগরসে উজ্জ্বলি...।' আরও বেশি বেশি নাক ঝাড়ার আওয়াজ শোনা গেল।

স্টেজে করালী এলো একেবারে মিলিটারি কায়দায়। ঝমর ঝমর করে টেবিলে রাখা হারমোনিয়ম বাজিয়ে প্রথমে জুতো দিয়ে তাল ঠুকলো তিরিশ সেকেন্ড। তারপর তবলচি পঙ্কজের দিকে চোখ টিপে ঈশারা দিতেই—ধাঁই ধাঁই ধরতাই বোল্। করালী নাটকীয় চিৎকারে গান ধরল, 'কারার ঐ লৌহকপাট, ভেঙে ফ্যাল্ কর রে লোপাট...।'

করালীর সাপোর্টাররা যখন হা হা হা পায় যে হাসি বলে দোহার দিতে গেছে, তমালি, মরালীরা সমস্বরে বলল, 'কোরাস গাওয়া চলবে না চলবে না।' করালীর সরু গলার গান, যুদ্ধযাত্রার মতো ভাবভঙ্গী, দলের লোকেদের হা হা হা ছাপিয়ে রাঙাবউদির দল তাল্ দিয়ে গাইতে লাগল, 'পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। রাঙাবউদি জিন্দাবাদ।' সভা লণ্ডভণ্ড। শেষ পর্যন্ত ইকেলশন কমিটির দুই চেয়ারম্যান চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত তুলে সবাইকে থামালেন। ভোট দেওয়ার জন্যে লম্বা লাইন পড়ে গেল।

সেদিন পড়ন্ত বিকেলে ভোট গণনা সারা হল। যে পথ দিয়ে রাঙাদারা এসেছিলেন, সে পথ দিয়ে ফিরলেন না তাঁরা। করালী পঁচিশটা বেশি ভোট লুটে নিয়েছে। তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আনন্দে আত্মহারা। "সত্যর জয়, সত্যের জয়" বলতে বলতে হাত উঁচু করে বেরিয়ে পড়ল। করালীর ক্যাম্পেনের প্রধান উপদেষ্টা অবনীদার বাড়িতে শ্যাম্পেন টোস্ট করে ভিক্‌ট্রিপার্টি হবে। ওদের মুখে "সত্যের জয়, সত্যের জয়" শুনে রাঙাবউদি দুঃখে, অপমানে মর্মাহত। এদের কত সন্দেশ, চমচম খাইয়েছেন এতকাল।

এরপর ক্যাপ্টেন করালীর নেতৃত্বে 'সাগরিকা'র যাত্রা শুরু হল। প্রথম প্রথম রাঙাবউদির দল মুষড়ে পড়েছিল। তারপর যা হয়। প্রত্যেক নেড়ানেড়ি আবার বেলতলায় ফিরে এলো। কারণ 'সাগরিকা'র কাছে তারা তো কিছুটা দায়বদ্ধ। এত কষ্ট করে গড়া ক্লাব। বেহাত হতে দিলেই হল?

করালীর তখন পোয়াবারো। ক্লাব চালানো তো সোজা নয়। এদের দিয়ে কার্য উদ্ধার হলেই হল। করালী চটপট অভিমানী নেড়ানেড়িদের কাজে লাগিয়ে দিল। শুধু তারপর দু'বছর ধরে তার চেলারা সামান্য বিদ্বেষবিষ ছড়িয়ে দিয়ে কয়েকটা ফ্যামিলির সাময়িক শান্তিভঙ্গ করল।

দু'বছর পরে নিজের টার্ম শেষ হওয়ার সময় ক্লাবের বার্ষিক মিটিং-এ করালী বক্তৃতায় বলল, 'আজ আমার দায়িত্ব শেষ। 'সাগরিকা'র নাম শুনে এসেছিলাম। দেখলাম সাগর কোথায়? কুয়োর মধ্যে ভিঙ্গি চালাতে আসা। ব্যাঙে ব্যাঙে ছয়লাপ। কোলা, সোনা কিছু বাদ নেই। আবার ব্যাঙাচিদেরও ভবিষ্যৎ দেখতে হবে। এদিকে ডিঙ্গি চালাতে গেলেই ব্যাঙেদের মাথায় বাড়ি পড়ে। কোমর ভাঙে। এত স্পর্শকাতর ব্যাঙের দলকে কিছু বোঝানো যাবে না। যত বলি কুয়ো ছেড়ে সব বাইরে চলো। সাগরে নিয়ে যাব তোমাদের। তা না, কনস্টিটিউশন আঁকড়ে কুয়োর মধ্যে বসে থাকবে। কোনো ঢেউ তুলতে দেবে না...

এইসব আগড়ম-বাগড়ম বকে করালী বক্তৃতা থামিয়েছিল। বাঙালিদের কূপমণ্ডুক বলার জন্যে তার বিদায়বেলার দিনে অনেকেই দু-কথা শুনিয়েছিল। সেই যে করালী 'সাগরিকা' থেকে সরে গেল, আর তার টিকি দেখা যেত না।

মরালীর সঙ্গে হঠাৎ সে মুখোমুখি হল বছর তিনেক বাদে। ফ্লোরিডার বঙ্গ সম্মেলনে। মরালী দেখল করালী রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে এক ভদ্রলোককে জেরা

করছে। ভদ্রলোক ঘাবড়ে গিয়ে হাতে ধরা চৌকো শীল্ড দেখিয়ে কি সব বলতে চেষ্টা করছেন। বেশ ক'জন লোক জড়ো হয়ে গেছে। ভদ্রলোক করালীকে বলছেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি কি অ্যাওয়ার্ড চেয়েছি? বঙ্গ সম্মেলন কমিটিকে গিয়ে বলুন না...।'

করালী দাবড়ে দিল, 'আরে, রাখুন মশাই সম্মেলন কমিটি। যতসব মুখ চেনাচিনির কারবার। বছর বছর বঙ্গ সম্মেলনে ডিস্‌টিঙ্গুইশড্ সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে। অথচ যোগ্য লোকেদের রেকগ্‌নাইজ করা হচ্ছে না।'

'কি আশ্চর্য! আমি পেয়েছি বলে এত রাগ নাকি? কিন্তু আমি তো কমিটির একজনকেও চিনি না। অ্যারিজোনায় থাকি। এঁরা অ্যাওয়ার্ড নিয়ে ডাকলেন বলে আসতে হল। মহাবিপদ!'

'সত্যি কাউকে চেনেন না? বসন্ত সেন, সুবীর ঘোষ, মঙ্গল ভট্‌চাজ, এঁদের কাউকে চেনেন না?'

'সত্যি বলছি মশাই। আজ প্রথম দেখলাম ওঁদের। অ্যারিজোনায় থেকে ইস্টকোস্টের এত লোককে চিনব কী করে?'

ততক্ষণে করালীর শোরগোলে আরও কয়েকজন চলে এসেছে। হঠাৎ বঙ্গসম্মেলন কমিটির ব্যাজ পরা এক মহিলা ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন, 'আচ্ছা, আপনি এরকম রাগারাগি করছেন কেন বলুন তো? দীপ্তেনবাবু অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ওঁর কালচারাল কন্ট্রিবিউশনের জন্যে। স্টেট কলেজে টেগোর লিটারেচর পড়ান। সেকেন্ড জনারেশনের জন্যে রবীন্দ্রনাথের বই ট্র্যানস্লেট করেছেন...'

ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে পড়লেন। মহিলাকে বললেন, 'না, না এত কিছু বলার মতো নয়।'

করালী কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র নয়। মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে। উনি না হয় পেলেন। কিন্তু আরও তো গুণী বাঙালি আছে। তারা কি ভাবে আপনাদের রীচ করবে? মানে প্রসেস্‌টা কী?'

ভদ্রমহিলা সামান্য হাসলেন, 'রীচ করার কোনো প্রসেস্ নেই। কেউ যদি কোনো স্পেশ্যাল কাজ করে থাকেন বা তাঁর বিশেষ ট্যালেন্ট থাকে, বঙ্গসম্মেলন কমিটিই তাকে সিলেক্ট করে। প্রত্যেক বছর এভাবেই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে।'

লোকেরা করালীকে নিয়ে মজা পাচ্ছিল। করালী বেগতিক বুঝে ভিড়ের মধ্যে

হারিয়ে গেল। মরালীর মনে পড়ছিল কয়েকবছর আগের ঘটনা। সে বছর 'সাগরিকা'র এক মেম্বার যখন ইমিগ্র্যান্ট বাঙালিদের জীবন নিয়ে নাটক লেখা আর পরিচালনার জন্যে বঙ্গসম্মেলনে ওই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল, করালী কিছুতেই তার নামটা ক্লাবের পুজোর সময় স্টেজে বলতে দেয়নি। পাছে আরও প্রচার হয়ে যায়। এমন হিংসুটে, কুটিল লোকের বন্ধুবান্ধবও হয় না। করালীর বউ মানুষটা খারাপ নয়। কিন্তু করালীকে টলারেট করা ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠছিল।

ফ্লোরিডা বঙ্গসম্মেলনের পরে করালীর সঙ্গে মরালীর আর দেখা হয়নি। মরালীরা ক্যালিফোর্নিয়া চলে গিয়েছিল। সেখানে নতুন বাঙালি সমাজ। "প্রবাসী" ক্লাবে মেম্বার হয়ে আবার রবীন্দ্রজয়ন্তী, পিকনিক, দুর্গা পুজো, নিউইয়ার্স ইভ্ পার্টি। আমেরিকার পূর্ব উপকূলে করালী দখলদার, পশ্চিম উপকূলে মরালী মজুমদার 'সাগরিকা'র এপারে, ওপারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তিনবছর পরে এবার নিউইয়র্কে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে বঙ্গসম্মেলন হবে। যথারীতি আবার করালী দখলদার! নিউজার্সির সাগরিকা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়ে ভরাডুবির পর দীর্ঘদিন ঘাপটি মেরেছিল। স্টেজে কোরাস্ গাওয়া বন্ধ। নাটকে সাইড রোলে রাজি হয় না। দুর্গাপুজোয় বিসর্জনের বাজনার সঙ্গে দুল্‌কি চালে নাচে না। ম্যাগাজিনে রগ্‌রগে প্রেমের গল্প লেখাও ছেড়ে দিয়েছে। করালীর এইসব অনীহার কারণ জানতে চাইলে বিরস বদনে উত্তর দেয়, 'কাল্‌চারে আল্‌সার।'

হঠাৎ কী যে হল বঙ্গসম্মেলনের নামে করালী যেন শীতের ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। অনেক বছর পর সম্মেলন কমিটির মিটিং-এ হাজির হল। হাল, চাল বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় চা সামোসা খেতে খেতে উৎসবের নানা সাব-কমিটির ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর খবর নিতে থাকল। করালীর মনে হল উচ্চপদ নিয়ে ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর চেয়ে সাব-কমিটিতে ঢোকাই বুদ্ধির কাজ। উইক্-এন্ডে বিনে পয়সায় ঘুগনি, স্ট্যান্ডউইচ খেতে খেতে দুটো বড় বড় কমিটির শাখা, প্রশাখার দলে নাম লেখাল। 'ওভারসীজ্ পারফমিং আর্টস্' আর 'ভেন্ডার্স্ অ্যান্ড স্টল্‌স।'

'ওভারসীজ্ পারফমিং আর্টস' ব্যাপারটা বেশ ব্যাপক। কমিটিতে থেকে তুমি সংস্কৃতি-সদস্যও হতে পারো। আবার শ্রমিকও হতে পারো। মানে, সিলেকশন কমিটিতে থেকে বঙ্গসম্মেলনে পেনডেন্ট মুখার্জি আসবে, না ঋতুঝর্ণা আসবে, সে সিদ্ধান্ত যেমন নিতে পারো, সেরকম শ্রমিক কমিটিতে ঢুকলে আর্টিস্টদের ভারী

ভারী বাজনাবদ্যি নিয়ে প্রচুর মাল টানাটানির গুরুভারে নিয়োজিত থাকতে পারো।

কিন্তু করালী বুঝতে পারছিল কালচারে তার যথেষ্ট আগ্রহ আর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গউৎসবের সাংস্কৃতিক কমিটি তাকে দলে নিচ্ছে না। অগত্যা শ্রমিক দলে নাম লেখাল। শ্রমের মর্যাদা কীভাবে পেতে হয়, তার একটা ফর্মুলা ভেবে রাখল। তার মগজে এখন নানা পরিকল্পনা। উৎসবের আগে কলকাতায় গিয়ে পকেটের পয়সা খরচ করেই একবার পেন্‌ডেন্ট মুখার্জির সাক্ষাৎকার নেবে। নিউইয়র্কের এয়ারপোর্টে নায়িকার ক'টা সুটকেস্ টানতে হবে জেনে নেবে। সে 'সন্তোষীমা' ব্রতপালন করে জানলে বঙ্গউৎসবে শুক্রবারে তাকে টক্ ছাড়া রান্না খাওয়াবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী করালীর বড়ো মুখঝামটা দিলেও ওই কাজে সাহায্য করবে। কলকাতার টেলিভিশনের কোনো লোকজনকে করালী তেমন চেনে না। "নক্ষত্র বাংলা" চ্যানেলে নিউইয়র্ক-হিউস্টনের কত কর্মকর্তাদের সহাস্য সাক্ষাৎকার দেখা গেল। করালীকে আর কে ডাকবে? তার চেয়ে "বর্তমান" কাগজের নীহারিকাদিকে ধরলে হয়তো পেনডেন্ট মুখার্জির সঙ্গে করালী দখলদারের প্রাক্ বঙ্গউৎসবের সাক্ষাৎকারটা বেরিয়ে যেতে পারে। নীহারিকাদির দৌলতে এ পত্রিকায় আমেরিকার কত বাঙালির ছবি ছাপা হয়েছে। করালীর "ব্যাপিকা বিদায়" নাটকের ছবিটা একেবারে কান ঘেঁসে বেরিয়ে গিয়েছিল। দলের ঠেলাঠেলিতে একেবারে উইংস-এর পাশে দাঁড়ানোর ফল। যাক্, এবারের ছবিতে থাকবে শুধু ও আর পেনডেন্ট!'

একদিকে ওভারসীজ্ আর্টিস্ট, অন্যদিকে ভেন্ডারদের লিস্ট বগলে করালী শীতকালে প্লেনে চড়ে বসল। নন্‌স্টপ ফ্লাইটে নন্‌স্টপ পরিকল্পনা। কলকাতায় পৌঁছে করালী বাহারি চুড়িদার কুর্ত্তা কিনল। বঙ্গউৎসবের জন্যে বেঙ্গল ক্লাবে "কিক্ অফ্ নাইট।" কালচারের ফুটবলে প্রথম লাথিমারা উপলক্ষ্যে উৎসবের কর্ত্তাব্যক্তিদের নেমন্তন্ন পেয়ে সেলিব্রিটি, উপমন্ত্রী, অপমন্ত্রী থেকে শুরু করে লেখক, সাংবাদিক, বিজ্‌নেস ম্যাগনেট কে না আসবে। যথারীতি করালীও যাবে। কারণ, এ ব্যাপারে উৎসব কমিটি খুব উদার। একবার তো আহুত, রবাহুত মিলে এমন লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল যে, গঙ্গার ওপর ভাসমান রেস্তোঁরা থেকে এক প্রেস্‌ফোটোগ্রাফার জলে পড়ে গিয়েছিল।

করালী রবাহুত নয়। দুটো কমিটির শ্রমিক। চুড়িদার কুর্ত্তার সঙ্গে কাঁধে শাল

চাপিয়ে 'কিক-অফ্ নাইটে' এল। সঙ্গে তসর সিল্কের ওপর অ্যাপ্লিকের শাড়ি পরা বউ। লোক গিজগিজে ব্যাঙ্কোয়েট হলে আমেরিকার চেনামুখ বেশ কয়েকজন। কিন্তু করালীর চোখে যাকে খুঁজছে, তার দেখা নাই রে তার দেখা নাই। একটু খোঁজ নিতে জানা গেল পেন্‌ডেন্ট ব্যাংককে ছবির শ্যুটিং-এ চলে গেছে। কিন্তু মেঘ না চাইতেই জল "তিসরী কসম্" ছবিতে রাজকাপুর যেমন প্রথমবার ওয়াহিদা রহমানকে দেখে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'আরে, ইয়ে তো পরী হ্যায়।' করালীরও চোখের সামনে ঋতুঝর্ণাকে দেখে সেরকম রি-অ্যাক্‌শন হল। অথচ নায়িকার ধারে কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। বঙ্গউৎসবের দুই চেয়ারম্যান দু'পাশে তাদের বউ আর মাঝে ঋতুঝর্ণাকে নিয়ে পার্মানেন্ট প্রেস। টিভি আর প্রেস লাগাতার ছবি তুলে যাচ্ছে। করালী কয়েকবার ভিড় ঠেলে এক্সকিউজ মী বলতে বলতে ঋতুঝর্ণার কাছাকাছি পৌঁছেন বটে কিন্তু কথা বলার চান্স নিল না। নিজের পরিচয় দেওয়ার আগে হঠাৎ বদখত্ নামটা ভেবেই সরে পড়ল।

এ এক ধরণের আইডেন্‌টিটি ক্রাইসিস্। এই বিকট নামের বোঝা বহন করার জন্যে দায়ী হলেন ওর ঠাকুর্দা। তুমি কালীভক্ত ছিলে, ফাইন। কিন্তু কালীপুজোর দিন নাতি জন্মালো বলে তার নাম করালীপ্রসাদ রাখার কী রাইট ছিল তোমার? মা, বাবাও তেমনি। এ হুকুম মেনে নিয়েছিল। এখন কেউ শুনবে? করালীর মেয়ে পিংকির নাম যদি কেউ "বগলা" রাখতে চাইত, ওরা রাজি হত? শেক্সপিয়র যাই লিখে থাকুন, বদ্‌খত নামে খুব ক্ষতি হয়। করালীর নাম শুনে একসময় দুটো মেয়ে ফোনেও প্রেমালাপ করতে চায়নি। নেহাত সম্বন্ধ করে বিয়ে আর ওর চেহারাটা কালীঠাকুরের স্বামীর মতো হ্যান্ডসাম বলে বউ মুগ্ধ হয়েছিল।

এখন, তো আর চেহারার সেই জৌলস নেই। ঋতুঝর্ণা ফিরেও তাকাল না। সাক্ষাৎকারের ভাবনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে করালী ভেন্ডারদের সঙ্গে আলাপটালাপ করল। দু-তিন জন নাট্যকারের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে তাদের নাটকের খবর নিল। তারপর খাবারের লাইনে দাঁড়াল। কোথায় বিরিয়ানী কোথায় রেজালা? স্যান্ডউইচ ও নিরামিষ। সঙ্গে পালং-এর বড়া আর পেঁয়াজি। এটা নাকি ডিনার পার্টি নয়, ছাতা মাথা দিয়ে কক্‌টেল পার্টি। ঠিক আছে। বিনে পয়সার ভোজ। কিন্তু করালীর ইচ্ছে হল পার্টির কলকাতার স্পন্‌সরদের ডেকে বলে—একবার আমেরিকায় এসে দেখে যান মশাই, ওখানে কক্‌টেল আওয়ারে কতরকম স্ন্যাকস্ সার্ভ করে। করালী লোভী নয়। কিন্তু বঙ্গউৎসবের প্রথম লাথিমারা পার্টিতে ঘুরে ঘুরে শাকের বড়া আর

ক্ষুদিরাম সাইজের তেকোণা স্যান্ডউইচ? বলরামের সন্দেশও তো রাখতে পারত। বাড়ি ফেরার পথে করালী চাইনিজ্ টেক আউট নিয়ে যেতে চাইছিল। বউ রাজি হল না। পার্টিতে টুকরো টুকরো কেক, পেস্ট্রি খেয়ে তার পেট ভরে আছে। রাগের মাথায় করালী একবাক্স হাক্কা চাউমিন কিনে বাড়ি ফিরে খেতে বসে গেল। মাথায় তখন অন্য ফন্দিগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে।

শ্রমিকের প্রথম কর্তব্য কিছু নাটক দেখা। শোনা যাচ্ছে, বিখ্যাত যে দুটো দল নাটক নিয়ে বঙ্গউৎসবে যাবে। তাদের নাকি বিরাট কাস্টিং। অত লোকের প্লেন ভাড়া দেওয়া যাবে না। তাই আমেরিকার কজন লোক্যাল ট্যালেন্টদের নিতে হবে। সেরকমই চেষ্টা চলছে। নিজের অভিনয় ক্ষমতার ওপর করালীর বিরাট কপফিডেন্স। সেই প্রস্তাব নিয়ে আর ফোকটে দু-তিনটে নাটক দেখার জন্যেও নাট্য পরিচালকদের ফোন করল। আমেরিকার বঙ্গউৎসবের অন্যতম কর্মকর্তা বলে পরিচয় দিয়ে হলের সামনের সারিতে বসে তিনদিন নাটক দেখল। তারপর অভিনয় করার প্রস্তাব দিয়ে নিজের সেলফোন নম্বর, ই-মেল্ অ্যাড্রেস্ রেখে এল। পরিচালকদের বুঝিয়ে এল— ওখানে স্টেজ ম্যানেজমেন্টে তো আমাকে থাকতেই হবে। দরকার হলে কন্ট্যাক্ট করে আগে স্ক্রীপ্ট পাঠিয়ে দেবেন। ছোটখাটো রোল ম্যানেজ করে দেওয়া উড্ বী নো প্রবলেম।

করালীর পরবর্তী অভিযান ছিল ভেন্ডার অ্যান্ড স্টল ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে দোকানে দোকানে ঘোরা। শাড়ি, গয়নার দোকানে, নানা ধরণের বুটিক স্টোরে বেশ খাতির পাওয়া গেল। গয়নাগাটি কেনার ব্যাপারে করালী বরাবরই আপত্তি জানায়। বঙ্গউৎসবের প্রতিনিধিকেও এই সব নামি দামি হীরে-জহরতের দোকানগুলো কি আর ডিস্কাউন্ট দেবে? আমেরিকায় যাওয়ার কন্ট্রাক্ট তো এরা পেয়েও গেছে। তাই বিমুগ্ধ নয়নে শো-কেসের দিকে চেয়ে থাকা বউকে ভাড়া দিয়ে, দামি কাপ-এ দামি চা খেয়ে করালী দোকানের মালিকদের নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল। একটা পানের দোকানে তখন—'না মাঙ্গু সোনা চাঁদি, না মাঙ্গু হীরা মোতি' গানটা বাজছিল।

একটা বুটিক স্টোর বরং দুটো শাড়িতে একটু ডিস্কাউন্ট দিল। তসর সিল্ক আর কপালে মস্ত টিপ পরা মিষ্টি মুখের মহিলা অনুরোধ করলেন, 'অনেক টাকা স্টল ভাড়ার জন্যে দিচ্ছি দাদা। তার ওপর প্লেন ফেয়ার। ওখানে ভালো বিক্রি হবে তো?'

করালী খুব বেশি ভরসা দিল না। এক আধবার বঙ্গউৎসবের শেষবেলায় ভেন্ডারদের হাহুতাশ, রাগারাগি ও স্বচক্ষে দেখেছে। একগাদা ডলার খরচা করে এসে যদি বিক্রিবাটা তেমন না হয়, রাগ হবে না? তবু এই মহিলাকে উৎসাহ দিয়ে করালীর বউ বলে এল, 'দেখবেন প্রচুর বিক্রি হবে। আপনার ডিজাইনগুলো তো ইউনিক। আমাদের চেনাশোনা সবাইকে এখন থেকে বলে দেবো আপনার স্টলে যেতে।'

বুটিক্ মহিলা—"অনেক ধন্যবাদ" বলে হাসিমুখে আরও কিছু "বিজনেস্ কার্ড" ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু চা, কফি দেয়নি বলে করালী সামান্য হতাশ হল।

নেক্সট্ ট্রিপ "ক্ষুদিরাম মোদক মিষ্টান্ন ভাণ্ডার"। কিক্-আপ্ মিটিং-এ করালী শুনেছিল এই প্রথম আমেরিকার বঙ্গউৎসবের বাঙালির মিষ্টির দোকান থাকবে। সন্দেশ, ক্ষীরকদম্বর পাশাপাশি উৎকৃষ্ট রাবড়িও বিক্রি হবে কিনা জানার ছুতো করে ভেন্ডার কমিটির শ্রমিক করালী ক্ষুদিরামের দোকানে ঢুকল। আমেরিকার উৎসবের প্রতিনিধি শুনে একজন লোক খাতির করে টিনের চেয়ারে বসাল। "কি মিষ্টি খাবেন বলুন" জিজ্ঞেস করতে করালী হাত নেড়ে বলল, 'না, না, এখন অবেলায় মিষ্টি-টিষ্টি নয়। তবে রাবড়ি আছে কি? নন্‌বেঙ্গলির মিষ্টার দোকানের ক্ষীর ক্ষীর রাবড়ি তো মুখে দেওয়া যায় না। আপনাদের রাবড়িতে নিশ্চয়ই ব্লটিং পেপারের মতো মোটা মোটা দুধের সর থাকবে? এখন সেটা বরং একটু টেস্ট করতে পারি। বঙ্গউৎসবে মিষ্টি-টিষ্টি রেফ্রিজারেশনের ব্যাপারটাও আমাকেই দেখতে হবে।'

লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'বেলা বারোটার পরে তো দোকানে রাবড়ি আর থাকে না স্যার। তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। লাল দই দেব? সঙ্গে নতুন গুড়ের রাজহাঁস সন্দেশ? হাঁসের পেটে নলের পয়রা গুড়?

করালী পরীক্ষকের মতো মনযোগ দিয়ে দুটোই সাবাড় করল। তারপর চক্ষুলজ্জায় (ক্ষুদিরাম কোম্পানি আর নিজের বউ-এর কাছেও) এক ভাঁড় লাল দই কিনে বাড়ি ফিরল। বউকে পরীক্ষকের ভূমিকাটা ভাঙল না। সে ইদানীং করালীকে এসব সুযোগ নিতে বারণ করছে। একদিন "দুটি পাতা একটি কুড়ি" নামে একটা চা ব্যবসায়ীর শোরুমে গিয়ে ওরা কয়েক কাপ সুগন্ধী চা খেয়েছিল। ওই কোম্পানি বঙ্গউৎসবে চায়ের স্টল দেবে। মালিক করালীকে এক বাক্স "দুটি পাতা একটি কুড়ি" উপহার দেওয়ার সময় বলেছিল, 'দেখবেন মশাই, ওখানে যেন বড় বড় ইলেকট্রিক

টি-পট থাকে।' করালীর মনে হল এ নিশ্চয়ই কোনো চা-বাগানের মালিকের আত্মীয়। করালীকে মিষ্টির দোকানের লোকটার মতো "স্যার" না বলে "মশাই" বলল। কথার ভঙ্গিতে যেন তাচ্ছিল্যের ভাব। ঠিক আছে। ইলেকট্রিক টি-পট জ্বলবে কিনা, ওসব ফালতু তদারকির কাজ করালী দখলদারের জন্যে নয়। "দুটি পাতা একটি কুঁড়ি"র বাক্স নিয়ে রাস্তায় নেমে করালীর বউ ধমকেছিল—'আর এভাবে দোকানে দোকানে ঘুরবে না।'

করালীও আর ঝুঁকি নেবে না। ক্ষুদিরামের মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ওরা ওর দই সন্দেশ খাওয়ার ছবি তুলতে চাইছিল। আমেরিকার মিষ্টির স্টলে বিজ্ঞাপনের মতো রাখবে। করালী গলাভর্তি সন্দেশ নিয়ে সে ছবি তোলা আটকেছে। পাগল! আসল কর্মকর্তারা যদি প্রমাণ পায়, করালী তাদের ছদ্মপরিচয় নিয়ে ক্ষুদিরামের পয়োধি আর রাজহাঁস খেয়েছে, লজ্জার শেষ থাকবে না। ক্ষমতার অপব্যবহারের অপরাধে কমিটি ওর বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী অ্যাকশনও নিতে পারে। কাঁকড়ার জাত বাঙালিকে বিশ্বাস নেই। "সাগরিকা" ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়ে কত কুচুটে বাঙালির সঙ্গে যে লড়তে হয়েছিল। যাক্, সেসব অপ্রিয় স্মৃতি করালী মনে রাখতে চায় না। সামনে বঙ্গউৎসব। তিনটি দিন আনন্দে কাটাবে। করালীরা সময়মতো নিউ জার্সি ফিরে এল।

তারপর আনন্দ পাওয়ার মতো খবরও এল। কলকাতার "দর্পণ" নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক বঙ্গউৎসবের "বন্দীবীর" নাটকে একটা ছোট ভূমিকায় ওকে অভিনয় করতে বলছেন। করালী প্রথমে ভেবেছিল রবিঠাকুরের "বন্দীবীর"। ওকে নিশ্চয়ই বেণী পাকাইয়া শিরে সর্দারজী সাজতে হবে। পরে জানল তা নয়। জেলের কয়েদিদের নিয়ে নাটক। করালী কয়েদি সাজবে। এক টুকরো ডায়ালগ আর একটা গ্রুপ ড্যান্স্। কয়েদিদের নাচ করালী "মুক্তধারা" সিনেমায় দেখেছে। এ নাটকের নাচের গানটাও রবীন্দ্রসঙ্গীত। গরাদের আড়ালে সমবেত নৃত্য "হা রে রে রে রেরে, আমায় ছেড়ে দে রে দে রে।' পরিচালক দৃশ্যটার ভিডিয়ো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

করালী রাজি হয়ে গেল। সারা বছর উইক-এণ্ডের পার্টিতে কত ভাঙ্গড়া নেচেছে। বঙ্গউৎসবে অভিনয়ের জন্যে একটা নাচ আর কি এমন ব্যাপার! করালী ভিডিয়ো দেখে দেখে দিব্যি রিহার্সাল দিচ্ছে।

বঙ্গউৎসব শুরু হওয়ার আগের দিন ওভারসীজ পারফর্মিং আর্টস-এর শ্রমিক হিসেবে করালীরা কয়েকজন মিলে কেনেডি এয়ারপোর্টে আর্টিস্টদের আনতে গেল।

সিনেমা থিয়েটারের দল, নাচ গানের আর্টিস্ট, তাদের মিউজিক হ্যান্ডস, লেখক, ভেন্ডারদের নিয়ে বিশাল বাহিনী পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে। তিনটে বাস ভর্তি করে হোটেলে নিয়ে যেতে হবে। করালী অবশ্য নিজের গাড়ি নিয়ে গেছে। হয়তো ঋতুবর্ণা বাসে উঠতে রাজি হবে না। তখন করালী ওকে গাড়িতে নিয়ে ফিরতে পারবে।

কিন্তু হঠাৎ কি যে ঘটল। একটি কমবয়সি ছেলে লাউঞ্জে বসে পড়ে বমি করতে শুরু করল। পেটের যন্ত্রণায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আবার বমি। ওর সঙ্গীরা অসহায় মুখে ওকে ঘিরে ধরেছে। একজন করালীদের বলল, 'প্লেন থেকেই পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। আপনারা প্লিজ একটু হেলপ্ করুন। এখানে ডাক্তার ডাকা যাবে না?'

জানা গেল ছেলেটির নাম গোরা। মিউজিক হ্যান্ডস হিসেবে ড্রাম বাজাতে এসেছে। করালীর হঠাৎ মনে হল এয়ারপোর্ট অথরিটিকে খবর দেওয়ার আগে ফোনে "নাইন ওয়ান ওয়ান" কল করা দরকার। ছেলেটা যন্ত্রণায় প্রায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এয়ারপোর্ট সিকিওরিটির লোকজন এসে গেছে। তারাও "নাইন ওয়ান ওয়ান্" কল করছে। অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশ আসতে দেরি হল না। স্ট্রেচারে প্যারামেডিক্‌রা যখন গোরাকে অ্যাম্বুলেন্স তুলছে, কলকাতা থেকে আসা পুরো দল প্রায় রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। কয়েকজন ভয়ার্ত মুখে জানতে চাইছিল, ওরা কি গোরার সঙ্গে যেতে পারে। করালী ওই দলের সমীর নামে একজনকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের পেছন পেছন রওনা দিল। বাকি সবাইকে বাসে তুলে নিয়ে অন্য কয়েকজন হোটেলের দিকে রওনা হল। শো মাস্ট গো অন্।

কুইন্স্ এর "জ্যামাইকা হস্‌পিটালের" এমার্জেন্সি রুমে পৌঁছে করালী দেখল গোরাকে নার্সরা দেখাশোনা করছে। একটু পরে ডাক্তার এসে করালীর সঙ্গে কথা বলার পর গোরাকে যন্ত্রণা আর বমি বন্ধ করার ওষুধ দিয়ে পেটের আলট্রা-সাউন্ড করতে পাঠালেন। করালীর পক্ষে এখন হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বঙ্গউৎসব কমিটির চেয়ারপার্সনদের সঙ্গে ফোনে। আলোচনা করে একটু নিশ্চিন্ত হল যে কমিটি থেকে আর্টিস্টদের জন্যে একমাসের হেলথ্ ইন্সিয়োরেন্স করানো হয়েছে। হাসপাতালে থাকার খরচ পাওয়া যাবে। করালী বউকে ফোনে সব পরিস্থিতি জানিয়ে বলল, 'আজ কখন ফিরতে পারব জানি না। কাল থেকে ম্যারিয়াট

রিজার্ভেশন করা আছে। তুমি অন্তত পৌষালীদের সঙ্গে সময়মতো পৌঁছে গিয়ে চেক-ইন্ করে নিও। ওপ্‌নিং সেরিমনিতে আমি থাকতে পারব কিনা জানিনা।'

বউ বলল, 'সেকি? কাল আবার তুমি হসপিট্যালে যাবে?'

করালী বলল, 'এখন কিছু বলতে পারছি না। ছেলেটার কী হয়েছে আগে জানা যাক। এই অবস্থায় ওকে একা ফেলে যাব কী করে?'

আলট্রা-সাউন্ডে গোরার গল্‌-ব্ল্যাডারে স্টোন্ আর রক্ত পরীক্ষায় ইনফেক্‌শন ধরা পড়ল। পরের দিন সকালে সার্জারী হবে। করালী অনেক রাতে বাড়ি ফিরে ভোরবেলা সার্জারীর সময়মতো হাসপাতালে চলে গেল। বঙ্গউৎসবের চেয়ারপার্সনরা জানালেন গোরার জন্যে আর্টিস্টরা খুব উৎকণ্ঠায় রয়েছে। কিন্তু সন্ধেবেলায় ওপ্‌নিং সেরিমনি। তাদের কাউকে হাসপাতালে পাঠানোর সময় থাকবে না। করালী যেন গোরাকে বুঝিয়ে বলে।

করালী অপারেশন রুমের কাছাকাছি ওয়েটিং রুম-এ বসে ভাবছিল গোরার যেন কোনো কম্‌প্লিকেশন না হয়। বিদেশ বিভুঁই-এ একটা ছেলে অসহায়ের মতো হাসপাতালে পড়ে আছে। সার্জারিটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে গোরাকে রিকভারি রুমে দেওয়ার পর ওর আর্টিস্ট বন্ধুদের জানাতে হবে। ওর বন্ধু সমীরকে কালই নিউইয়র্কে পোর্ট অথরিটির বাসে তুলে দিয়েছে। সে গীটার বাজায়। তাকে তো মিউজিসিয়ানদের সঙ্গে বাজাতেই হবে।

গোরার অপারেশন হয়ে যাওয়ার পর সার্জেনের সঙ্গে করালী কথা বলল। রুটিন সার্জারি। যদি না কোনো কম্‌প্লিকেশন দেখা দেয়, গোরাকে হয়তো তিনদিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

জ্ঞান ফেরার পর গোরাকে একটা সেমিপ্রাইভেট রুমে শুইয়ে রেখেছে। তখনও ঘুম ঘুম ভাব রয়েছে। চোখে খুলে কাউকে খোঁজার চেষ্টা করল। করালী ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে হাত ছুঁইয়ে সামান্য হাসল, 'তুমি ভালো হয়ে গেছ। পেট থেকে থলিশুদ্ধু সবকটা স্টোন্ বার করে দিয়েছে। বোধহয় পরশুদিন ছেড়ে দেবে।'

গোরা যেন ঘোরের মধ্যেই বলতে চেষ্টা করল, 'কোথায় যাব?'

করালী আশ্বাস দিল, 'আমাদের বাড়িতে। ফাংশানে তো আর ড্রাম বাজানো হবে না। এখন তোমার কয়েকদিন রেস্ট দরকার। তারপর কলকাতায় ফিরে যাবে।'

গোরা চোখ বন্ধ করে হয়তো কিছু ভাবছে। করালী বলল, 'ব্যথা শুরু হলে

নার্সদের বলবে। ওরা ইন্‌জেকশন দেবে। আমি বিকেল পর্যন্ত আছি। তুমি কেমন থাকো জেনে বাড়ি যাব।'

বঙ্গউৎসবের ওপ্‌নিং সেরিমনিতে করালীর যাওয়া হল না। পরের দিনও নয়। কারণ গোরার জ্বর হচ্ছিল। এ অবস্থায় ওকে ফেলে চলে যেতে ভরসা হল না। এদিকে "বন্দীবীর" নাটকে কয়েদি সেজে করালীর "হারে রে রে রে রে" নাচের জন্যে পরিচালক নাকি ওকে খুঁজছেন। করালী ফোনে বউকে জানিয়ে দিল, 'আমি আপাতত হস্‌পিট্যালে বন্দী। রুগীকে ছেড়ে যেতে পারছি না।'

এক বছর পরে ক্যালিফোর্নিয়ায় বঙ্গসম্মেলন। সেখানে মরালীর দল বিরাট মাতব্বরী পেয়েছে। সম্মেলনের আগে কমিটির মিটিং-এ জানা গেল—নিউইয়র্কের কমিটি মেম্বাররা ভোট দিয়ে ডিস্‌টিঙ্গুইশড্‌ সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্যে একজনের নাম সিলেক্ট করেছে। কালচারাল কন্ট্রিবিউশনের জন্যে নয়। মানবিকতার জন্যে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। নাম—করালী দখলদার, নিউ জার্সি।

মরালীর চোখ কপালে ওঠার উপক্রম। তারই মধ্যে কানে আসছে বিদেশে এসে অসুস্থ হয়ে পড়া একটা ছেলের জন্যে করালীর কর্তব্যবোধ আর মায়ামমতার কথা। রবীন্দ্রভক্তির আতিশয্যে গদগদ মরালী অনুভব করল—এ যেন বাল্মীকি প্রতিভা। এক জীবনে করালী এমন বদলে গেল? অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিতে মরালীই প্রথম করালীকে অভিনন্দন জানাবে।

———

এ জন্মের শেষ ঠিকানা

গেস্টরুমের ক্লসেটটা খুললে এখনো ন্যাপথ্যালিনের হারিয়ে যাওয়া গন্ধ। খাটের পাশে ছোট টেবিলে দু-তিনটে পুরোনো বাংলা ম্যাগাজিন। টিভিতে বাংলা চ্যানেল আর আসে না। ড্রেসারের একধারে আধকৌটো ভ্যাসেলিন। মাথায় মাখার বেবি অয়েলের শিশি। প্রায় চারবছর মা এই ঘরে ছিল। নীলার ক্লীনিং লেডি বারবারা এখনো বলে মামাস রুম।

নীলা ক্লসেট গোছাতে গিয়ে কয়েক বছর আগের কথা ভাবছিল। কলকাতায় দেবুর সংসার থেকে মা এক সময় নিজেই আমেরিকায় চলে আসতে চেয়েছিল। ফোনে বেশি কিছু জানাতে পারত না। লুকিয়ে লুকিয়ে নীলাকে চিঠিতে সংসারের অশান্তির কথা, দেবুর বউ এর দুর্ব্যবহারের কথা লিখত। চিঠিপত্র লেখার রেওয়াজ কবেই চলে গেছে। নীলার ডাকবাক্সে দেশ থেকে আসারও খাম দেখলে বুঝতে পারত, মা আবার তার দুঃখ কষ্টের কথা লিখেছে। এত দূরে থেকে ও কী যে সমাধান করবে ভেবে পেত না। দেবু ছোটবেলা থেকে শান্ত, ভালোমানুষ। অথচ মা অভিযোগ করত বউ-এর ঝগড়া, চিৎকার, মাকে অপমান করা দেখেও দেবু কোনো প্রতিবাদ করে না। উল্টে আড়ালে মাকে বোঝায় মানিয়ে নিয়ে না থাকলে অশান্তি, আরও বাড়বে। নীলা বোঝে শাশুড়ি, বউ-এর কর্তৃত্বের লড়াই এ মা ক্রমশ হার মেনে গেছে। নীলার চেয়ে দেবু প্রায় আট বছরের ছোট। ফোনে ওকে প্রশ্ন করলে ইদানীং ও যেন মাকেই অশান্তির জন্যে খানিকটা দায়ী করত।

মা একবার রাগ করে ছোটমামার কাছে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আবার সেই ফিরতেই হল। পরে মা দুঃখ করে লিখেছিল—নিজের ঘরবাড়ি, টাকাপয়সা না থাকলে যা হয়। নইলে এত অপমান সহ্য করে ছেলের সংসারে পড়ে থাকতাম না।

এমন যখন পরিস্থিতি, নীল রূপংকরের সঙ্গে আলোচনা করে মাকে স্ট্যাম্‌ফোর্ডে নিজেদের কাছে নিয়ে আসাই ঠিক করল। ততোদিনে দেবু গল্‌ফ গার্ডেনে ফ্ল্যাটে বুক করছে। মাস ছয়েকের মধ্যে পুরোনো ভাড়াবাড়ি ছেড়ে চলে

যাবে। দেবুর বউ মৌমিতা স্পষ্টই বলল ওদের ছোট ফ্ল্যাটে মা-র জন্যে কোনো ঘর থাকবে না। বারাসাতে কোন ওল্ড-এজ হোমের খোঁজ পেয়েছে। বাড়ি ছাড়ার আগে মাকে সেখানে রেখে আসবে। দেবুর পক্ষে চিরকাল মার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। নীলা বলেছিল, 'আমরাও চাই না মা আর তোমাদের সঙ্গে থাক। বাবার রেখে যাওয়া টাকাপয়সা, মা-র উইডো পেন্‌শন, মামার বাড়ি বিক্রির টাকার অংশ, সবই তো তোমাদের সংসারে ঢুকে যাচ্ছে। আমি মা-র জন্যে এত বছরে কম ডলার পাঠাইনি। দেবু কোনোদিন মার কোনো ফাইন্যান্‌শিয়াল রেস্‌পন্‌সিবিলিটি নেয়নি।'

মৌমিতা চিৎকার করল, 'তা আপনি এতদিন মাকে নিয়ে যাননি কেন? একবার বেড়াতে নিয়ে গিয়ে তো দু'মাসের মাথায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।'

নীলা ওর স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ফোন রাখার আগে বলেছিল, 'আমি কলকাতায় যাচ্ছি। হয় মাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরব। নয়তো মার ভিসা না পাওয়া পর্যন্ত ছোটমামার বাড়িতে রেখে আসব। দেবুকে বলবে আমাকে ফোন করতে।'

মাসখানেকের মধ্যে নীলা কলকাতায় গেল। দেবুর কাছে থাকলে তিক্ততা আরও বাড়বে বুঝে পুরো সময়টা শ্বশুরবাড়িতে থেকে মাকে ভিজিটর্স ভিসায় সঙ্গে নিয়ে এল।

সেই যে মা স্ট্যামফোর্ডে এসেছিল, তখন মাস চারেক ছিল। তারপর দেশে গিয়ে বেনারসে, ছোটমামার বাড়ি ভবানীপুরে আর জ্যাঠামশাই-এর পাইকপাড়ার বাড়িতে ঘুরে ফিরে কয়েকমাস করে থাকতে হয়েছিল। নীলা ইমিগ্রেশন ল-ইয়ার এর সাহায্য নিয়ে মাকে তারপরেই পাকাপাকিভাবে নিয়ে এসেছিল। মা চলে আসার পর নীলা রূপংকরের সঙ্গে দুবার দেশে গিয়েছিল। মা সে সময় বস্টনে রূপংকরের দিদির বাড়িতে ছিল। প্রথমবার কলকাতায় গিয়ে নীলা দেবুর সঙ্গে দেখা করেনি। দ্বিতীয়বার কোথা থেকে খবর পেয়ে দেবু নিজেই দেখা করতে এলো। ও বারবার বলাতে নীলা একদিন ওদের গলফ্ গার্ডেনের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। মৌমিতার সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল না। ওর মা সেখানে ছিলেন। তাই ভদ্রতা বজায় রেখে আর দেবুর ছেলেমেয়ে অপু, দীপুর সঙ্গে দু-চার কথা বলে নীলা উঠে পড়েছিল। মা-র নাতি-নাতনিরা একবারও দিদার কথা জিজ্ঞেস করল না। হয়তো ইচ্ছে থাকলেও ওদের মা-র সামনে কিছু জানতে চাওয়ার সাহস নেই। অথচ ওদের জন্যে মা নীলাকে দিয়ে কত জামাকাপড়, সোয়েটার, দু-বাক্স চকোলেট কিনে পাঠাল। এখনো

বাড়িতে কেক, চকোলেট আনলে মা-র মনে হয় অপু, দীপু থাকলে কত খুশি হয়ে খেত।

স্ট্যামফোর্ডে ফিরে আসার পর মা জিজ্ঞেস করেছিল, 'দেবুর চেহারা কেমন দেখলি? শরীর ভালো আছে তো? আমার কথা কিছু বলল?'

'দেখে তো মনে হল ভালোই আছে। বউ-ই বরং নিজের শরীর খারাপের সাতকাহন শোনানোর চেষ্টা করছিল। দেবু তোমার কথা আগেই জিজ্ঞেস করেছে। বলেছি তুমি ভালো আছো।'

'হ্যাঁরে, ওদের বাড়িটা ঠিক কোথায়? সত্যিই কি খুব ছোট ফ্ল্যাট?'

আসলে মা বোধহয় জানতে চাইছিল ওখানে মাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জায়গার অভাবটাই সত্যি ছিল কিনা। নীলা বলতে পারেনি দেবুর তিন বেডরুমের ফ্ল্যাট। বলেছিল, 'ওদিকটা তুমি চিনবে না। তিনতলার ওপরে খাঁচার মতো গ্রিল দিয়ে ঘেরা ফ্ল্যাট। লিফ্‌ট নেই। তুমি ওখানে ঘরের ভেতর বন্দি হয়ে থাকতে।'

মা হঠাৎ বলে উঠল, 'এখানেও তো তাই। কোথায় আর বেরোই বল্?'

নীলা কেমন দমে গেল। মা যেন অচেনা গলায় কথা বলছে। যে মানুষ এসে থেকে ঘুরেফিরে বলত আমার এত সুখ সহ্য হলো হয়, তার কথাবার্তার মধ্যে ইদানীং যেন মৃদু অনুযোগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই যে মাকে কখনো রান্নাবান্না করতে হয় না, ওরা "মন্দিরাস্ কিচেন" থেকে সারা সপ্তাহের রান্না ভেলিভারি নেয়, মা-র তাতেও আপত্তি। খেতে বসে মন্তব্য করে, 'ব্যবসা করছে বটে তোদের মন্দিরা। এটা মোচার ঘণ্ট হয়েছে? কেন যে পয়সা নষ্ট করিস। ছুটির দিনে কটা পদ রেঁধে রাখতে পারিস না? আমি তো এসে থেকে একটু রান্নাবান্না করতে চেয়েছিলাম। তোরা রাজি হলি না।'

রূপংকর উত্তর দিয়েছিল, 'আমাদের এটা কন্‌ভিনিয়েন্ট মনে হয়। নীলা সারা উইক্ অফিস করে। উইক্ এন্ডে বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যাই। ক্লাবের মিটিং, ফাংশান, রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত থাকি। রান্না মানে তো সুপারমার্কেট, মাছের দোকান, ইন্ডিয়ান গ্রোসারি, হালাল মিট। পর্বটা কিন্তু কম নয়। আপনিই বা কষ্ট করবেন কেন? হাঁটুর ব্যথা নিয়ে রেস্ট করুন।'

মা বলেছিল, 'কত আর রেস্ট করব? সারাদিনে তো সময় কাটে না। ছুটির দিনে তোমরা পার্টিতে চলে যাও। বাইরে গিয়ে বসলে কাকপক্ষীর মুখ দেখি না। এদেশে বুড়ো মানুষদের বড্ড একা থাকতে হয়।'

খাবার টেবিলে হঠাৎই গল্প-টল্প থেমে গেল। নীলা পরে টেবিল পরিষ্কার করতে করতে বলল, 'এখানে সিনিয়র সিটিজেন সেন্টার আছে। দিনের বেলা গাড়ির রাইড এর ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু ওখানে বয়স্ক অ্যামেরিকানরা আসে। হয়তো কয়েকজন ইন্ডিয়ান থাকতে পারে। তুমিও মাঝে মাঝে যেতে পারো।'

'নাঃ। বাঙালিদের কিছু থাকলে যেতাম।'

'কানেটিকাটে এত বাঙালি সিনিয়র সিটিজেন কোথায়, যে তাদের আলাদা সেন্টার থাকবে।' গুজরাটিদের এরকম কিছু খুলেছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি। তুমি হিন্দি তো বুঝতে পারো?'

মা মাথা নাড়ল, 'তা পারি। তবে মন্দির-টন্দির হলে ভালো হত। তোদের ধারেকাছে রামকৃষ্ণ মিশন নেই?'

নীলা উত্তর দিল, 'না। মিশনের দুটো সেন্টারই নিউইয়র্কে। তাছাড়া দুপুরে বন্ধ থাকে। সিনিয়র সিটিজেন সেন্টারের কিন্তু নানারকম অ্যাকটিভিটি আছে। যোগা শেখায়। মেডিটেশন এর ক্লাস হয়। হালকা একসারসাইজ, হাতের কাজ, নানা ধরণের খেলা যাতে ব্রেইন-এর স্টিমুলেশন হয়, মিউজিক সেশন...'

মা থামিয়ে দিয়েছিল, 'ওই মিউজিক শিখে আর কী হবে? আমি যে গান গাইতে পারতাম, কত প্রাইজ, মেডেল পেয়েছিলাম, সেসব এখন গল্প কথা হয়ে গেছে।'

'তুমি তো ভালোই গাইতে মা। এখন এত সময় পাও। মাঝে মাঝে গান নিয়ে বসতে পারো। স্টাডিরুমের শেল্‌ফে গীতবিতান আছে।'

'কিন্তু হারমোনিয়াম কোথায় পাব? শুধু গলায় কি রেওয়াজ হয়? রাগপ্রধান, ভজন-টজন কত কিই তো গাইতাম।'

হারমোনিয়ামের অভাবে নয়। শ্রোতার অভাবে মা-র গান গাওয়া আর হয়নি। রূপংকরের ইচ্ছে ছিল ওদের ক্লাবের 'কবিজয়ন্তী'র প্রোগ্রাম মাকে একবার গাইতে বসিয়ে দেবে। মা নিজেই ভরসা পেলো না। বলল, 'অনেকদিন চর্চা নেই। দম কমে গেছে। ক্লাবের প্রেসিডেন্টের শাশুড়ি বলে স্টেজে উঠে লোক হাসাব নাকি? তার চেয়ে তোদের ঘরোয়া আসরে বরং একদিন গাইব।'

একদিন গেয়েও ছিল মা। নীলাদের বাড়িতে শনিবারের নেমন্তন্ন আসা বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে মা শুনিয়েছিল—যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু। তারপর নিজে থেকেই গাইল—এ পরবাসে রবে কে?

মার গলায় বিষণ্ণতার সুর। গানের কথা যেন মা-র প্রবাসজীবনে একাকিত্বের বেদনার প্রতিধ্বনি হয়ে নীলার কানে বেজেছিল। ও অনুভব করছিল আজন্মের পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে মা ক্রমশ বড় একা হয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিন দেবুকে দেখতে পায় না। ওর ওপর মার রাগ, অভিমান ধীরে ধীরে ধুয়ে মুছে গেছে। এখানে নিজস্ব সমাজ নেই। আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী নেই। শুধুমাত্র নীলার কাছে থেকে মা-র প্রতিদিনের নিঃসঙ্গতা ঘোচে না। মা-র কাছে এদেশ আজও বিজন বিভূঁই।

নীলা ভেবেছিল কয়েকমাসের জন্যে মাকে দেশে পাঠিয়ে দিলে হয়। হয়তো একবার ঘুরে এলে মনটা ভালো থাকবে। কিন্তু মা থাকবে কোথায়? দেবুর বাড়িতে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। আত্মীয়স্বজন থাকলেও তাদের কাছে বেশিদিনের জন্যে রাখা যায় না। ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার, গ্যাস, অম্বল, হাঁটুর ব্যথা, দাঁতের যন্ত্রণা এখানে মা-র যখন যা উপসর্গ হয়, নীলা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। সময়মতো চেক-আপ করায়। দেশে কার ভরসায় সেসব দায়িত্ব দিয়ে আসবে? রূপংকর একদিন বলল, 'মাকে জিজ্ঞেস করো সত্যিই কি উনি কয়েকমাস দেশে থাকতে চান? তাহলে পুনেয় আমার বিজনেস্ টিপের সময় ওঁকে কলকাতায় পৌঁছে দিতে পারি। কিন্তু অতদিন থাকবেন কোথায়?

'সেটাই সমস্যা। আগে মাকে জিজ্ঞেস করে দেখি।' মা সব শুনে বেশ খুশি, 'যেতে তো খুব ইচ্ছে করে। বছরখানেক থেকে এলে পারি। বেনারসে তোর মেজমাসির কাছে, ভবানীপুরে বিশুর ওখানে...'

নীলা বিরক্ত হল—'অতদিন কি করে থাকবে? তোমার বয়স হচ্ছে। শরীর ভালো থাকে না। দেশে অসুস্থ হয়ে পড়লে তখন তো আমাকেই ছুটতে হবে। এজন্যেই তোমাকে একা পাঠানোর ডিসশন নিতে পারি না।'

মার মুখ গম্ভীর হল, 'তাহলে আর মিছিমিছি যাওয়ার কথা তুলছিস কেন?'

নীলা বোঝাল, 'তার চেয়ে আমাদের সঙ্গে নভেম্বরে ঘুরে আসবে চলো। যদি মাসখানেক বেশি থাকতে চাও, ছোটমামাকে বলে দেখব।'

মা অবুঝের মতো মাথা নাড়ল, 'আমি ওই শীতের মধ্যে ফিরে আসব না। ওই সময়টা এখানে আমার বড় কষ্ট হয়। সারাদিন বাড়ির মধ্যে দমবন্ধ হয়ে আসে। কেমন যেন পাগল পাগল লাগে রে।' নীলা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আর এখানে ফিরতে চাইছ না? কিন্তু দেশে তোমাকে দেখবে কে? সব জেনে বুঝেই তো

এসেছিলো মা।'

মা-র গলার স্বর কান্নার বুঁজে এল—'জানি, কত ব্যবস্থা করে তোরা আমাকে নিয়ে এলি। খরচের শেষ নেই। দুজনে কত দেখাশোনা করছিস। তবু, এদেশে থাকতে আর ভালো লাগে না রে।'

আকস্মিক আঘাতে স্তব্ধ নীলা যেন সোনার খাঁচায় বন্দি এক অসহায় পাখির আর্তস্বর শুনতে পেল। কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকার পর মাকে জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করল, 'আমি বুঝতে পারি মা। এখানে তোমার কোনো জগত নেই। আমার কোনো ছেলেমেয়েও নেই যে, তাদের নিয়ে তোমার সময় কাটবে।'

'ও কথা বলছিস কেন? কলকাতার বাড়িতে কি অপু, দীপু ছিল না? তবু কি থাকতে পারলাম? আসলে সেসব কথা নয় রে নীলা। আমাদের এই বয়সে একটু সমবয়সি মানুষদের সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে। ওই দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলা। তবে, সত্যি তো। দেশে থাকব কোথায়? আত্মীয় স্বজনরা ঘরবাড়ি বিক্রি করে ফ্ল্যাটে উঠে যাচ্ছে। সেখানে বাড়িতে লোকের জায়গা হয় না। ভাইবোন বলতে আমরা বেঁচে আছেই বা কজন? কোথায় আর যাব।'

নীলা দৃঢ়স্বরে বলল, 'একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে মা। ক'টা মাস অপেক্ষা করো। আমি নিজে গিয়ে তোমায় ভালো জায়গায় রেখে আসব। তাহলে আমারও আর চিন্তা থাকবে না।'

সেদিনই রূপংকর নিউইয়র্কে ডঃ অরিন্দম মিত্রকে ফোন করে মার কথা জানাল। ডঃ মিত্র কলকাতায় মুকুন্দপুরের কাছে তিনবছর হল "এল্‌ডার কেয়ার" নামে সিনিয়র সিটিজেন হোম তৈরি করেছেন। প্রায় আমেরিকার স্টাইলে তৈরি বিশাল বাগান ঘেরা তিনতলা বাড়িতে রিটায়ার্ড লোকেদের থাকার বন্দোবস্ত। কলকাতা, বম্বে, দিল্লির কিছু অবসরপ্রাপ্ত উচ্চবিত্ত বাঙালিরা ছাড়াও ওখানে আমেরিকা-কানাডার কয়েকজন বয়স্ক বাঙালিও রয়েছেন। রূপংকরের ডঃ মিত্রর কাছ থেকে "এল্‌ডার কেয়ার"-এর খরচপত্র, বোর্ডারদের ঘর, খাওয়াদাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা। এন্‌টারটেনমেন্টের কথা সবকিছু জেনে নিল। আরও খবর পেল, নিউইয়র্ক, বস্টন, অ্যাটল্যান্টায় থাকা চেনাশোনা বাঙালিদের কয়েকজনের বাবা, মা ওই ওল্ড-এজ হোমে আছেন।

নীলা মা-র সঙ্গে আলোচনা করে ডঃ মিত্রর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেলল। কিন্তু জায়গাটা না দেখেই ওরা মা-র সিঙ্গল রুম উইথ অ্যাট্যাচড্ বাথ অ্যান্ড

ব্যালকনি বুক করার জন্যে অ্যাডভ্যান্স দিতে চাইছে জেনে ডঃ মিত্র বারণ করলেন। ঠিক হল, ডিসেম্বরে গিয়ে পেমেন্ট করলেই হবে।

বস্টনে রূপংকরের দিদিকে ফোন করে জানা গেল ওখানে যাদের মা মুকুন্দপুরের ওই হোমে থাকেন, তারা তো বলছে ব্যবস্থা বেশ ভালো। বাইপাসের ধারে তিনটে হাসপাতালের সঙ্গে হোমের অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা আছে। হোমের নিজস্ব ডাক্তার, নার্স আছে। বোর্ডারদের নিয়মিত মেডিকেল চেক-আপ হয়। খবরগুলো পেয়ে মা-র জন্যে নীলা কিছুটা নিশ্চিন্ত হল।

মা একদিন জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে, দেবুকে জানাবি না?'

নীলা হাসল, 'ও, তোমাকে বলা হয়নি। দেবুকে সব জানানোর পরে জিজ্ঞেস করলাম ও মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে যেতে পারবে কিনা। ইমিডিয়েট ফ্যামিলি হিসেবে ওর তো একটা দায়িত্ব থাকা উচিত। তবে খরচপত্রের জন্যে ওকে কিছু ভাবতে হবে না। সেরকম অসুস্থ হলে, হাসপাতালে গেলে, আবার তুমি ওই হোমেই ফিরে যাবে। আমারা থাকবে। নার্স দেখবে। তোমার চিকিৎসার জন্যেও দেবুকে চিন্তা করতে হবে না।'

'দেবু শুনে কি বলল?'

'ও এত কথা শুনতেই চাইছিল না। বলছিল আমি তো আছি। তুই দূরে থেকে মা-র জন্যে বেশি টেনশন করবি না।'

আজ প্রায় দেড় বছর হল মা মুকুন্দপুরে "এল্‌ডার কেয়ার"-এ আছে। মাঝে একটু অসুস্থ হলেও মোটামুটি ভালোই আছে। মাঝে মাঝে ফোনে জানতে চায়, 'তোরা আবার কবে আসবি?'

গতকাল মাদার্স-ডে তে নীলা ফোন করেছিল। মা বলল, 'হারমোনিয়ামের আওয়াজে ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না।'

'হারমোনিয়ম আবার কে বাজাচ্ছে?'

বাজনা বন্ধ হতে মা উত্তর দিল, 'কাল এখানে রবীন্দ্রজয়ন্তী। তার ফাংশানের জন্যে নীচের হলঘরে রিহার্সালে এসেছি। আমাকেও বুড়ো বয়সে গাইতে হবে।'

'ভালো তো মা। এইসব নিয়ে আনন্দে থাকো।'

হারমোনিয়মের আওয়াজে আবার ওদের কথা চাপা পড়ে গেল। নীলা ফোন রেখে দিল। মাকে আর মাদার্স-ডের প্রণাম জানানো হল না। বারণ করলেও গিফ্‌ট কিনে আনত। মা-র সঙ্গে নীলার সেই ছোট ছোট মুহূর্তেরা স্মৃতি মা-র হয়তো আর মনেও থাকবে না।

তিনকন্যা ও পাখির পালক

লীনা, সঞ্জয়দের সঙ্গে আমাদের প্রথম আলাপ ক্লাবের পিকনিক্ এ। ওদের দুই মেয়ের ছোটজন তখন আমার মেয়ে রিমির বয়সি। এরপর আরও কয়েকবার দেখা হল। দুর্গাপুজোর ফাংশনে রিমির সঙ্গে ওদের দুই মেয়ে কণিকা, মণিকাও হাতে নাড়ু পাকিয়ে পাকিয়ে "পাগলা হাওয়া বাদল দিনে" নাচল। বিজয়া দশমীর বিকেলে এক খাবলা সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে লীনা বলল, ওদের বাড়িতে আমাদের একদিন ডাকবে।

সে সময় নতুন বাঙালিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলে তাদেরও এক বয়সি ছেলেমেয়ে থাকলে মেলামেশায় আগ্রহ হত। হয়ত রিমির সঙ্গে মণিকা, কণিকার প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্ভাবনায় ওদের বাড়িতে খুব শিগ্‌গিরই নেমন্তন্ন পেলাম।

আমাদের বাড়ি থেকে আধঘণ্টার পথ। সন্ধ্যেবেলায় পৌঁছে দেখি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট জয়ন্তদা, মীনাদি, অরিন্দম, বিজয়া, শ্যামল, বন্দনারাও এসেছে। একটু পরে কণিকা, মণিকা এসে রিমি আর বিজয়ার মেয়ে ঋতুকে ডেকে নিয়ে গেল। সঞ্জয় সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। লীনার দেখা নেই। কিন্তু ওর চাঁছাছোলা সুকণ্ঠের আওয়াজ পাচ্ছি। হঠাৎ কানে এলো—'ছিঃ আবার দুষ্টুমি করে। মাসিরা দেখলে কী বলবে? অ্যা...ই...ই, লাফাবি না।' আমি সন্ত্রস্ত হলাম। লীনা কাকে বকছে? রিমির তো লোকের বাড়ি গিয়ে লাফালাফি করার মতো বয়স নয়। নাকি দলে পড়ে হুড়োহুড়ি করছে?

আবার লীনার ধমক, 'অ্যাই, স্টপ!'

আর বসে না থেকে আমি, বিজয়া দুজনেই কিচেনের দিকে যাচ্ছি দেখে সঞ্জয় ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আপনারা বসুন। লীনাকে ডাকছি।'

তার আগেই লীনা ঘরে ঢুকল, 'সরি, তোমাদের হ্যালো বলতেই আসতে পারছিলাম না। চারটেতে মিলে এত অসভ্যতা করছে!'

বিজয়া ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কোথায়? কী করছে বলুন তো?'

আমারও রাগ হচ্ছে। বাড়িতে ডেকে অন্যের বাচ্ছাদের এত ধমক দেয় কেউ? শাসন করারও তো একটা ভাষা আছে। তাছাড়া এ বাড়িতে ঢোকা মাত্রই মেয়েরা কি এমন অকাজ করল, তাও তো বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ কলকল করতে করতে ছোট মেয়েগুলো চলে এল। কণিকা আর মণিকার কাঁধে বসে আছে সবুজ রং-এর দুটো প্যারাকিট। লীনার পায়ের কাছে উড়ে এসে বসল একটা নীলপাখি। চার নম্বর নীল বদ্‌রিকা সারা ঘরে চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে। লীনা বলল, 'সবুজ মোটাটা হচ্ছে আশুতোষ। ওর বউ শ্যামলী। নীলটার নাম গগন। বউটা নীলা। আজ দুপুর থেকে চারটেতে মিলে কি বদমাইশি করছে! দেব এবার খাঁচায় পুরে।'

পাখির কলকাকলি ছাপিয়ে বাচ্ছাদের উল্লাস, লীনার বক্তৃতা ইত্যাদি সব মিলিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম "অসভ্য" তাহলে লাগাতার উড্ডীয়মান মোটা আশুতোষ, শ্যামলী, গগন আর নীলা।

সঞ্জয় অধৈর্য্য হয়ে বললেন, "আরে, এগুলোকে খাঁচায় রাখোনি কেন? এবার সবাইকে স্ন্যাক্‌স্ দেবে তো। আপনারা বলুন তো কাকে কি ড্রিংক্ দেব?'

লীনার ডাকাডাকিতে তার মাথায় আর দু-কাঁধে চড়ে পাখিগুলো ভেতরে চলে গেল। এক গুজরাটি মহিলার সঙ্গে স্ন্যাক্‌স্ এর ট্রে নিয়ে লীনা ফিরে এলো। এতক্ষণ পাখির কাণ্ডকারখানা দেখে জয়ন্তদা মন্তব্য করলেন, 'তাই বলো। লীনার ধমকধামক শুনে বুঝতেই পারিনি ও পাখিদের বকছে। এই লাভ্‌বার্ডগুলো আবার কথা বোঝে নাকি? ময়না, কাকাতুয়া তো নয়। অল্‌মোস্ট চড়াই পাখির সাইজ।'

লীনা বোঝাতে চেষ্টা করল, 'চড়ুই পাখি পুষে তো আর কেউ ট্রেনিং দেয় না। দিলে হয়তো বোঝা যেত। প্যারাকিট্ এর যে কি বুদ্ধি আপনি ভাবতেই পারবেন না।'

লীনার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে মীনাদি বললেন, 'আর জেনে দরকার নেই। ছোটবেলায় হুজুগ করে ছেলেমেয়েরা সব বেড়াল, কুকুর পুষল। এখন যে যার কলেজে পালিয়েছে। আমরা মরছি বুড়ো কুকুর আর ধুম্‌সী বেড়ালের সেবা করে।'

সবাই গল্পটল্প করছি। বাচ্ছারা এসে খবর দিতে লাগল পাখিগুলো নাকি নানারকম ট্রিক্‌স জানে। মণিকা হেসে হেসে বলছিল—বিকেলে কিচেন্ সিংকে চান

করার পারে আশুতোষ আর গগন কাউন্টার টপ্ এ রাখা স্যালাড এর প্লেটের পাশে বসে ডানা ঝেড়ে ঝেড়ে জল ছেটাচ্ছিল। মা-র কাছে ধমক খেয়েছে। মা আশুতোষকে চপ্‌স্টিক দিয়ে দুবার মেরেছে।

কি কাণ্ড! বিজয়া নীচু গলায় পরামর্শ দিল, 'স্যালাড একদম বাদ। বাচ্ছাদের খেতে ডাকলে খেয়াল রাখতে হবে।'

আবার কণিকা, মণিকার দল এসে হাজির। ওরা পাখিদের কেরামতি দেখার জন্যে সবাইকে কিচেনে যেতে বলছে। সঞ্জয় বললেন, 'আজ নয়। অন্যদিন হবে। এখন ওদের গুড নাইট্ বলে দাও।'

লীনা হাসল, 'ঠিক আছে। তোমরা এবার ডিনার করবে চলো। তখন ওরা ট্রিক্‌স্ দেখাবে।'

বাচ্ছাদের সঙ্গে আমরাও রান্নাঘরে গেলাম। একে তো ওদের স্যালাড নিতে দেব না। তাছাড়া পাখিদের খেলাও দেখা হবে। কে জানে কি খেল্ দেখাবে। সার্কাসে কাকাতুয়া, ম্যাকাও-এর কেরামতি দেখেছি। আজ দেখব বদ্‌রি পাখীর কারদানি।

বিরাট রান্নাঘরে স্লাইডিং দরজার কাছে সবুজ আর নীল রং-এর দুটো খাঁচা ঝুলছে। নীল খাঁচায় গগন ছোট্ট দোলনায় দোদুল্যমান। নীলা ঝিমোচ্ছে। অন্য খাঁচায় আশুতোষ আর শ্যামলী প্রচণ্ড ঝটাপটি লাগিয়েছে। মাঝে মাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ ঘোরালো করে আমাদের দেখছে।

রিমিরা কিচেন টেবিলে বসে খাচ্ছে। যথারীতি স্যালাড নিতে দেওয়া হয়নি। বিজয়ার ফিশফিশ সতর্কবাণী শুনে আমরাও আর ঘাসপাতার দিকে যাইনি। প্লেট হাতে ডাইনিং রুমের দিকে যাচ্ছি, লীনা বলল, 'এবার মজা দ্যাখো।'

ও পাশের প্যান্‌ট্রির দরজা খোলার সময় ক্যাঁচ করে শব্দ হল। তক্ষুনি চারটে পাখি চিৎকার করে উঠল, 'ক্যাঁচ'। লীনা ঘন ঘন তিনবার দরজাটা খোলা বন্ধ করল। পাখিরা সমঃস্বরে শব্দ করল ক্যাঁচ ক্যাঁচ। ক্যাঁচ ক্যাঁচ। ক্যাঁচ ক্যাঁচ। ক্রমাগত এই যুগলবন্দী চলছে শুনে সঞ্জয় ওদের থামালেন। কিন্তু লীনাকে আজ থামায় কে রে? হাতে দুটো কাঠি নিয়ে এসে খাঁচা দুটোর সামনে ফুলঝুরির মতো ঘোরাতে লাগল। যতক্ষণ ফুলঝুরি ঘুরছে, আশুতোষ অ্যান্ড পার্টি যে যার দোলনায় বসে ঘন ঘন দুলে যাচ্ছে। যেই ফুলঝুরি ঘোরানো থেমে গেল, ওরা দোলনা থেকে ডিগবাজি খেয়ে খাঁচার মেঝেতে পাতা স্যান্ড পেপারের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাদের হাততালি

শুনে লীনা তিনবার সেই ঝুলনযাত্রা দেখিয়ে ক্ষান্ত হল। সত্যি!! অবাক লাগছিল। জয়ন্তদা স্বীকার করলেন লীনার মতো ট্রেনার পেলে চড়াইপাখিও জেমিনি সার্কাসে চান্স পেয়ে যেত।

রিমির সঙ্গে কণিকা মণিকার বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হতে হতে সেও তার সাতবছরের জন্মদিনে এক জোড়া পাখি চাইল। কমলা খাঁচা দুলিয়ে দুটো সবুজ লাভবার্ড কিনে আনলাম। সারাদিন কিচিরমিচির। বাটি থেকে দানা খায়। জল ছেটায়। তারা বড়কর্ম, ছোটকর্ম যাই করুক, খাঁচা পরিস্কার করা, দানাপানি দেওয়া সব দায় আমার। ঠোকর খাওয়ার ভয়ে রিমি একদিন রান্নাঘরের দস্তানা আভন্-মিট্ পরে খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে খাবার দিতে গিয়েছিল। ওই বিকট বস্তুটা দেখে পাখি দুটো এক কোণে সিঁটিয়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল। সেই থেকে রিমি আর ওদের দেখভাল করে না। শুধু ট্রেনিং দেয়। ফ্যামিলি-রুমে টিভির সামনে খাঁচা টেনে এনে কাঠঠোকরাদের কার্টুন "উডি উডপেকার" দেখায়। কিন্তু ওর দুই পাখি চার্লি আর শার্লির কোনো শিক্ষা হয় না। রিমির দুঃখ আমি ওদের খাঁচা থেকে বেরিয়ে সারা বাড়ি চরতে দিই না। খাঁচার সামনে চপস্টিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরতি নৃত্য করি না। ওরা শুধু কিচিরমিচির করা ছাড়া কিছুই শিখবে না।

রিমি ভায়লিন শেখে। খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকদিন ছড় টেনে টেনে বেহালা বাজাল। তাতেও পাখি দুটো নির্বিকার। ক্যাঁ, কোঁ, কোনো আওয়াজেরই নকল করল না। আমাদের কোনো দরজাও ক্যাঁচ্ করে খোলে না। মিউজিক্যাল এন্‌ভায়রনমেন্টের অভাবে, উপযুক্ত ট্রেনারের অভাবে চার্লি আর শার্লি চড়াইপাখির স্তরেই রয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন লীনার ফোন। ওরা কয়েকদিনের ছুটিতে ফ্লোরিডা যাচ্ছে। পাখি চারটেকে যদি আমাদের বাড়িতে রেখে যায়। জিজ্ঞেস করলাম ওর সেই পাশের বাড়ির মহিলার কী হল? তিনি নাকি ওদের জন্যে বার্ডসিটিং করেন। লীনা রেগে উঠল, 'আর বোলো না! ক্যাথীর বেড়াল সোহাগী শাশুড়ি ঠিক এইসময় ওদের কাছে বেড়াতে আসছে। সঙ্গে বেড়ালটাও জুটবে। ক্যাথী পাখিদের রাখতে চাইছে না।'

আসলে আমিও তো চাইছি না। চারটে পাখির বাড়তি ঝামেলা কে নেবে? তাই পরামর্শ দিলাম, 'খাঁচাগুলো তোমাদের বাড়িতেই থাক্ না। উনি রোজ এসে

খাবার আর জল দিয়ে যাবেন। আমি তো পাশের বাড়ির লোকেরা ছুটিতে গেলে ওদের অ্যাকুরিয়ামের মাছগুলোর দেখাশোনা করি। বাড়িতে তো আনিনা।'

লীনা ক্ষুণ্ণ হল, 'পাখি আর মাছ এক হল? পাখি পুষেছ, বুঝতে পারো না ওরা মানুষের সঙ্গ ছাড়া বাঁচে? রিমি যখন স্কুল থেকে ফেরে, পাখিদুটো আনন্দে লাফালাফি করে না?'

কথাটা সত্যি। চার্লি, শার্লি গানবাজনা না শিখুক, আমরা বাইরে থেকে বাড়ি ফিরলে একটু ক্যাচর ম্যাচর করে কিন্তু। মানে, অনুরণন হয় আর কী? লীনার মুখের ওপর আর না বলা গেল না। ফ্লোরিডা যাওয়ার আগের দিন ওর সঙ্গে মণিকা, কণিকা পাখিশুদ্ধু জোড়া খাঁচা নিয়ে এল। সঙ্গে প্রভূত সরঞ্জাম। তার মধ্যে একটা দম দেওয়া ঘড়ি-বাজনা। আর একটা উইন্ড-চাইম্। ওই বাজনা দুটো নাকি পাখিদের রাতে ঘুমপাড়ানোর জন্যে লাগবে।

আমি তো হতভম্ব! রিমি ততোক্ষণে কণিকা, মণিকার কাছে ঘুমপাড়ানোর ট্রেনিং নিচ্ছে। রোজ রাতে ওদের খাঁচার ওপর তোয়ালে চাপা দিয়ে, ঘর অন্ধকার করে প্রথমে ঘড়ি-বাজনায় দম দিয়ে কিছুক্ষণ জলতরঙ্গ বাজাতে হবে, তারপর উইন্ড-চাইম্‌টা ঝুলন্ত অবস্থায় টুং টাং বাজাতে থাকবে। মাঝে মাঝে এসে সেটায় দোলা দিয়ে যাব। ঘরে আর কোনো কথাবার্তা বা শব্দ নয়। বাজনা শুনতে শুনতে আশুতোষ, শ্যামলী, গগন, নীলা ঘুমের দেশে চলে যাবে।

সে এক অভিজ্ঞতা। ফ্যামিলি রুমে তিনটে খাঁচায় ছ'টা পাখি সারাক্ষণ তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছে। আশুতোষ রাগী চোখে শার্লি চার্লিদের কর্কশ আওয়াজে ধমক দিচ্ছে। উড়ে এসে জুড়ে বসা আর কাকে বলে? ওদের খাঁচা পরিষ্কার করার ভার আমার বর দীপকের ওপর চাপিয়েছি। ওই ঝগড়ুটে পাখির খাঁচায় কে হাত ঢোকাবে? শার্লি, চার্লি আপন মনে ওদের লক্ষ্য করে। গগন দোল খায়। নীলা ঝিমোয়। আশুতোষ শ্যামলীর ঝটাপটি লেগেই থাকে।

রাতে খেতে বসে দীপক জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মোটা পাখিটার নাম আশুতোষ কেন? পাখির রং এর সঙ্গে রং মিলিয়ে ওর-ও তো সবুজ টাইপ্ এর একটা নাম রাখা উচিৎ ছিল।'

'ও বাবা! লীনার ধারণা পাখিটা যোগী পুরুষ। প্রথম থেকেই নাকি ধ্যান করার মতো, স্থির হয়ে বসে থাকত। মেয়ে পাখিটা ওকে উত্যক্ত করে বলে

সারাক্ষণ ঝুটোপুটি হয়। যোগী আশুতোষ বিরক্ত হয়ে ঠুক্‌রে দিলেও শ্যামলীর লজ্জা নেই।'

দীপক হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। রিমি পাশে বসে খাচ্ছে বলে রসাল আলোচনাটা আর এগোলো না।

প্রথম রাতেই ঘুমপাড়ানো নিয়ে সমস্যা। রিমিকে সাড়ে আটটার মধ্যে দোতলায় শুতে পাঠাই। ও চায় তার আগে ফ্যামিলিরুম অন্ধকার করে লীনার কথামতো একজোড়া বাজনাবাদ্যি বাজিয়ে আশুতোষদের ঘুম পাড়াবে। এদিকে রাত দশটা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত আমাদের টিভি চলে। তখন বাড়িতে কম্পিউটার ছিলনা। টিভিতেই নিউজ, টক্‌-শো, সিনেমা দেখি। লীনার পাখিদের জন্যে সেটাও বন্ধ করতে হবে? আমাদের শার্লি, চার্লি তো দিব্যি জেগে থাকে। রাতে আলো নিভিয়ে খাঁচার ওপর তোয়ালে ঢাকা দিয়ে ওপরে চলে যাই। একদম বিরক্ত করেনা। এসব কথা বলতেই রিমি কাঁদতে লাগল। পাখিগুলো নাকি এমনিতেই কণিকা, মণিকাদের "মিস্‌ করছে"। তার ওপর এ বাড়িতে ওরা শুধু রিমিকেই বেশি চেনে। ও যদি আশুতোষদের 'গুড নাইট্‌' না করে, ওরা আরও কষ্ট পাবে।

শেষ পর্যন্ত দীপক বলল, 'ঠিক আছে। তুমি ওদের এইট-থার্টির মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে লাইট-অফ্‌ করে দাও। আমি আর মা তারপর বেস্‌মেন্টে বসে টিভি দেখব।'

সাত রাত্তির এই চলল। রিমি নিশ্চিন্ত হয়ে ওপরে চলে গেলে কি হবে, ওদের পাখা ঝাপ্‌টানোর শব্দ, ক্যাচ্‌ক্যাচানি অনেকক্ষণ পর্যন্ত শুনতে পেতাম।

পরের শনিবার সন্ধ্যেবেলায় লীনারা এসে অনেক ধন্যবাদ আর ফ্লোরিডার গিফ্‌ট্‌ টিফ্‌ট্‌ দিয়ে পাখিগুলোকে ফেরৎ নিয়ে গেল। রিমির মন খারাপ। সে কথা স্বীকার না করে বলল, 'শার্লি, চার্লি আবার লোন্‌লি হয়ে গেল।' আমি বোঝালাম, 'মোটেই না। ওদের পাখিগুলো একটুও ফ্রেন্ড্‌লী নয়। দেখিসনি, আশুতোষ কিরকম রেগে রেগে চ্যাঁচাতো? খাঁচার মধ্যে না থাকলে হয়তো তোর পাখিদের কামড়েই দিতো।'

আশুতোষের সেই চণ্ডাল রাগই কাল হল। কিছুদিন পরে শ্যামলীর সঙ্গে মারামারি করে তাকে এমন ঠুক্‌রোল যে, ঘা হয়ে পাখিটা মরে গেল। লীনা পাখি বুকে করে ভেটারিনারী ডাক্তারের কাছে গিয়েও বাঁচাতে পারল না।

লীনার কথায় শ্যামলীর ফিউনার‍্যালের দিন ওদের বাড়ি গেলাম। রিমি তার বেহালার বাক্স নিয়ে গিয়েছে। কবর দেওয়ার সময় করুণ সুর বাজাবে। সবই লীনার নির্দেশ। দীপক বলল, 'এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে! আমাদের বাড়িতে পাখি, মাছ, কুকুর কত কি মরে গিয়েছিল। হ্যাঁ, মনখারাপ হত। তা বলে গান, বাজনা হবে? তোমার বন্ধুর মাথায় ভালোরকম ছিট্ আছে! সঞ্জয় যে কী করে পুট-আপ করে....'।

এত কথা বলেও দীপক গম্ভীর মুখে লীনাদের বাগানে গিয়ে বসল। বাইরের লোক বলতে শুধু আমরা তিনজন।

তখন বসন্তকাল। গাছের ডালে ডালে বুনো পাখিদের কিচিরমিচির। উইলো গাছের পাশে মাটি খুঁড়ে চৌকোমতো গর্ত করা হয়েছে। লীনা একটা ছোট টিনের বাক্স হাতে ঘাসে ওপর বসে আছে। ভেতরে লাল টুকটুকে কাপড়ে জড়ানো শ্যামলীর ছোট্ট শরীর। ডোমেস্টিক ভায়লেন্সের শিকার। তাই সধবার সাজ। বাকি পাখিগুলো বাড়িতে খাঁচার ভেতরে বন্দি। লীনা ওদের এই করুণ দৃশ্য দেখাতে চায় না। আশুতোষ নাকি খুব অনুতপ্ত! শ্যামলী-হত্যার পর ঠিকমতো দানাপানিও খাচ্ছে না। দেখলাম বটে, গোদা সবুজ পাখিটা ঘাড় নীচু করে বসে আছে।

শ্যামলীর ফিউনার‍্যাল শুরু হল। কণিকা, মণিকা হাতে ফুল নিয়ে বসে আছে। রিমি মাথা নীচু করে খানিকক্ষণ বেহালা বাজাল। কণিকা, মণিকার চোখে জল। লীনা ভাঙা গলায় গাইল 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না।' আধখানা গানের পর শ্যামলীকে মাটি চাপা দেওয়ার সময় আমরাও ক'টা ফুল ছড়িয়ে দিলাম।

বছরখানেক বাদে সঞ্জয়, লীনারা ডেনভার চলে গেল। প্রথম প্রথম ফোন-এ কথা হত। ক্রমশ যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এলো। ইদানীং নতুন বছরে একটা গ্রিটিংস কার্ড আসে। রিমি, কণিকা, মণিকারা সংসার আর কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। তাদের ছোটবেলার ঘরগুলো খালি পড়ে থাকে। গ্যারাজে ফেলে রাখা নীল, সবুজ, কমলা রং এর খাঁচা। ঘরে দোরে এম্প্‌টি গেস্ট্ সীন্‌ড্রোম্। স্মৃতি বলতে কিছু পুরোনো ছবি। রিমি তার ফেস্‌বুক এ দিয়েছে। তিনটে খাঁচা আর ছটা পাখির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে তিনকন্যা। ফোক্‌লা দাঁতে হাসছে সাত বছরের রিমি।

———

দেশান্তরের স্বজন

সানরাইজ হেলথ কেয়ার সেন্টারের পশ্চিমের কাচে ঘেরা বারান্দা থেকে সূর্যাস্ত দেখা যায়। বিশাল দিগন্ত জুড়ে লাল আভা ম্লান হতে হতে দূরের গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার আগে "সানরাইজ" এর বাগানে, গাড়ির পার্কিং লটে সারি সারি আলো জ্বলে ওঠে। চারতলা বাড়িটায় শিফ্‌ট বদলের সময় হঠাৎ ব্যস্ততা বেড়ে যায়। শেষ হয় অপালার একটি কর্মক্লান্ত দিন।

আজ নীচে নামার জন্য এলিভেটরের কাছাকাছি যেতে রাতের শিফ্‌ট্‌-এর নার্স মেলিসার ফোন এলো, 'তুমি কি এখনো নার্সেস্‌ স্টেশনে আছো?'

অপালা উত্তর দিল, 'না। নীচে যাচ্ছি। কেন? ইজ দেয়ার এনি প্রব্‌লেম?'

'নট অ্যাট অল্‌। দুশো দশের পেশেন্ট বলছে তোমার নাকি ওকে বই দেওয়ার কথা ছিল। রাতে স্লীপ মেডিকেশন নেওয়ার আগে বই পড়বে। কিন্তু আমি তো কোনো বই দেখতে পাচ্ছি না।'

লিভেটরের ভেতর থেকে অপালা জানিয়ে দিল, 'বলে দাও কাল ম্যাগাজিন নিয়ে আসব। ও. কে. বাই।'

গাড়িতে উঠে বাড়ি ফেরার পথে অপালা ভাবছিল অভিজিৎ হয়তো আরও দু-চার বার ওর খোঁজ করবেন। কাল সকাল থেকে আবার ডাকাডাকি শুরু হবে। কিছু অবান্তর কথা বলবেন। অথচ ডিমেন্‌শিয়ার সূত্রপাত নয়। বয়সও তেমন বেশি হয়নি। শুধু ক্যানসার সার্জারির পর থেকে পিঠের ব্যথায় প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। হয়তো দীর্ঘদিন এখানেই থাকতে হবে। নার্স হিসেবে অপালার দায়িত্ব এইসব লং টার্ম কেয়ারের অসুস্থ মানুষদের দেখাশোনা করা। কিন্তু বিশেষ একজন রুগীকে যখন তখন সঙ্গ দেওয়া তো সম্ভব নয়। ভারতীয় নার্স বলে ভারতীয় রুগীকে বেশি সময় দেবে, ওয়ার্কিং আওয়ারে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে সে সুযোগ কোথায়? প্রফেশন্যাল এথিক্‌স অনুযায়ী সকলের সম্পর্কেই তার সমান দায়িত্ব। অনেক বছর ধরে এই চাকরি করতে করতে অপালা বুঝেছে ধৈর্য্য আর সহানুভূতির পাশাপাশি

একধরণের ডিট্যাচমেন্টও এসে যায়। তবু, দুশো দশ মানেই তো শুধু একটা ঘরের নম্বর নয়। সেখানে একজন চেনা মানুষ অসুস্থ অবস্থায় আছেন। অপালা যতটুকু পারে সাহায্য করে।

কিন্তু অভিজিতেরও একটু বোঝা দরকার। কত লোক বছরের পর বছর লংটার্ম কেয়ারে থাকে। বার্ধক্যের জন্যে, কখনো আত্মীয় স্বজনের অভাবে চিকিৎসা আর সেবাযত্নের জন্যে এখানে চলে আসতে বাধ্য হয়। ছেলেমেয়ে থাকলেও বা কী? তাদের চাকরি, সংসার ফেলে রেখে বারোমাস অসুস্থ বাবা, মা-র পাশে থাকা সম্ভব নয়। তবু যারা চায় এখানে পাঠায় না। বাড়িতে হোম হেলথ্ কেয়ারের নার্স, নার্সেস্ এইড রেখে দেখাশোনার ব্যবস্থা করে। কিন্তু অভিজিতের দায়িত্ব কে নেবে? অপালা ভেবে পায়না ওঁর ভবিষ্যৎ জীবনে আর কি অল্টারনেটিভ থাকতে পারে? উনি কেন বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে চাইছেন না?

বাড়ি ফিরে স্নান সেরে বেরিয়ে অপালা শুনতে পেল মৈনাক ফোনে কথা বলছে। নীচে এসে রান্নাঘরে দুজনের চা তৈরি করতে করতে কানে এল, 'তোমরা কখন আসতে পারবে বলে মনে হয়? একটু ধরো, আমি অপালাকে ফোনটা দিচ্ছি। ও ঠিকমতো বলতে পারবে।'

অপালাকে ফোন ধরিয়ে দেওয়ার আগে মৈনাক বলল, 'গ্রেট নেক্ থেকে রঞ্জনারা রবিবার অভিজিৎদাকে দেখতে আসতে চাইছে। আমরা কি ফ্রী আছি? তাহলে আমরাও যেতে পারি।'

অপালা ফোন ধরে দু-এক কথার পর রঞ্জনাদের রবিবার সোজা "সানরাইজ" এ যেতে বলল। ফেরার পথে এখানে ডিনারের নেমন্তন্ন করল। "সানরাইজ্" এর ঠিকানা, ফোন নম্বরও দিয়ে দিল।

চা নিয়ে বসে মৈনাককে বলল, 'আচ্ছা, ছুটির দিনে আবার নার্সিংহোমে যাব কেন? তোমার ইচ্ছে হলে সান-ডে তে ঘুরে আসতে পারো। শনিবার হবে না। সুস্মিতার মেয়ের ব্রাইডাল শাওয়ারে যেতে হবে।'

'ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা নয়। মানুষটাকে দেখতে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। তুমিই বলো উনি বিকেলের দিকে একটু লোকজন আশা করেন।'

'রঞ্জনারা তো যাচ্ছে। উইক-ডে তেও চেনাশোনা কয়েকজন দেখে গেছে। সেমি প্রাইভেট রুমে একজন স্ট্রোকের পেশেন্ট আছে। তার কাছে বাড়ির লোকজন

আসে। সেইজন্যে বলছিলাম একসঙ্গে ভিড় না করে অন্যদিন যেতে পারো।'

মৈনাক আর কথা বাড়ায় না। অপালার কথায় যুক্তি আছে। প্রসঙ্গ বদল করে রাজনীতিতে চলে যায়। সামনে আমেরিকার প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন। রিপাবলিক্যান আর ডেমোক্র্যাটিক দলের ক্যান্‌ডিডেটদের প্রবল তর্কযুদ্ধ আর মিডিয়ার ঘন ঘন বিশ্লেষণ শোনার জন্য ফ্যামিলিরুমে টিভি খুলে বসে যায়। একসময় রান্নাঘরে ডাক পড়লে খাবার টেবিলে দু-গেলাস জল দেয়। খেতে বসে মৈনাক জিজ্ঞেস করে, 'রঞ্জনাদের যে আসতে বললে, রান্নাটান্না করবে কখন? শুক্রবার তোমার নাইট-শিফ্‌ট্ না? ফিরবে তো সেই শনিবার সকালে। ওদের নিয়ে বাইরে খেতে গেলে হয়।'

'দরকার নেই। ওরা অত দূর থেকে আসবে। সানরাইজ থেকে এখানে এসে একটু রি-ল্যাক্স্ করতে পারবে। কাল দীপাস্ কিচেনে ফোন করে রান্নার অর্ডার দিয়ে রাখব।'

মৈনাক খেতে খেতে মুখ তুলল, 'আবার সেই বাংলাদেশি মাছ'?

অপালা মাথা নাড়ল, 'না, না। চিংড়ি মাছ। নিজেই করে নেব। বাকি রান্নাগুলো ওখান থেকে নিয়ে আসব। একটু ঘরোয়া আড্ডা আর খাওয়াদাওয়া, এই তো ব্যাপার।'

খাওয়ার পর ডিশ ওয়াশারে বাসন রাখতে রাখতে মৈনাকের খেয়াল হল ফোনে অনির মেসেজ ছিল। অপালাকে সে কথা বলতে ও অ্যাটল্যান্টায় মেয়েকে ফোন করল। দুজনের কথাবার্তা শুনতে শুনতে মৈনাক আবার ফ্যামিলিরুমে ভোটের ডিবেট দেখার জন্যে টিভি খুলে বসে গেল।

দোতলায় যাওয়ার আগে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অপালা বলল, 'অনি জুন এর মিড্‌ল্ এ নিউইয়র্কে মেডিকেল কন্‌ফারেন্সে আসবে। ফাদার্স-ডে উইক-এন্ডে থাকতে পারবে বোধহয়।'

মৈনাক খুশি হল, 'ওরা সবাই আসবে নাকি? ওখানে তো সামার ভেকেশন আগে হয়।'

—'মনে হোলো চারজনই আসবে। অনি কন্‌ফার্ম করলে ওই সপ্তাহটা ছুটি নেব। রুগী সেবা বন্ধ করে ওমি, শমীদের নিয়ে সময় কাটাব।'

অপালা শুতে যাওয়ার পর মৈনাকও আর বেশিক্ষণ টিভি দেখল না। অনিরা

আসবে জেনে মনটা ভালো লাগছে। ওরা অ্যাট্‌ল্যান্টা চলে যাওয়ার পর থেকে আগের মতো আর দেখা হয় না।

অনি কলেজ পাস করে ডাক্তারি পড়ল নিউইয়র্কে। রেসিডেন্সিও করল নিউইয়র্কে মাউন্ট সাইনাই হস্‌পিট্যালে। বিয়ের পর সঞ্জয়ের সঙ্গে চলে গেল অ্যাটল্যান্টায়। মৈনাক আশা করেছিল ওরা দুজন এদিকেই কোথাও প্র্যাক্‌টিস্‌ শুরু করবে। হয়তো ওয়াশিংটন বা বস্টনে থাকবে। কিন্তু অনি মেডিকেল প্র্যাক্‌টিসের ধারে কাছেও গেল না। ইন্‌ফেক্‌শাস ডিসিস-এ স্পেশ্যাল্‌টি করে অ্যাটল্যান্টায় 'সেন্টারস্‌ ফর ডিসিস কন্ট্রোল'-এ রিসার্চে ভালো চাকরি পেয়ে চলে গেল। সঞ্জয় ইন্টারন্যাল মেডিসিনের ডাক্তার। ওখানেই প্র্যাক্‌টিস শুরু করল। আর তো এদিকে ফেরার প্রশ্ন নেই।

ফাদার্স-ডে ভাবলে অনির ছোটবেলাটা মনে পড়ে। সাদা কাগজে ক্রেয়ন দিয়ে হিজিবিজি ছবি এঁকে কার্ড দিত। চা, কফি করতে দেওয়া হোতো না বলে ওইদিন সাতসকালে উঠে ছোট একটা ট্রে নিয়ে ঘরে আসত। তার ওপর এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস, কটা বিস্কুট আর কাপ কেক। মেয়েকে আদর করে ঘুমচোখে মৈনাক কনকনে ঠান্ডা অরেঞ্জ জুস্‌ আর বিস্কুট খেত। গোলাপি স্লিপিং পায়জামা পরা রোগা মেয়েটা কচি হাতে কাপ কেক নিয়ে বলত, প্রিটেন্ড করো তুমি কফি খাচ্ছো বাবা।

আজ সেইসব পুরোনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে মৈনাকের চোখে ঘুম এসে গেল।

"সানরাইজ" এ সকাল হয় সূর্য ওঠার বেশ কিছুক্ষণ পরে। হল-ওয়েতে ব্যস্ততার সাড়াশব্দ পাওয়া গেলেও দরকার ছাড়া রুগীদের ঘরে তখনও কেউ ঢোকে না। আজ তন্দ্রাচ্ছন্ন অভিজিৎকে জাগিয়ে দিয়ে গতরাতের নার্স মেলিসা পেপার-কাপ এ কফি রেখে গেল। এখানে ঘুম ভাঙলে কফি পাওয়া যায় না। আটটা সাড়ে-আটটা নাগাদ ঘরে ব্রেকফাস্টের ট্রে আসে। সেই সঙ্গে কফি নয়তো চা। অভিজিৎ ঘুম ভেঙে কফি পান না বলে অপালাকে দিয়ে সকালের ওই ব্যবস্থাটা করিয়েছেন। প্রথমদিকে নিজেই চেষ্টা করতেন। হল্‌-ওয়ে দিয়ে হেঁটে যাওয়া ভলান্‌টিয়ার মেয়েগুলোকে 'হ্যালো হ্যালো' বলে ডাকতেন। কেউ সাড়া দিত। মাইক্রোওয়েভে কফি করেও আনত। বাকিরা সেই যে গেল, আর পাত্তা নেই। অপালা বলে রাখলেও সব নার্সদের খেয়াল থাকে না। তারা তখন রুগীদের সকালের পরিচর্যায় ব্যস্ত। কেউ

নার্সেস্ স্টেশনে ফোন কানে নিয়ে বসে আছে। কেউ একমনে কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে। বাকি দু-চারজন কম্পিউটার বসানো ওষুধের ট্রলি ঠেলে ঠেলে একেক ঘরে ঢুকছে আর বেরোনোর নাম নেই। মাঝখান থেকে জ্বালাতন করে জ্বর আর ব্লাড-প্রেশার নেওয়ার মেয়েগুলো। অভিজিৎ লক্ষ্য করেছেন এদের মধ্যে হাঁদা টাইপ এর দু-একটা আছে। উল্টোপাল্টা প্রেশার মাপে। জ্বর নিবি তো দু-দণ্ড ধৈর্য্য ধর্। কানে থার্মোমিটার ঢুকিয়েই বার করে নিয়ে কাগজে ছাইভস্ম কি যেন লিখল। একদিন অভিজিৎ জেরা করে জানলেন তাঁর টেম্পারেচর পঁচানব্বই। অথচ নিজের রীতিমতো জ্বর জ্বর লাগছিল। নার্সকে ডেকে নালিশ করার পরেও জ্বর ধরা পড়েনি। অপালাও যেন এসব কথার গুরুত্ব দেয় না। যা হোক, তবু ঘুম ভেঙে গরম কফিটা পাওয়া যাচ্ছে। অভিজিৎ তাই সকালের দিকে বেশি ডাকাডাকি করতে চান না। ঘরে আর একজন রুগী আছে। সেটাও কন্‌সিডার করা উচিৎ।

আজ রবিবার। সারাদিন ধরে ঘরে ঘরে ভিজিটর আসছে। ছুটির দিনে সব থেরাপিস্ট্ আসে না। দুশো দশ নম্বরের অন্য রুগীর স্ট্রোকের পরে কয়েকরকম থেরাপি চলছে। স্পীচ্ থেরাপি করতে করতে কথা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। তার বিছানার চারপাশে আজ নাতি, নাতনি, ছেলের বউ বসে আছে। মাঝে মাঝে দুই মেয়ে আসে। অভিজিতের ধারণা এরকম রুগীকে লোকজন রেখে নিশ্চয়ই বাড়িতে রাখা যায়। আসলে বুড়োর বউ মরে গেছে বলে কেউ আর দায়িত্ব নেবে না। স্ট্রোক হওয়ার পরে হস্‌পিট্যাল থেকেই লং টার্ম কেয়ার সেন্টারে পাঠিয়ে দিল। বুড়োর যেন সেজন্যে কোনো দুঃখও নেই। অভিজিৎকে বলে, ওরা খুব কেয়ারিং। আমাকে অনেক দেখাশোনা করেছে। বাট দে হ্যাভ আদার থিংগ্‌স্ টু ডু। আমার এই বয়সে লং টার্ম কেয়ারে চলে আসাই ঠিক ডিসিশন হয়েছে।

হতে পারে। মার্ক নামে আমেরিকান লোকটির বয়স বোধহয় আশির ওপরে। তাঁর পক্ষে এখানে থাকার যুক্তি আছে। কিন্তু অভিজিতের জন্যে এ ডিসিশন কে নিল? স্টম্যাক ক্যান্সারের চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরে দুটো বছর তো ভালোই ছিলেন। একা বাড়িতে নিজেই বাজারহাট, রান্নাবান্না করতেন। উইক-এন্ডে গাড়ি চালিয়ে বাঙালির আড্ডায় নেমন্তন্ন খেতে যেতেন। সেখান থেকে কৌটো করে খাবার নিয়ে ফিরতেন। ক্লাবের ছেলেমেয়েরা দুর্গা পুজো, পিক্‌নিক্ কোথাও ওঁর কাছ থেকে চাঁদা নিত না। সিনিয়র মেম্বার বলে খাতির, যত্ন করত। যে মানুষ প্রায়

চিরকালই একা, সত্তর বছরে পৌঁছে সে তুলনায় খারাপ তো কিছু ছিলেন না। অথচ চেনা-শোনা বাঙালিরাই অভিজিৎকে প্রায় একঘরে করে দিল। তাছাড়া কি? না হলে, একটা ছুতো করে দল বেঁধে মিটিং ডেকে সানরাইজ-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করল। তিনিও মেনে নেওয়ার লোক নন। পিঠের ব্যথাটা একটু কমলেই এখানকার কেস্ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবেন। রুগীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ জোর ফলাতে পারবে না। গাড়ি চালাতে না পারলেও ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন।

দুটো বেড এর মাঝখানে পর্দা টানা রয়েছে। দরজার কাছে প্রথম বেড এর রুগী অবেলায় আধোঘুমে। লো ভলিউম্-এ দেওয়ালের টিভি চলছে। এক মহিলা চেয়ারে বসে ম্যাগাজিন পড়ছেন। রঞ্জনাদের দেখে সামান্য হেসে "হাই" বলে পর্দার ওপাশের দিকে দ্যাখালেন।

অভিজিৎ জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। রঞ্জনা চেয়ার টেনে বসা মাত্র ঘরের সব আলো জ্বালিয়ে একটি হিস্প্যানিক মেয়ে এসে ঢুকল। টেবিলে জলভর্ত্তি প্লাস্টিকের জাগ্ আর ফোমের গ্লাস রেখে পুরোনো জাগ্ ফেরৎ নিয়ে গেল। ততোক্ষণে অভিজিতের ঘুম ভেঙে গেছে। রঞ্জনা আর সুব্রতকে দেখে উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'তোমরা অত দূর থেকে এলে? হোয়াট আ প্লেজেন্ট্ সারপ্রাইজ'!

সুব্রত কাছে এসে অভিজিতের হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন অভিজিৎদা? এখন হাঁটাচলা করতে পারছেন? আমরা তো প্রথমে খবরই পাইনি...'

অভিজিৎ বালিশে হেলান দিয়ে বসেছেন, 'দ্যাট্স্ ও.কে.। কে আর কাকে খবর দেবে? এখন ভালোই আছি। ব্যাক পেইন্ থাকলেও ওষুধ আর ফিজিও থেরাপিতে কাজ হচ্ছে। রঞ্জনা, তুমি কেমন আছো? তোমার কি একটা বই মুভি হবে শুনেছিলাম।'

রঞ্জনা হাসল, 'এত কিছুর মধ্যে আপনার সেটাও মনে আছে? হ্যাঁ, ছবিটা হওয়ার কথা। তবে শ্যুটিং কবে শুরু হবে জানিনা।'

অভিজিৎ রসিকতা করলেন, 'মুভিটা হলেও যে কি দাঁড়াবে, সেও তুমি জানো না। দেখলাম তো, কলকাতার ডিরেক্টররা ইমিগ্র্যান্টদের জীবন নিয়ে ছবি করতেই পারে না।'

সুব্রত মন্তব্য করল, 'স্টোরিগুলো আসলে আমাদের সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

নিয়ে লেখা। ওই যে, আমরা সবাই ডিপ্রেশনে ভুগছি। ছেলেমেয়েগুলো ড্রাগ খেয়ে উচ্ছন্নে গেছে। কোন্ মুভিটাতে যেন দেখলাম আমেরিকার বাঙালিদের ঘরে ঘরে বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। শেষে, দুখী টাইপ এর একটা লোক কাঁধে ঝোলা নিয়ে দেশে ফিরে গেল।'

অভিজিৎ যেন রসিকতাটা উপভোগ করলেন না। কেমন অন্যমনস্ক দেখাল। রঞ্জনা প্রসঙ্গ বদল করল, 'এখানে কতদিন থাকতে হবে ডাক্তার কিছু বলছে? এখন তো রিহ্যাব্-এর জন্যেই আছেন?'

'এখানে কয়েকটা উইং আছে। যারা মেজর সার্জারি বা স্ট্রোকের পরে রিহ্যাবিলিটেশন এর জন্যে আসে, তারা মোস্ট্‌লি অন্য ফ্লোরে থাকে। দু-এক মাসের মধ্যে চলেও যায়। আমারও সেই কেস্। কিন্তু তখন রুম খালি ছিল না বলে এই ফ্লোরে লংটার্ম কেয়ার ইউনিটে নিয়ে এলো। দেখি, কবে রিলিজ করে।'

সুব্রত বোঝাতে চেষ্টা করল, 'কিন্তু বাড়িতে একা থাকবেন কী করে? বাথরুমে পড়ে গিয়ে পিঠে ফ্র্যাক্‌চার হল। সারারাত উঠে বসতে পারলেন না। সময়মতো পাড়ার লোকের ফোন পেয়ে পুলিশ যদি না যেত...'

অভিজিতের সোজা উত্তর, 'কী আবার হত? মরে পড়ে থাকতাম? যার যেমন ডেস্টিনি। তাই বলে এখানেই থেকে যাব? এখনো ডিস্‌এবল্‌ড্ হয়ে যাইনি সুব্রত।'

রঞ্জনা ঈশারা করতে সুব্রত থেমে গেল। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এটা ঠিক যে, ওঁকে কেউ জোর করে এখানে রাখতে পারবে না। আবার হেঁটে চলে বেড়াতে পারলে হয়তো বাড়িতেই ভিজিটিং নার্স টার্স্ রেখে কিছুদিন ম্যানেজ করতে পারবেন। হেলথ্ ইন্সিয়োরেন্স থাকলেও খরচ অনেক বেশি হবে। দ্যাট উইল্ বি হিজ ডিসিশন।

রঞ্জনা সুব্রতকে নীচের ক্যাফেটেরিয়া থেকে কফি আনতে পাঠাল। এখানে এসে পৌঁছোতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগেছে। আবার অপালাদের বাড়ি গিয়ে তারপর লং আয়ল্যান্ডে ফেরা। অনেক রাত হয়ে যাবে। তাও আসতে পেরে ভালো লাগছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের ডিনার দেয় কখন?'

'এই তো, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দিয়ে যাবে। সকালে মেনু বুক থেকে অর্ডার করে দি। খাবার ভালোই। কয়েকরকম চয়েস্ থাকে। আমার কোনো রেস্ট্রিকশনও

নেই। ডেসার্টে আইসক্রিম, পুডিং সব খাই।' হাসতে হাসতে অভিজিৎ দরজার দিকে তাকালেন।

অভিজিতের ডিনার খাওয়া শেষ হওয়ার পরে সুব্রত, রঞ্জনা আর দেরি করতে চাইছিল না। মাঝে অপালার ফোন এসেছে। ওরা অপেক্ষা করে আছে।

বাইরে অন্ধকার হয়ে আসছে। অভিজিৎ চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। সাদা চাদরে ঢাকা তাঁর দুটো হাঁটুর ওপর হাত রেখে সুব্রত বলল, 'আজ তাহলে চলি অভিজিৎদা? আপনি এবার রেস্ট্ করুন। গেট ওয়েল্ সুন্'।

পর্দার ওপারে চেয়ার টানার শব্দ হল। পাশের পেশেন্টের কাছে ভিজিটর এসেছে। মৃদু স্বরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। ক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টি মেলে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? আর কেউ এসেছে? তোমরা উঠছ কেন? এপাশে একটা চেয়ার টেনে নাও।'

রঞ্জনা পেছন ফিরে কাউকে দেখতে পেল না। ওর মনে হল অভিজিৎদা আরও কাউকে আশা করছেন। আজ রবিবার, ছুটির দিন। অথচ চেনাশোনা কেউ ওঁকে দেখতে আসেনি। হয়তো অনেকেই এর মধ্যে ঘুরে গেছে। ওদেরই আসতে দেরি হল।

হঠাৎ অভিজিৎ বললেন, 'আই মাস্ট্ আন্ডারস্ট্যান্ড। লোকে আর কতবার দেখতে আসবে বলো? সবাই তো খোঁজখবর নিচ্ছে।'

রঞ্জনা আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, 'কাছাকাছি থাকলে আগেই আসতে পারতাম। আপনি ভালো হয়ে উঠুন। ফোনে খবর নেব।'

অভিজিৎ সামান্য হেসে হাত তুললেন, 'সাবধানে ড্রাইভ কোরো। থ্যাংক ইউ ফর কামিং। গুড় নাইট'।

'সানরাইজ' থেকে ওয়েস্ট মিল্‌ফোর্ডে মৈনাকদের বাড়ি যাওয়ার পথে বৃষ্টি নামল। এবছর শীত গেছে দেরি করে। বসন্ত এলো দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি নিয়ে। সকালের উজ্জ্বল আলো আড়াল করে হঠাৎ হঠাৎ মেঘ ঘনিয়ে আসে। কয়েক পশলা বৃষ্টির পর মেঘ ভাঙা ঝলমলে রোদ ওঠে। আজ সারাদিন বসন্তের এলোমেলো হাওয়া ছিল, রোদ ছিল। সন্ধ্যের পরে বৃষ্টি শুরু হতে অন্ধকারে অচেনা শহর থেকে মৈনাকদের বাড়ি পৌঁছোতে সুব্রত বার দুয়েক রাস্তা হারাল। পথের সাথী "জি পি এস্" এর যান্ত্রিক মহিলা কণ্ঠ এগিয়ে যাও, ঘুরিয়ে নাও, ডানদিক,

বাঁদিক বলতে বলতে যখন ওদের অপালাদের বাড়ির সামনে নিয়ে গেল, রাত তখন প্রায় আটটা।

অসময়ের বৃষ্টি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে দু-এক কথার পরে মৈনাক অভিজিতের আজকের খবর নিল। কথাবার্তার মাঝে কিচেন্ থেকে ড্রিংক নিয়ে এলো। অপালা খাবার ঘরে ডিনার সাজাচ্ছিল। রঞ্জনা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা তো ওঁকে অনেকদিন থেকে চেনেন। ওঁর বউকে দেখেছিলেন? সত্যিই কি ভদ্রলোক পঞ্চাশ বছর দেশে যাননি?'

অপালা হাসল, 'কোন্ উত্তরটা আগে চাও? বউ এর খবর? সে তো বহুদিন আগে চলে গেছে। আমরা যে বছর প্রথম নিউজার্সিতে এসেছিলাম, তখন কজনই বা বাঙালি ছিল। মৈনাক কয়েকমাস আগে এসেছিল বলে কোনো বাড়িতে অভিজিৎদা আর ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমি আসার পরে একদিন ওঁদের বাড়ি গেলাম। সত্যি বলতে কি আমেরিকা সম্পর্কে প্রায় মোহভঙ্গ হওয়ার যোগাড়। যেমন বাজে শহর, তেমন পুরোনো অ্যাপার্টমেন্ট। অথচ অভিজিৎদা কিন্তু তার কবছর আগেই টরন্টো থেকে এসে সেট্‌ল করেছেন। সেদিক থেকে সদ্য আসা স্টুডেন্ট বা নতুন ইমিগ্র্যান্টদের মতো ওঁর স্ট্রাগলিং পিরিয়ড চলছিল না। চাকরিও মোটামুটি ভালোই করতেন।'

'সত্যি! এত কৃপণ ভাবা যায়না। তবে দেশে হয়তো অনেক টাকা পাঠাতে হত। কিন্তু ওঁর বউ চাকরি করত না?'

'মাধবী খুব বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাজ করত। তবে ওর পে-চেক্ বোধহয় নিজের শখ, সাধ মেটাতেই খরচ হয়ে যেত। ওই ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে নিজের টুয়েন্টি পার্সেন্ট ডিস্‌কাউন্টে কসটিউম্ জুয়েলারি, জামাকাপড়, ডিজাইনার ব্যাগ ট্যাগ কিনত। রাণাঘাটে ওর বাপের বাড়িতেও সাহায্য করত। অভিজিৎদা সে ব্যাপারে হয়তো ইন্টারফিয়ার করতেন না। কিন্তু হাই-ক্রাইম এরিয়ায় ব্ল্যাক নেবার হুডে থেকে, সাতকেলে পুরোনো গাড়ি চড়ে ক'টা মেয়ে মানিয়ে নিতে রাজি হবে?'

রঞ্জনা সায় দিল, 'আমি তো পারতাম না। দেশেই কখনো ওভাবে থাকিনি। এখানে মোটামুটি একটা বেসিক স্ট্যান্ডার্ড মেন্‌টেন্ করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই ওঁদের ছিল, যদি না দেশে অনেক লায়াবিলিটি থাকে....'

অপালা রীতিমতো উত্তেজিত, 'সে চাপ কার ছিল না? আমাদের হাস্‌ব্যান্ডরা তো সব সোনার ডিম পাড়া হাঁস। আত্মীয়স্বজনের নীড়্, এক্সপেক্‌টেশন, ডিম্যান্ড মেটাতে গিয়ে, এখানে নিজেদের সংসারে একসময় প্রায়রিটি বুঝে চলতে হয়েছে। তা বলে ভালোভাবে থাকব না? এক-দু বছর অন্তর দেশে যাব না?'

লিভিংরুম থেকে মৈনাকের গলা পাওয়া গেল, 'কি হল এবার খেতে দিয়ে দাও। ওদের তো ফিরতে হবে।'

ডিনার খেতে বসে মৈনাক বলল, 'একটু আগে অভিজিৎদার টেক্সট ম্যাসেজ্ এসেছে। আমার সঙ্গে ওঁর কিছু ডিস্‌কাস্ করার আছে।'

অপালা অবাক, 'এখনো জেগে আছেন? কি আবার ডিস্‌কাস্ করবেন?'

'সেটা গিয়ে শুনব। কাল অফিস ফেরৎ দেখা করে আসব।'

'পরদিন সানরাইজ'-এ গিয়ে কাজের ফাঁকে অপালা একবার দুশো দশ নম্বরে ঢুকল। অভিজিৎকে নীচের রিহ্যাব-সেন্টারে ফিজিওথেরাপি করাতে নিয়ে গেছে। পাশের বেডের রুগী খবর দিল। অপালার অপেক্ষা করার সময় নেই। ভাবল লাঞ্চের সময় এসে খবর নিয়ে যাবে। কি এমন দরকার পড়ল যে, অভিজিৎ শুধু মৈনাকের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। তার মানে অসুখবিসুখের কথা নয়।

লাঞ্চের সময় ফ্রিজ থেকে ছোট ছোট প্ল্যাস্টিকের কৌটো ভর্ত্তি ভাত, শুক্তো আর চিংড়ি মাছের ঝোল নিয়ে অপালা অভিজিতের ঘরে গেল। তখনও ওঁর টেবিলে লাঞ্চের ট্রে দিয়ে যায়নি। অপালা পেপার প্লেটে ভাত দিতে দিতে বলল, 'আজ বাড়ির রান্না খান। কাল রঞ্জনারা এখান থেকে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। ওদের জন্যে একটু রান্না করেছিলাম....'

অভিজিৎ খুশি হলেন, 'শুক্তো নাকি? এসব খাওয়া ভুলেই গেছি। উইক্-এন্ডে তোমাদের সকলের বাড়ি ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন খাওয়াও শেষ।'

'একথা বলছেন কেন? কখনো কিছু খাওয়ার ইচ্ছে হলে বলবেন। আমাদের ক্লাব থেকে মেম্বারদের কাছে ই-মেইল্ আসছে। আপনার যদি কিছু দরকার হয়, সবাই যাতে হেল্‌প করতে পারি।'

'সো কাইন্ড অফ্ ইউ। হেল্‌প্ তোমরা সব সময় করছ। লাস্ট দু বছরে কতবার অসুস্থ হলাম। আমার ফ্যামিলি নেই। আত্মীয়স্বজন নেই। এই কমিউনিটিই তো দেখাশোনা করেছে।'

অভিজিৎ খাওয়া শুরু করেছেন। অপালা চলে যাওয়ার আগে বলল, 'আপনার আমেরিকান নেবাররাও যা করেছে। সেদিন আপনি হাঁটতে বেরোননি। ড্রাইভ-ওয়ে থেকে সকালের খবরের কাগজ তোলেননি। এতেই ওদের সন্দেহ হয়েছিল। না হলে যে কি হত!'

'অনেকদিনের চেনাশোনা। একটা বন্ড তৈরি হয়ে যায়। দ্যাখোনা, কেউ না কেউ মাঝে মাঝেই দেখতে আসে।'

অপালার লাঞ্চ আওয়ার শেষ হয়ে যাচ্ছে। ও আর বেশিক্ষণ থাকতে পারলো না।

বিকেলের দিকে মৈনাকের ফোন এলো। ওর 'সানরাইজ'-এ আসতে একটু দেরি হবে। অপালা বলল, 'আমি আর অতক্ষণ ওয়েট করতে পারব না। তুমি অভিজিৎদার সঙ্গে কথাটথা বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো।'

মৈনাক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বলেছ যে আমি আজ আসব?'

'না। যদি কোনো কারণে আসতে না পারো, উনি সারা সন্ধ্যে আশা করে বসে থাকবেন।'

'ঠিক আছে। দেখি, যদি অফিস থেকে একটু আগে উঠতে পারি।'

অপালা বাড়ি ফিরে মেয়ের ফোন পেল। অনিকা বলল, 'তোমার বিকেলের ম্যাসেজ্‌টা পেয়েছিলাম। কল্‌ ব্যাক্‌ করার সময় পাইনি। আমাদের ট্র্যাভ্‌ল্‌ প্ল্যান একটু চেঞ্জ করতে হচ্ছে।'

অপালা জানতে চাইল, 'কেন? ওই সময় তোর নিউইয়র্কে কনফারেন্স আছে না? ফাদার্স-ডের আগে চলে আসবি বলেছিলি?'

'ঠিক আগের দিন আসব। জেনিভা থেকে। নিউইয়র্কের মিটিং অ্যাটেন্ড করছি না। ওয়ার্ল্ড হেলথ্‌ অর্গ্যানাইজেশানের কনফারেন্সে জেনিভা যেতে হচ্ছে। সঞ্জয় এখান থেকে ওমি, শমীকে নিয়ে ফ্রাই-ডে ইভ্‌নিং ফ্লাইটে পৌঁছোবে। বাবাকে ওদের ফ্লাইট নাম্বার জানিয়ে দেবে।'

'তুই ওই শনিবার কখন এসে পৌঁছোবি?'

অনিকা বলল, 'আমাকে পিক্‌-আপ করতে হবে না। এয়ারপোর্ট থেকে কার সার্ভিস নিয়ে নেব। বাবাকে একটু ফোনটা দেবে? শমী দাদুকে হ্যালো বলতে চাইছে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অপালা উত্তর দিল, 'ও তো এখনও ফেরেনি। অভিজিৎদাকে দেখতে 'সানরাইজ'-এ গেছে।'

'অভি জেঠু কেমন আছে? আই হোপ, হি ইজ্ গেটিং বেটার।'

'গ্র্যাজুয়্যালী ইমপ্রুভ করছেন। তোদের কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন।'

ফোন রাখার আগে অনিকা বলল, 'যদি সময় পাই একবার ওঁকে দেখে আসব।'

'সানরাইজ'-এর দুশো দশ নম্বর ঘরে মৈনাক তখনও অভিজিতের কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারছে না। ওর মনে হত দীর্ঘদিনের একাকিত্ব, নিঃসঙ্গ জীবনে উনি একরকম অভ্যস্থ হয়ে গেছেন। মাধবী ডিভোর্সের পরে এক ফার্মাসিস্ট্‌কে বিয়ে করে নর্থ ক্যারোলাইনা চলে গিয়েছিল। এখনো বোধহয় সেখানেই থাকে। এসব নিয়ে অভিজিতের সঙ্গে কোনো কথাও হয় না। এমনিতেও পার্সোন্যাল্ আলোচনা বিশেষ করেন না।

আজ দেশের কথা উঠতে মৈনাক প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'তবে যে বলতেন আপনার কোনো পিছুটান নেই? আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কও তো রাখেননি? তাহলে কার ভরসায় এত বড় ডিসিশন নিচ্ছেন?'

অভিজিৎ মাথা নাড়লেন, 'না, পিছুটান বলতে সেভাবে কিছু ছিল না। আমরা দুই ভাইবোন ছোট থাকতে মা নিউমোনিয়া হয়ে মারা গিয়েছিলেন। বাবা আবার বিয়ে করলেন। সেই মহিলার কাছে ওই শিশুবয়সে স্নেহ, মমতা, প্রশ্রয় কোনো কিছুই পাইনি। ওঁর নিজের ছেলেমেয়ে হল। আমরা দুজন পরগাছার মতো বড় হয়ে উঠছিলাম। বোনের বিয়ের আগেই কলেজ পাস করে ক্যানাডায় চলে এসেছিলাম।'

অভিজিতের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। মৈনাক বাধা দিল, 'আপনি টায়ার্ড হয়ে পড়ছেন। এবার রেস্ট নেওয়া দরকার। আমি একটা অন্য কথা ভাবছি।....'

'বলো। আমার ডিসিশনটা মানতে পারছ না, তাই তো?'

'অ্যাপারেন্ট্‌লী তাই। কিন্তু এখানে বসে এসব ডিস্‌কাস্ করা যায় না অভিজিৎদা। অনেক ইনফর্মেশন নেওয়ার আছে। ভাবছি ডাক্তারের পারমিশন নিয়ে একটা উইক-এন্ডে যদি আপনাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাই।'

অভিজিৎ যেন স্বস্তি পেলেন, 'নিয়ে যাবে? তোমরা যদি এখানে ডঃ গোল্ডম্যানের সঙ্গে কথা বলো। এখন আমি বেশ ভালো আছি।'

মৈনাক চলে যাওয়ার আগে বলে গেল, 'অপালা আপনার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবে। ইন দ্য মীন্ টাইম আমি এল্‌ডার ল, উইল্‌স্ অ্যান্ড ট্রাস্টস্, পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্নি সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। তবে ফাইন্যাল ডিসিশন নেওয়ার আগে এখানে আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলুন। সেইজন্যে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছি।'

'হোয়াট এভার ইউ সাজেস্ট। আজ বাড়ি যাও। গুডনাইট।'

ভোরের দিকে কীসের অসোয়াস্তিতে অভিজিতের ঘুম ভেঙে গেল। গলার কাছে চাপ চাপ ভাব। সামান্য হাঁপ ধরছে। উঠে বসার চেষ্টা করতে ঢেঁকুর উঠল। অ্যাসিডিটির মতো লাগছে। কাল ডিনারে চিকেন পারমিসান্ খেয়েছিলেন। সস, চীজ মিলিয়ে অম্বল হয়ে গেছে।

অভিজিৎ জল খেলেন। সকালের কফির পরে আবার অ্যাসিডিটির মতো বুক, গলা চিনচিন করে উঠল। ভয়ে ভয়ে ব্রেক্‌ফাস্ট সামান্যই খেলেন। নার্সের কাছে অ্যান্টাসিড চেয়ে খাওয়ার পরে ক্রমশ বুকের ভেতর ভার ভার ভাবটা কমে গেল। ডাক্তার ভিজিট করতে এলে অভিজিৎ সকালের অসোয়াস্তির কথা বললেন না। সারাদিন শুয়ে বসে থাকলে গ্যাস হবে না? আজ রি-হ্যাব এক্‌সারসাইজের আগে একটু হাঁটবেন।

শনিবার মৈনাকদের বাড়িতে আসার পর থেকে অভিজিৎ বুঝেছেন আজ তাঁকে নিজের ইচ্ছের কথা কিছুটা যুক্তি দিয়ে এদের কাছে খুলে বলতে হবে। শুধু মৈনাক, অপালা নয়, যারা এত বছর তাঁর কাছাকাছি আছে, আত্মীয়বন্ধুর মতো সম্পর্ক রেখেছে, তাদের মধ্যে শুধু কৌতূহল নয়, যথেষ্ট উদ্বেগও তিনি লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত, যা অনেকটাই আবেগ নির্ভর, তা জানার অধিকার এদেরও আছে। মৈনাকরা সেইরকমই বলতে চাইছে।

সেদিন যে কথা 'সানরাইজ'-এ শেষ হয়নি, সে প্রসঙ্গ তুলে অপালা জিজ্ঞেস করল, 'এত বছর পরে কেন আপনি ইন্ডিয়ায় ফিরতে চাইছেন অভিজিৎদা? কখনো তো বেড়াতে যেতেও চাইতেন না।'

অভিজিৎ অতীতের প্রসঙ্গে কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে উত্তর দিলেন, 'বাড়ির ওপর ঠিক অভিমান করে নয়, বলতে পারো নিজের কেরিয়ার, ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রথমবার ক্যানাডায় চলে এসেছিলাম। তখন যা দিন ছিল, এখনকার মতো

প্লেন ফেয়ার অ্যাফোর্ড করা সহজ ছিল না। বাড়িতে টাকা পাঠাতে হত। তারপর আমার এক মাসি সম্বন্ধ করে মাধবীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলেন। সেবার দেশে গিয়ে বুঝতে পারলাম বাবার যাদবপুরের বাড়িতে আমার আর জায়গা নেই। বাবা তখনও বেঁচে। সৎ ভাইরা জানিয়ে দিল বাবা তাঁর উইলে আমাকে কোনো অংশ দেননি। সব লিখে দিয়েছেন ওদের মা-র নামে।'

অভিজিৎ হাঁপিয়ে উঠছেন। কথা শেষ করার আগে শুধু বললেন, 'হয়তো সত্যিই আমি বাড়ি আর সম্পত্তির ভাগ নিতে যেতাম না। কিন্তু সেসময় এত অভিমান হয়েছিল, আর কখনো দেশে যাইনি। শুধু বাবার জন্যে টাকা পাঠাতাম। তাঁর ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্যে অনেক খরচ হয়েছিল। ওঁর ছেলেদের ফাইন্যানশিয়াল সিচুয়েশন কেমন ছিল জানিনা। আমি আমার কর্তব্য করে গেছি।'

'ইফ্ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, একটু পার্সোন্যাল কথা জিজ্ঞেস করছি। মাধবীদি কি এ ব্যাপারে সিম্প্যাথেটিক ছিলেন না?' দেবশ্রীর প্রশ্নে অপালা সামান্য বিরক্ত হল। এত জেরা করার দরকার কী?

অভিজিৎ উত্তর দিলেন, 'ওর ইস্যুটা অন্য ছিল। ওর পক্ষে আমার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেপ্ট করা ডিফিকাল্ট ছিল। পরে তো আমরা ভালো রেসিডেনশিয়াল নেবারহুডে ছোট্ট বাড়ি কিনে চলে এসেছিলাম। কিন্তু ততোদিনে সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে। আমারই জেদ। তখন প্রচণ্ড সেভিং করছি। কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনে বাবার ফ্যামিলিকে দেখিয়ে দেব, কত ভালোভাবে থাকা যায়। এখানেও বাড়ি কেনার জন্যে ডাউন পেমেন্টের ডলার জমাচ্ছি। সব মিলিয়ে যেন একটা জেদের বশে চলেছিলাম। মাধবীকে নিয়ে কোথাও ভেকেশনে যাইনি। নিউইয়র্কে কোনো থিয়েটার, ব্রডওয়ে-শো দেখতে যাইনি। একটা নতুন গাড়িও কিনিনি। আর সত্যি বলতে কি, তোমাদের মতো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের অ্যাফ্লুয়েন্সও আমার ছিল না। সব মিলিয়ে মাধবী আর অ্যাডজাস্ট্ করতে পারছিল না। আই ডোন্ট ব্লেম্ হার।'

অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে। অভিজিৎ এর সঙ্গে দুপুরের খাওয়া সেরে নেওয়া হল। একতলার গেস্টরুমে ওঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। অভিজিৎ ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে মৈনাক সকলকে নিয়ে পেছনের বাগানের ডেক্ এ গিয়ে বসল। ওদের স্ত্রীদের মধ্যে মন্দিরার গাছপালার রেণু থেকে অ্যালার্জি হয়। ও ফ্যামিলিরুমে "নিউইয়র্ক টাইম্স্" নিয়ে বসল। যদি অভিজিতের কোনো দরকার হয় মন্দিরা খেয়াল রাখবে।

বসন্তের দুপুরে রোদের তাপ নেই। কাঠের ডেকের ধার ঘেঁসে ঘন সবুজ ঘাসে নীল টিউলিপ মাথা তুলেছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় বাগানের শেষপ্রান্তে ঝরে পড়ছে সাদা, গোলাপি চেরি ফুলের পাপড়ি। দূর থেকে ঘাস কাটা যন্ত্রের মৃদু শব্দ ভেসে আসছে।

ছুটির দুপুরে এমন একটা পরিবেশ। অথচ কেউ যেন গল্পগুজবের মেজাজে নেই। মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। কখনো অভিজিৎদার সিদ্ধান্ত নিয়ে। কখনো এই অভিবাসী জীবনে অন্য মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা অথবা নিজেদের ভূমিকা নিয়ে।

চা এলো। ডাক্তার মলয় বোস চা-এর কাপ হাতে নিয়ে কথা শুরু করলেন, 'অভিজিতের যে দেশে আত্মীয়দের সঙ্গে কনট্যাক্ট আছে, তোমরা জানতে? হঠাৎ কোথা থেকে জামাই গজিয়ে উঠল? ওর এখন যা ফিজিক্যাল কন্ডিশন, কেউ গায়ে পড়ে ওখানে রেস্‌পনসিবিলিটি নিতে চাইছে, দ্যাট ডাজ নট্ সাউন্ড ভেরী নরম্যাল। তোমরা একটু খোঁজখবর নাও, সে কেমন আত্মীয়? তার কোনো ইন্‌হেরিটেন্সের স্বার্থ আছে কিনা?'

মৈনাক উত্তর দিল, 'প্রথমে তো ওঁর কাছেই শুনলাম। ওঁর যে নিজের বোন ছিল, এ নাকি তাঁর জামাই। বোন এখনো বেঁচে। মেয়ে, জামাই এর কাছে থাকেন। অভিজিৎদার সঙ্গে আগে তাঁর চিঠিপত্রে, এখন ফোনে যোগাযোগ রয়েছে। তবে মহিলা খুব অসুস্থ।'

অপালা বলল, 'আমরা ওঁর মেয়ে, জামাইকে কল্ করেছিলাম। তারা বলছে অভিজিৎদা নাকি ক্যান্সারের রেমিশন হওয়ার পর থেকে বোনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

ডঃ বোস বললেন, 'তা হতে পারে। কিন্তু অভিজিৎ ওখানেই থেকে যাবে, একথা কি ওরা বলছে?'

'অভিজিৎদা নিজেও তো তাই ভাবছেন।'

দেবশ্রী জিজ্ঞেস করল, 'অভিজিৎদাকে ওরা কোথায় নিয়ে রাখবে? নিজেদের বাড়িতে? এরকম পেশেন্টকে কীভাবে টেক্-কেয়ার করতে হয়, ওদের কোনো ধারণা আছে? ওই মেয়ে, জামাইকে উনি কখনো চোখেও দ্যাখেননি। সেবা করার নাম করে ওঁকে শেষ পর্যন্ত কি অবস্থায় রাখবে কে জানে?'

সুরথ অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার দেবশ্রীর কথায় সায় দিল, 'অভিজিৎদা এখানে যা সোস্যাল সিকিওরিটি বেনিফিট পান, দেশে থাকলে মাসে এক লাখ টাকা। তাছাড়া নিজের সেভিংস রয়েছে। একজন লোকের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। উনি হয়তো ভাবছেন ওইসব টাকাকড়ি খরচ করে একটা ফ্যামিলির মধ্যে থাকবেন। বাট ইজ ইট রিয়েলি পসিবল্? এত বছর বাদে দেশে ফিরে একটা অচেনা এন্‌ভায়রনমেন্টে মানিয়ে নিতে পারবেন? বিশেষ করে এই বয়সে!'

সন্ধ্যেবেলার আলোচনায় এসব প্রশ্নের উত্তর অভিজিৎ নিজেই দিচ্ছিলেন। বোনকে দেখতে যেতে চান। তার মেয়ে, জামাই এর সংসারে নয়, কয়েকদিনের জন্যে গেস্টহাউসে থাকবেন। তারপর দমদমে ওদের ফ্ল্যাট এর কাছাকাছি একটা ওল্ড-এজ হোমে চলে যাবেন। বোনের মেয়ে জামাই খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা করছে। অসুস্থ শরীরে এত ডিপেনডেন্ট হয়ে পড়ছেন যে একা থাকতে আর ভরসা পাচ্ছেন না।

ডঃ বোস বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'ইন্টারন্যাশন্যাল ট্র্যাভল্ করার মতো শরীরের অবস্থা তোমার নয়। আর, এটা তো জানো, ইন্ডিয়ায় অসুস্থ হলে আমেরিকার মেডিকেয়ার ইন্সিয়োরেন্সের কোনো বেনিফিট পাবে না। তোমার ক্যান্সার হয়তো রেকার করবে না। কিন্তু, অ্যানুয়্যাল চেক-আপ এ থাকতে হবে। তোমার বয়স, হার্ট কন্ডিশন, ব্যাক্ ইনজুরির এফেক্ট্, এতগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে.....'

অভিজিৎ মাথা নাড়লেন, 'আই এগ্রি উইথ ইউ। এই পয়েন্টগুলো বাদ দিলে কলকাতায় হয়তো আমার খারাপ লাগবে না।'

মন্দিরা মানতে চাইল না, 'আপনি তো বোনের কাছে থাকছেন না। যদি সেই ওল্ড-এজ হোমেই থাকতে হয়, তো এখানকার নার্সিংহোম, অ্যাসিস্‌টেড লিভিং ফেসিলিটির সঙ্গে কি ডিফারেন্স হল? জীবনের পঞ্চাশটা বছর যেখানে কাটালেন, যে সমাজের মধ্যে রইলেন, আজ সেখানেই যদি নিজেকে লোন্‌লি মনে হয়, দমদমের ওল্ড-এজ হোমে গিয়ে নতুন করে কার সঙ্গ পাবেন? আমাদের মানসিকতা বদলে গেছে অভিজিৎদা!'

মন্দিরার কথায় অভিজিৎকে কেমন যেন বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। মৈনাক প্রসঙ্গ বদল করার জন্যে সবাইকে ডাইনিং রুমে পাঠাল। অপালা ডিনারের জন্যে চাইনিজ

খাবার আনিয়েছে। এবার বেশি আলোচনা বন্ধ করা দরকার। অভিজিৎ কাল ফিরে যাবেন। অপালা এর মধ্যে ওঁর ব্লাডপ্রেশার নিয়েছে। ওঁর পা ফুলে যাচ্ছে। কাল ডাক্তারকে জানাতে হবে।

'সানরাইজ'-এ ফেরার পর কয়েকদিন কেটে গেল। অপালা অভিজিৎ-এর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে, ডায়েটিশিয়ানের মত নিয়ে মাঝে মাঝে ডাল, তরকারি, মাছের ঝোল নিয়ে আসছে। ক্লাবের "উইমেনস্ ফোরাম" এর রঞ্জনা, পৌষালিরা এসব রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে। অভিজিৎ অবাক হয়ে যান। প্রফেশন্যালি সাক্সেসফুল ব্যস্ত মেয়েগুলো তাঁর জন্যে এত সময় দিচ্ছে! ওদের মধ্যে কজনকেই বা চেনেন? অপালা হাসে, 'আপনাকে আমেরিকায় ধরে বেঁধে রাখার জন্যে ওরা রুগীর ঝোল রাঁধতে শিখে গেল।'

অভিজিতের শরীরে ক্রমশ নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। হার্টে জল জমছে। পা ফুলে যাচ্ছে। নিঃশ্বাসের কষ্ট। কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়্যার এর ওষুধপত্রে একটু উন্নতি হয়। আবার লক্ষণগুলো ফিরে আসে। রাতে ওষুধ খেয়েও ভালো ঘুম হয় না। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা। অভিজিৎ ভাবেন রুনুর সঙ্গে আর দেখা হল না। সময় থাকতে কখনো দেশে গেলাম না। রুনুও যেন আর আশা করতো না। সারাজীবন দূরে থাকতে থাকতে সম্পর্কের বাঁধন আল্‌গা হয়ে যায়। সেদিন মৈনাকদের বাড়ি থেকে ফিরে অবধি বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছে। কাদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছি? আমার সংসার ছিল না। এদের সঙ্গে এত বছরের মেলামেশা, সোশ্যাল ইন্‌টার-অ্যাকশন, সুখে, দুঃখে কাছাকাছি থাকা। সেকেন্ড জেনারেশনও আমার জন্যে কিছু করতে চায়। মৈনাকের মেয়েটা ছোট থেকে আমার কোলে কোলে ঘুরেছে। ফাদার্স-ডে-তে ওদের সঙ্গে বাইরে খেতে নিয়ে যেত। এবার অনি ছেলেমেয়ে নিয়ে আসছে। ও নিজেও তো ডাক্তার। হয়তো আমার শরীর বুঝে কাছাকাছি কোথাও লাঞ্চে নিয়ে যাবে। বাচ্ছাদুটোর জন্যে আমি কি নিয়ে যাব? নিচের গিফ্‌ট্ শপ থেকে চক্‌লেট নিতে পারি...

শুক্রবারের ফ্লাইটে অ্যাটল্যান্টা থেকে সঞ্জয় ওমি, শমীকে নিয়ে এসে পৌঁছোল। অনিকা আসবে পরদিন। রবিবার ফাদার্স-ডে'র জন্যে ফোনে অপালাকে রেস্টোরেন্টে রিজার্ভেশন করে রাখতে বলেছে। তার আগে অভিজিৎকে দেখতে 'সানরাইজ'-এ যাবে। মৈনাক মেয়েকে নিজেই এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসবে বলে দিল।

শনিবার অনিকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে মৈনাকের সেল্‌ফোন বাজল। অপালা এমার্জেন্সি ফোন পেয়ে 'সানরাইজ'-এ চলে গেছে। ফোনে সঞ্জয় আর কোনো খবর দিল না।

দুশো দশ নম্বর ঘরের কাচের জানলার বাইরে বিকেলের ম্লান আলো। অভিজিৎদার জীবনের সূর্যাস্তের মুহূর্তে নার্স, ডাক্তারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপালা। প্রবাসের এক আপনজন।

———————

অপুর ঠিকানা

শান্তি ভবনের গেটের সামনে সাইকেল রিকশা থেকে নেমে ভাড়া দেওয়ার সময় মহুয়া খেয়াল করল বটগাছটার নীচে আজ কোনো রিকশা নেই। মাঝে মাঝে এমন হয়। ফেরার সময় স্টেশনে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যায়। মহুয়া রিকশাওলাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি চারটে নাগাদ ফিরে আসতে পারবে? আমি তাহলে অ্যাডভান্স দিয়ে রাখতে পারি।'

লোকটি গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, 'ক'টার ট্রেন ধরবেন?'

'সাড়ে চারটের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে?' লোকটির হাতে কুড়িটা টাকা ধরিয়ে দিতে, সে সময়মতো ফিরে আসবে বলে সাইকেলে উঠে পড়ল।

চৈত্রের শুকনো হাওয়ায় ধূলোর ঘূর্ণি উড়ছে। মফঃস্বল শহরের শুনশান দুপুরে শান্তিভবনের ছোট বাগানে দুটো কুকুর লেজ গুটিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মহুয়াকে আধবোঁজা চোখে দেখে বার দুই ভুক ভুক করে আবার মাথাগুঁজে শুলো।

নীচের অফিস ঘরে দেখা করে মহুয়া লম্বা করিডোর পার হয়ে ওর মা-র ঘরে পৌঁছোলো। কম খরচের এই ঘরগুলোয় চারজন করে থাকেন। মহুয়া পর্দা সরিয়ে ভেতরে এলো। দুই বৃদ্ধা ঘুমোচ্ছেন, একজন বই পড়ছেন। শীলাও বোধহয় আধো ঘুমে ছিলেন। মহুয়ার চটির শব্দে পাশ ফিরে দেখলেন, 'কখন এলি? নীচের থেকে তো কেউ খবর পাঠায়নি?'

মহুয়া কাছে এল, 'আমাকে তো ওরা চেনে। একটা দরকারে তাড়াতাড়ি আসতে হল। চলো, বারান্দায় গিয়ে বসব।'

শীলা দুই ঘুমন্ত বৃদ্ধার দিকে চেয়ে বললেন, 'এখন এখানেই বোস না। বারান্দায় বড্ড গরম।'

বইপড়া মহিলা চশমার আড়ালে মহুয়াকে লক্ষ্য করছিলেন ও ভদ্রতার হাসি হাসল। এঁকে আজ প্রথম দেখছে। বৃদ্ধাশ্রমে আজকাল ঘর ভরতে দেরি হয় না। ও

মাকে তাড়া দিল, 'না, এখানে ডিসটার্ব কোরো না। ভিজিটার্স্ রুমে চলো। দেখে এলাম লোকজন কেউ নেই।'

পায়ে চটি পরতে পরতে অপ্রসন্ন মুখে শীলা বললেন, 'কে আবার ভরদুপুরে আসবে? তুই তো বিকেলে এলে পারতিস।'

মহুয়া উত্তর দিল না। কেন যে এই অবেলায় উদভ্রান্তের মতো ছুটে এসেছে, মা ওর মুখ দেখেও কিছু বোঝার চেষ্টা করল না। দিনে দিনে যেন আরও অবুঝ আর স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। আজকের ঘটনাটা শুনলে মা-র যে কি প্রতিক্রিয়া হবে, ও অনুমান করতে পারছে। তবু সামনের অনিশ্চিত দিনগুলোর কথা মা-র জানা দরকার।

দুপুরে শান্তিভবনের কাজের লোকেরা বিশ্রাম নেয়। অসময়ে লোকজনও বিশেষ আসে না। মাকে নিয়ে মহুয়া ভিজিটার্স্ রুমের এক কোণায় গিয়ে বসলো। কথা শুরু করার আগেই শীলা জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ ব্যাগ আনিসনি? আমার হরলিক্স, ঘি, চীজ, বিস্কুট সব তো ফুরিয়ে এলো। একটা ভালো সেন্ট চেয়েছিলাম। তাও আনতে ভুলে যাচ্ছিস।'

মহুয়ার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল, 'তুমি একটু চুপ করবে? শুধু নিজের কথা। একবারও তো জানতে চাইছ না কেন আমি হঠাৎ চলে এসেছি।'

শীলা অপ্রস্তুত হলেন, 'তুই না বললে জানব কী করে? কী হলটা কী?'

মহুয়া কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে উত্তর দিল, 'খুব খারাপ খবর মা। দীপংকর মারা গেছে। তিনদিন পরে জানতে পারলাম।'

শীলা চমকে উঠলেন, 'সেকি? কোথায় মারা গেল? কদিন আগে জাহাজে রওনা হয়েছিল না? তোকে কে খবর দিল?'

মহুয়ার বুক ঠেলে দীর্ঘঃশ্বাস উঠে এলো। চোখের জল মুছে মৃদু স্বরে বলল, 'জাহাজেই মারা গেছে। সিঙ্গাপুর থেকে কোন পোর্ট-এ যাচ্ছিল। ক্যাবিনের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক। দরজা খুলে কাউকে ডাকতেও পারেনি।'

'বিদেশবিভুঁই এ প্রাণটা গেল। ওর হার্টের অসুখ ছিল তুই জানতিস?'

'ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খেত। ভালোই তো ছিল। এখানে থাকলে হয়তো বেঁচে যেতো। বাড়ির লোকেরা সময় মতো হসপিট্যালে নিয়ে যেতে পারত।'

শীলা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, 'লোকটা তবু মানসম্মান নিয়ে চলে গেছে। তোর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে যদি কিছু হত, তখন কি

করতিস? ডাক্তার, হাসপাতাল করতে গিয়ে কম ঝামেলা হত? ওর বউ ছেলেমেয়ের কিছু জানতে বাকি থাকত?

'একটা মানুষ চলে গেল। এখন তোমার এসব কথা মনে হচ্ছে? আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক যাই থাক, এত বছরে সেই জীবনেই তো অভ্যস্থ ছিলাম মা।'

শীলা বললেন, 'জানি। আমাদের জন্যে ও করেওছে অনেক। তা, তুই খবরটা পেলি কখন? কেউ জাহাজ থেকে ফোন করেছিল?'

মহুয়া মাথা নাড়ল, 'না। জাহাজ থেকে শুধু ওর ফ্যামিলিকে খবর দিয়েছে। আমি ফোন পেলাম ওর এক বন্ধু পীযুষ রায়ের কাছ থেকে। গত বছর দীপংকরের সঙ্গে বম্বে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শুধু উনিই বোধহয় আমাদের রিলেশনটা জানতেন। গতবার এসে দীপংকর আমার ফোন নম্বরটা ওঁকে দিয়েছিল। আমাকেও বলেছিল কোনো এমার্জেন্সি হলে বম্বেতে পীযুষকে কনট্যাক্ট্ করতে। তখন বুঝিনি ও কোন্ এমার্জেন্সির কথা বলতে চেয়েছিল।'

শীলা উদবিগ্ন হলেন, 'এখন কী করবি মৌ? তোর জন্যে দীপংকর ব্যাংকে টাকাকড়ি রেখে গেছে? ভবিষ্যতের কথা ভেবেও তো মানুষ ব্যবস্থা করে রাখে। ওর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিস?'

মহুয়া বোঝে মা অবান্তর কিছু বলছে না। ও নিজেও কি এই বাস্তব সমস্যার কথা ভাবছে না? দীপংকর যখন আসত বেশ কিছু টাকা রেখে যেত। এবারে এসে যা দিয়েছিল সেও কয়েকমাসের খরচ। ওর নিজের গানের ফাংশন আর টিউশন মিলিয়ে মোটামুটি চলে যেত। কিন্তু মা যা আশা করছে, দীপংকর ওর জন্যে তেমন কোনো ব্যবস্থা করে গেছে বলে ভরসা হয় না।

মহুয়া মাকে সত্যি কথাটা জানাল, 'আমার অ্যাকাউন্টে কয়েক হাজারের বেশি রেখে যায়নি মা। মাঝে মাঝেই তো টাকা পাঠাত। হঠাৎ করে চলে যাবে নিজেই কি জানত?'

'কেন? তোর ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি কেন? বউ, ছেলেমেয়ের জন্যে সর্বস্ব রেখে গেল না? তুই সময় থাকতে এসব কথা তুলিসনি কেন? কম দিনের সম্পর্ক? আমি কথা বলতে গেলে অশান্তি করতিস। দীপংকর এসে থাকলে তোদের অসুবিধে হয় বলে আমাকে এখানে পাঠালি!'

মা-র কথার মাঝখানে মহুয়া উঠে দাঁড়াল। ব্যাগ থেকে কয়েকশো টাকা বার করে সামনের টেবিলে রেখে বলল, 'চিৎকার করে লোক জড়ো কোরো না।

তোমাকে এখানে থাকতে হবে। টাকা রেখে যাচ্ছি। যা দরকার আনিয়ে নিও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

শীলা পাথরের মতো বসে থাকলেন। মহুয়া বাগান পার হোয়ে গেটের বাইরে এসে দেখল রিকশাওলা ফিরে এসেছে। স্টেশনের পথে যেতে যেতে ও মা-র কথা ভাবছিল। একজীবনে মা কতভাবেই ওকে চালানোর চেষ্টা করল। সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত তিক্ততায় এসে ঠেকেছে। সামনে এখন অনেক খরচ। তবু মাকে আর নিজের সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না। মাথার মধ্যে অজস্র চিন্তা দানা বাঁধছে। মহুয়া অনুভব করছিল একটা ঘটনায় ওর জীবনের ভিত নড়ে গেছে। আজ আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আত্মীয় স্বজন থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন হতে হতে রক্তের সম্পর্কের যোগসূত্রগুলো ক্রমশ আলগা হয়ে গেছে।

ট্রেনে উঠে মহুয়ার খেয়াল হল আজ গানের ছাত্রীদের আসতে বারণ করা হয়নি। বাড়ি পৌঁছোতে দেরি হয়ে যাবে। বম্বেতে পীযুষ নামে ভদ্রলোককে একবার ফোন করা যেতে পারে। এমন তো হতে পারে দীপংকর ওর জন্যে বন্ধুর কাছে কোনো ইনস্ট্রাকশন রেখে গেছে। নয়তো সেবার এসে এমার্জেন্সির কথা বলেছিল কেন? অপুর হস্টেলের খরচের জন্যে মহুয়ার চিন্তা নেই। তবু, নিজের বাকি জীবনটা পড়ে আছে। মা-র খরচ চালাতে হবে।

এইসব দুশ্চিন্তার মাঝে মহুয়া যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, তবে কি শুধু টাকার জন্যে দীপংকরকে আঁকড়ে ধরেছিলাম? বয়সে বড় একজন বিবাহিত মানুষ, যে কখনো নিজের সংসার ভাঙবে না, সব জেনেও তো বছরের পর বছর তাকে সঙ্গ দিয়েছি। কবে ওদের জাহাজ আসবে বলে অপেক্ষায় থাকতাম। ফিরে যাওয়ার সময় এলে মনখারাপ হত। কখনো মনে হয়নি দীপংকর আমাকে টাকা দিয়ে ভোগ করছে। ও আমার গান ভালোবাসত। রিসর্টে বেড়াতে গিয়ে কত রাত পর্যন্ত গান শুনত। ওর বিবাহিত জীবনে কোথাও কোনো অভাববোধ ছিল। আমার তো হারাবার মতো কিছুই ছিল না। সেই কবে গানের ফাংশানে আমাদের দেখা হয়েছিল। তারপর এত বছরের বোঝাপড়ার সম্পর্ক থেকে কেমন এক অধিকার বোধ জন্মেছিল। সেইজন্যেই কি দীপংকরের কাছ থেকে টাকাকড়ি পাওয়ার আশায় পীযুষকে ফোন করার কথা ভাবছি? কিন্তু ভদ্রলোক তো নিজে থেকে কিছু বলেননি। মহুয়া ভেবে নিল ও আর বম্বেতে ফোন করবে না।

চেরি হিল্‌স্‌ এর "প্রবাসী" ক্লাবের পিকনিকের দিন ভোরের দিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হল। একটু বেলায় রোদ উঠল। মেরীল্‌ পার্কের কাছাকাছি পৌঁছোতে মাইকে হিন্দি গান ভেসে এলো। অভীক পার্কিং লটে গাড়ি রাখার পর ওমি আর শমী নেমে মাঠের দিকে ছুটল। অভীক বলল, 'বাবাঃ এর মধ্যে এত লোক এসে গেছে।' অস্মিতা দূরে কাকে দেখে হাত নাড়তে নাড়তে হাসল, 'নিউ জার্সি এখন আই.টি. কোম্পানির বাঙালিতে ভরে গেছে। পুজোর সময় কত ইয়াং গ্রুপ আসে দ্যাখো না।'

'ভালো তো। ক্লাবে মেম্বারশিপ বাড়ছে। ওদের একটা দল অ্যাক্‌টিভ হয়েছে বলে আমাদের আর খাটতে হচ্ছে না।'

চাঁদা দেওয়ার পর ব্রেকফাস্টের লুচি তরকারি খেয়ে অভীক এধার ওধার খানিক আড্ডা দিয়ে বেড়াল। দূরে ওমি, শমীদের মতো ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কয়েকটা খেলার প্রতিযোগিতা হচ্ছে। অস্মিতা কাঠের টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে একদল মহিলার সঙ্গে স্যালাড কাটতে ব্যস্ত। ক্রিকেট খেলার একটু দেরি আছে দেখে অভীক এক ক্যান্‌ বীয়র নিয়ে অজয়দা, সুব্রতদাদের পাশের চেম্বারে এসে বসল। হঠাৎ ওর কানে এলো অজয়দা বলছেন, 'তোর পট্‌কাকে মনে আছে? একবার মালয়েশিয়া থেকে এসেছিল?'

সুব্রতদা উত্তর দিলেন, 'মেক্যানিক্যালের দীপংকরের কথা বলছিস? একবার এখানে এসেছিল না?'

'হ্যাঁ। মালয়েশিয়া থেকে ওদের শীপ এসেছিল। সে সময় আমাদের কাছে দুদিন ছিল। এবার দেশে গিয়ে শুনলাম ও মারা গেছে।'

'কি হল? হার্ট অ্যাটাক না ক্যান্সার?'

অজয়দা বললেন, 'ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। জাহাজেই মারা গেছে। পরদিন ওর ক্যাবিনে ডেডবডি পাওয়া গেল।'

'ভেরী স্যাড। দীপংকরের ফ্যামিলির কি অবস্থা? তুই কনট্যাক্ট্‌ করেছিলি?'

'নাঃ। ইনফ্যাক্ট্‌ দীপংকরের বউদিকে একবারই দেখেছিলাম। আমরা কলকাতায় যেতে ওরা তাজ বেঙ্গলে ইনভাইট করেছিল। তারপর অনেকদিন আর কন্ট্যাক্ট নেই। দীপংকরও আর ফোন-টোন করত না।'

দূর থেকে মুখে চোঙ্গা নিয়ে তথাগত ডাকাডাকি করছে, 'বিমানদা, সূর্যদা, অভীকদা ক্রিকেট শুরু হচ্ছে। ইমিডিয়েটলি ওদিকের মাঠে চলে যান।'

এখানে বাঙালি/অবাঙালি মিলিয়ে একটা ক্রিকেট টিম হয়েছে। আজ তাদের

মধ্যে খেলা হচ্ছে। অভীক আম্‌পায়ার। ওর সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত, অজয়রাও খেলা দেখতে চললেন।

লাঞ্চ ব্রেকে ওরা ফিরে এলো। বার-বি-কিউ গ্রিলের কাছে এসে গরম তন্দুরি চিকেন, নান আর স্যালাড নিয়ে ধারে কাছের বেঞ্চগুলোয় গিয়ে বসল। ওমি আর শমী তরমুজ খেতে খেতে খবর দিয়ে গেল ওরা একটা জলার ধারে মাছ দেখতে যাচ্ছে। সঙ্গে অপরাজিতা আন্টি আর শম্পা আন্টি থাকবে।

অভীক তাও বলল, 'মাকে জিজ্ঞেস করে যাও।' তরমুজের রস লাগা টিশার্টে হাত মুছতে মুছতে শমী বলে গেল, 'মা জানে।'

ওদের মা তখন গানের তালে তালে মিউজিক্যাল চেয়ার দখল করতে ব্যস্ত। ক্যাসেটে বাজছে—যব সে তেরে ন্যায়না.....। হুট করে গান থামছে। চেয়ার নিয়ে টানাটানি। অস্মিতার সিরিয়াস্ মুখে হেঁটে যাওয়া দেখে অভীকের হাসি পাচ্ছিল। ও প্রাইজ এর জন্যে খুব লড়ে যেতে পারে। জিতলে একটা চীনে মাটির কফিমাগ্ টাগ্ নিয়ে বাড়ি যাবে। "টাগ্ অফ্ ওয়ার" এ তো নির্ঘাৎ ঢুকবে। জিতলে হয়তো আবার একটা কফি মাগ।

পিকনিকের মাঠে শেডের নীচে লম্বা বারান্দায় পোর্টেব্‌ল্ উনুনে পোলাও মাংস রান্না হচ্ছে। ভাড়া করা রাঁধুনি রতন আর ওর বউ এর মাথায় সাদা কাপড়ের "শেফ্" এর টুপি। পেটে এপ্রন বেঁধে বিরাট বিরাট বাসনে খুন্তি নাড়ছে। একদল মহিলার আড্ডাও সেখানে।

সূর্যাস্তের পরে পিকনিক শেষ হল। ডিনারের শেষে খেলার প্রাইজ টাইজ নিয়ে লোকেরা বাড়ি ফিরছে। "টাগ্ অফ্ ওয়ার" এর সময় অস্মিতা মোটাদের দলে গিয়ে ভিড়েছিল। শেষপর্যন্ত দড়ি ছিঁড়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে একশা কাণ্ড। ওর ক্যাল্‌কুলেশন অনুযায়ী একটা প্রাইজ এবার কম হল।

রান্নার বাসনপত্র মাজা, মাঠ পরিস্কার করার জন্যে দুজন মেক্সিক্যান লোক ভাড়া করা হোয়েছিল। ওদের কাজকর্ম মিটতে মাঠ প্রায় ফাঁকা হয়ে এলো। অজয় বসুর স্ত্রী ইন্দ্রানী অস্মিতাকে বললেন, 'একবার আমাদের বাড়িতে ঘুরে যাও। বাগানের তরকারি দেব। তোমার ডিভিডিগুলোও ফেরৎ দেব।'

ওঁদের বাড়ি হাই-ওয়ে থেকে দূরে নয়। অভীকদের ফেরার পথে পড়বে। অস্মিতা জিজ্ঞেস করল, 'যাবে?'

অভীক উত্তর দেওয়ার আগেই অজয় গাড়ির কাঁচ নামিয়ে ডাকলেন, 'চলে এসো। কফি খেয়ে যাবে। সুব্রতরাও যাচ্ছে।'

আধঘণ্টার মধ্যে সবাই অজয়-ইন্দ্রানীর বাড়িতে পৌঁছে গেল। ইন্দ্রানী বাগানের লাউ, কুমড়ো তুলে রেখেছিলেন। ওঁর কথায় অস্মিতা আর সুব্রতর স্ত্রী মীনাক্ষী বাগানের মুকিনি, স্কোয়াশ, বেগুন, টমেটো, কাঁচা লংকা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে ভরে নিল। কফি মেশিন চালিয়ে রান্নাঘরে গল্প শুরু হল। ওমি, শমী আইসক্রিম খেতে খেতে ফ্যামিলিরুমে টিভি দেখছে।

অভীক আর সুব্রতকে নিয়ে অজয় বাগানে বসলেন। তখন অন্ধকার হোয়ে এসেছে। পিকনিক নিয়ে দু-চার কথা হল। গার্ডেন চেয়ারে মাথা হেলিয়ে অজয় যেন অন্য কথা ভাবছেন। একসময় সোজা হয়ে বসে বললেন, 'দীপংকরের ব্যাপারটা মাথা থেকে যাচ্ছে না। ইন্দ্রানীর তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। সেবার আমাদের কাছে বেড়াতে এলো। বউ ছেলেমেয়ের কথা বলল। জাহাজের চাকরিতে ফ্যামিলি ছেড়ে থাকতে হয়। ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্যে বউ আর ওর সঙ্গে ট্র্যাভ্‌ল্ করে না....কত কথা বলেছিল! স্ট্রেঞ্জ! মানুষকে বোঝা যায় না।'

সুব্রত বললেন, 'পট্‌কা তো মরেই গেছে। তোর আর বোঝাবুঝির কী আছে?'

'নাঃ তা নয়। তবে অবাক হয়েছি কেন জানিস? সেবার দীপংকর এসে ওর জাহাজের চাকরিতে বউ ছেলেমেয়েকে মাসের পর মাস ছেড়ে থাকতে হয় বলে, কত দুঃখ করে গেল। অথচ তখন ও অলরেডি কলকাতার এক মহিলার সঙ্গে ইন্‌ভলভ্‌ড। হি ওয়াজ লীভিং আ সিক্রেট প্যারালাল লাইফ্'।

হঠাৎ খেয়াল হতে অজয় অভীককে হেসে বললেন, 'সরি, কফি খেতে ডেকে বাজে গল্প শুরু করেছি। আসলে আমাদের এই মধ্যবয়সে এক্‌স্ট্রা ম্যারিট্যাল অ্যাফেয়ার্সের কথা শুনলে একটু অবাক লাগে। এত রেসপন্‌সিবিলিটি, প্রি-অকুপেশন, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার স্বপ্ন। এর পাশাপাশি আর একটা লুকোনো জীবন? কি জানি? রিলেশনশিপের মধ্যে ভালোবাসা যদি না থাকে, লয়্যাল্‌টি যদি না থাকে, সে কেমন বিবাহিত সম্পর্ক?'

অভীক ভাবছিল কথাটার উত্তর দেবে কিনা। তার আগেই সুব্রত জিজ্ঞেস করলেন, 'দীপংকরের এসব খবর তুই পেলি কোত্থেকে?'

'গতবার বম্বে গিয়ে পীযুষের কাছে শুনলাম। দীপংকর নিজেই ওকে

বলেছিল। বেশ কবছর ধরে কলকাতার এক গানের আর্টিস্টের সঙ্গে ইনভল্‌ভড্‌। যখন ছুটিতে আসত তাকে নিয়ে রিসর্টে বেড়াতে যেত। বম্বের কোন হোটেলে হঠাৎ পীযুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে দীপংকর সে মহিলার সঙ্গে ইনট্রোডিউসও করিয়ে দিয়েছিল। বোধহয় তারপরে পীযুষকে সব কথা বলেছিল।'

অভীক জিজ্ঞেস করল, 'হাউ অ্যাবাউট হিজ ফ্যামিলি? এত বছরে তারা কিছু জানতে পারেনি?'

ইন্দ্রানী কফির ট্রে নিয়ে বাইরে এলেন। মীনাক্ষীর হাতে এক প্লেট পেস্ট্রি। অস্মিতা গেছে কাছাকাছি ভারতীয় দোকানে পোস্ত আর হাতে গড়া রুটি কিনতে। ইন্দ্রানী অভীকের শেষ কথাটা শুনতে পেয়ে বললেন, 'না, ফ্যামিলি তো সব শেষে জানতে পারে। জানলেও বিশ্বাস করতে চায় না।'

অজয় কফির কাপ তুলে নিয়ে বললেন, 'পীযুষ যা বলল, লেট্‌লি দীপংকরের বউ আর বড় মেয়ে বেশ অশান্তি শুরু করেছিল। অন্যদিকে সেই মিসট্রেসও নাকি ওকে বিয়ে করার জন্যে চাপ দিচ্ছিল। কে জানে? এত স্ট্রেসড্‌-আউট হয়েই বোধহয় মারা গেল।'

অভীক জিজ্ঞেস করল, 'সেই গানের আর্টিস্টের নাম জানেন? বড় গাইয়ে নাকি?'

ইন্দ্রানী বললেন, 'না, না। আমরা তো নামও শুনিনি কিন্তু সে নাকি এমন গাইয়ে, দীপংকরকে সারারাত গান শোনাত। কি যেন নামটা বলেছিল পীযুষ?' অজয় বললেন, 'পিয়ালী না মহুয়া, ঠিক মনে পড়ছে না।'

অস্মিতার গলার আওয়াজ পেয়ে অভীক বাড়ি যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। ইন্দ্রানী বললেন, 'আগে কফিটা শেষ করো। সঙ্গে একটা পেস্ট্রি খাও। অস্মিতা, তোমার কফিও এখানে দিয়েছি।'

অস্মিতা বলল, 'আর বসব না ইন্দ্রানীদি। বাচ্ছারা টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। আমার কফি পেপার কাপ-এ নিয়ে নিচ্ছি। গাড়ি তো অভীক চালাবে। ঠিক আছে, দুটো পেস্ট্রিও নিয়ে যাচ্ছি'—অস্মিতা রান্নাঘর থেকে পেপার কাপ এনে কফি ঢালতে ঢালতে খুব হাসছিল।

অভীকও হাসল, 'আর তোমার কী কী নেওয়া বাকি থাকল? লাউ, কুমড়ো নেওয়ার নাম করে ঢুকেছিলে।'

অভীকদের সঙ্গে সুব্রত, মীনাক্ষীও ড্রাইভওয়েতে গিয়ে নিজেদের গাড়িতে

উঠলেন। ওমি, শমীর ঘুম পেয়ে গেছে। অস্মিতা বলল, 'বেশ রাত হয়ে গেল। কাল সকালে আবার ওমির সকার প্র্যাক্‌টিস। তুমি উঠতে পারবে, না আমি নিয়ে যাব?'

অভীক অন্যমনস্কের মতো বলল, 'আমাকে ডেকে দিও। আমি নিয়ে যাব।'

বাড়ি পৌঁছোতে রাত দশটা বাজল। ওমি, শমিকে ঘুমোতে পাঠিয়ে অস্মিতা স্নান সেরে নিল। অভীক ততোক্ষণে অন্য বাথরুমটায় ঢুকেছে। শাওয়ারের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।

অস্মিতা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল কাল সকাল থেকে কী কী করার আছে। ওমির সকার প্র্যাকটিস্, ক্যারাটে লেসন, শমীর নাচের স্কুল, সন্ধ্যেবেলায় চুমকিদের বাড়ি গেট-টু-গেদার। এখনো গিফ্‌ট্ প্যাক করা হয়নি।.....

অভীক স্নান সেরে এসে বলল, 'তুমি শুয়ে পড়ো। আমি একটু নিউজ শুনে আসি।'

অস্মিতা হাই তুলল, 'অনেক রাত হল। কাল আবার সকালে ওঠা। তোমার টায়ার্ড লাগছে না?'

'বেশি দেরি করব না। জাস্ট্ এগারটার নিউজটা শুনে আসছি। কাল আটটায় ডেকে দিও।'

অস্মিতার ক্লান্ত লাগছিল। সারাদিন ছুটোছুটি করে পায়ে ব্যথা করছে। টাগ্-অফ্-ওয়ারের সময় যা পড়া পড়েছে। কোত্থেকে যে একটা পচা দড়ি এনেছিল? পা-টা মচকেছে কিনা কে জানে? অভীক ঘরে এসে দেখল অস্মিতা তখনো জেগে। বেড-সাইড ল্যাম্প জ্বেলে পায়ের অ্যাংক্‌ল্ পরীক্ষা করছে।

'কী হল? পায়ে লেগেছে নাকি? সারাদিনে বোধহয় কোনো রেস্ বাদ দাওনি?'

অস্মিতা কাতর হল, 'বেশ ব্যথা করছে। দ্যাখো তো একটু ফুলেছে না?'

অভীক ওর পায়ে হাত রাখল, 'একটু ফুলেছে মনে হচ্ছে। 'বেন-গে' লাগিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে দুটো 'অ্যাড্‌ভিল্' খাও।'

অস্মিতার পায়ে ওষুধ লাগিয়ে, পেইন্ কিলার দেওয়ার খানিকক্ষণ পরেও ওর ঘুম আসছিল না। অভীককে বলল, 'তুমি ঘুমোও না। উঃ কাল আবার সকাল থেকে পর্ব শুরু হবে। বাচ্ছাদের এক্সট্রা কারিক্যুলার অ্যাক্‌টিভিটিস্ করাতে গিয়ে উইক্-এন্ডেও বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে পারি না।'

অভীক ওর পিঠে হাত রাখল, 'বকবক বন্ধ করে ঘুমোতে চেষ্টা করো।

উইক্-ডে তে আমরা রাত পর্যন্ত মুভি দেখিনা? পরদিন ভোরে উঠে অফিস যাই। ওমিকে সকারে নিয়ে যাওয়া কি বিগ্‌ডীল? এই বয়সে না পারলে আর কবে পারব?'

সে রাতে অস্মিতা ঘুমিয়ে পড়ার পরেও অভীক কতক্ষণ জেগে রইল। অজয়দার শেষ কথাটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। নামটা পিয়ালী না মহুয়া ওঁর মনে পড়ছিল না।

অস্মিতা কিছু শোনেনি। তাহলে বাড়ি ফিরে জিজ্ঞেস করত। ওমি, শমীর সামনে এসব কথা হয় না। অস্মিতা চায়না এখনই ওদের কাছে অপুর কথা বলা হোক। ওর মনে হয়, কলকাতায় ওদের একজন স্টেপ ব্রাদার আছে শুনলে ওমি, শমী মনে খুব কষ্ট পাবে। হয়তো বাবার ওপর রাগ হবে, অভিমান হবে। লুকিয়ে রাখার কিছু নেই। তবু আরও কিছুদিন যাক।

অভীক বোঝে ওদের চারজনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাঝে অপুর জন্যে কোথাও এতটুকু জায়গা নেই। অথচ মহুয়ার সঙ্গে অভীকের কয়েকটা বছরের তিক্ততার স্মৃতি, অপুকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কোর্টে কাস্টডি ফাইট, সবই তো অস্মিতা জানে। অভীক এতবছর ধরে অপুর জন্যে চাইল্ড-সাপোর্টের টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছে। অস্মিতা সে নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। কলকাতায় গিয়ে অভীক যখন অপুর সঙ্গে দেখা করে, অস্মিতা ওর খবর নেয়। তবু নিজে থেকে কখনো অপুকে দেখতে চায় না। অভীক ওকে সঙ্গে যাওয়ার কথা বললে, অস্মিতা বোঝাতে চেষ্টা করে, আমি ওমি, শমীর কাছে মিথ্যে কথা বলে বেরোতে পারব না। তুমি ছেলের সঙ্গে নিজের মতো করে সময় কাটাও। সে তোমাকে সারাবছর দেখতে পায় না। মনের ইচ্ছে, অনিচ্ছের কথা বলতে পারে না। আই থিংক্ হি নীডস্ ইয়োর ইমোশন্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড সাম্ প্রাইভেসি। মাঝে মাঝে অভীকের সন্দেহ হয়, অস্মিতা মন থেকে কথাগুলো বলে তো? নাকি এখনো নিজেকে একজন টিন্-এজার ছেলের স্টেপ মাদার বলে ভাবতে পারে না। কিন্তু আজ অজয়দার কাছে ঘটনাটা শোনার পর থেকে মন এত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। অপুর জন্যে এবার ডিসিশন নেওয়া দরকার। কলকাতায় দাদাকে ফোন করে দেখতে হবে। কিন্তু অস্মিতাকে আগে না জানিয়ে অভীক কিছু করতে চায় না। ও সেরকম জেদি, স্বার্থপর নয়। আজ হোক, কাল হোক, একদিন যে অভীক ছেলেকে এদেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে, অস্মিতা তা ভালোভাবেই জানে। আজ আর ওর বাধা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। শুধু ওকে একটু সময় দেওয়া দরকার।

ওমি, শমীকে বোঝানোর দায় তো একা অস্মিতার নয়। অভীক কি নিজেই ওদের বলবে? ছয় আর আট বছরের দুটো ছেলেমেয়েকে কতটুকু বলা যায়? ওদের ছোট্ট জীবনে ড্যাড্ মানে এক অখণ্ড অধিকার। ওরা কি অপুর কথা শুনতে চাইবে? বিশ্বাস করতে পারবে? বাবার ওপরেও কি বিশ্বাস হারাবে? ওমি, শমীর সেই বিস্মিত ব্যথাহত মুখ, ভাবতেই নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছিল।

ভোরের আলোয় ঘরের অস্পষ্ট অন্ধকার কেটে যেতে অভীক নীচে নেমে এলো। টিভি খুলল কিছু দেখার নেই। টেবিলে ম্যাগাজিন, গতকালের না পড়া খবরের কাগজ পড়ে আছে। অভীক ছুঁয়ে দেখল না। এত অশান্ত মন নিয়ে কোনো কিছু ঠিকমতো চিন্তা করতে পারছিল না। ইচ্ছে হোচ্ছিলো তাড়াতাড়ি সকাল হোক। সবাই ওকে ঘিরে বসুক। ছেলে মেয়েকে ও নিজেই জানাবে।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে অস্মিতা নেমে এসে বলল, 'এত সকালে উঠে পড়লে?'

অভীক এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'পায়ের ব্যথা কমেছে?'

অস্মিতা মাথা নেড়ে রান্নাঘরে চা করতে চলে গেল। ফিরে এসে দেখল অভীক একভাবে সোফায় শুয়ে আছে। টিভিতে সকালের খবর, আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের ওঠানামার খবর, কিছুই দেখছে না। টেবিলে চা রেখে অস্মিতা পাশে বসল, 'তোমার কি শরীর খারাপ? নাকি আবার ঘুমের প্রব্‌লেম হচ্ছে?'

অভীক উঠে বসল, 'নাঃ, শরীর ঠিক আছে।'

'মন ভালো নেই বোধহয়?'

অভীক চমকে উঠল, 'কি করে বুঝলে?'

'জানি না। কাল থেকেই তোমাকে একটু ডিস্‌টার্বড্ মনে হচ্ছিল। কি হয়েছে বলো তো?'

'কাল কেন জিজ্ঞেস করলে না?'

'পায়ের ব্যথার জ্বালায় ভুলে গিয়েছিলাম। এনি ওয়ে, তুমি কি কোনো কারণে বেশি চিন্তা করছ? অফিসের প্রবলেম?'

অভীক মাথা নাড়ল, 'সে সব কিছু নয়। অস্মিতা, এবার মনে হয়, আমাদের একটা ডিসিশন নিতে হবে। আর দেরি করা যাবে না।'

অস্মিতা জানতে চাইল, 'কীসের ডিসিশন?'

'ওমি, শমীকে এবার অপুর কথা বলে দেওয়া দরকার। এতদিন ধরে লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়।'

অস্মিতার মুখ বিবর্ণ দেখাল, 'এখনই বলে দেবে? বাচ্ছাদুটোর কি রি-অ্যাক্‌শন হবে ভাবতে পারছ? দে উইল্ বী ডেভ্যাস্‌টেটেড্!'

'জানি। আমার নিজেরও কি কষ্ট হচ্ছে না। তবু, সত্যি কথা জানিয়ে দেওয়া ভালো। পরে জানলে আর আরও হার্ট হবে। আমরা দিনের পর দিন ওদের মিথ্যে বলেছি। হয়তো সেই কারণে আমাদের আর বিশ্বাস করতে চাইবে না। রেস্‌পেক্ট করবে না। অস্মিতা, যা বলছি বোঝার চেষ্টা করো। এমন তো নয়, ওরা স্কুলে কোনো ডিভোর্সড্ পেরেন্টদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশে না। কারুর স্টেপ সিবলিং থাকে, তাও হয়তো জানে। আমি ওদের অপুর কথা বোঝাতে পারব।'

অভীকের কথার মধ্যে যুক্তি ছিল। অস্মিতা বুঝতে পারছিল মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। শুধু বলল, 'কয়েকদিন সময় দাও। আমি ওদের স্কুল সাইকোলজিস্টের সঙ্গে দেখা করি। আমি জানি ওদের কাউনসেলিং এর দরকার হবে। শুধু আমরা দুজনে হ্যান্ডল্ করতে পারব না অভীক। তোমাকে ওরা অন্য কারুর সঙ্গে শেয়ার করার কথা ভাবতেও পারে না। ফ্যামিলিতে যে এরকম হতে পারে, সেটা কমপ্যাশনেট্‌লি বোঝানোর জন্যেও কাউনসেলরের হেল্‌প্ দরকার।'

অস্মিতা কাঁদছিল। অভীক ওকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করল, 'ওরা কত ছোট অস্মি! অপুর কি সেই বয়স আছে যে ওদের সঙ্গে বাবার আদর ভালোবাসা নিয়ে ঝগড়া করবে? ওকে তো ছোটবেলায় কাছেই পেলাম না। নতুন করে আর কিই বা আশা করবে?'

'তুমি কি ওকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছ? ওর মা আসতে দেবে?'

ওমি, শমীর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। অভীকের গলার স্বর নীচু হল, 'পরে সব বলছি। এমন একটা সিচুয়েশন হয়েছে, ওকে আর দেশে ফেলে রাখতে চাই না।'

ওমি "হাই ড্যাড" বলে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। শমী বাবার গা ঘেঁসে সোফায় বসতে আসছিল। হঠাৎ অস্মিতাকে দেখে কাছে এলো, 'হোয়াট হ্যাপন্‌ড্ মাম্? ডিড ইউ ক্রাই? ইজ ইয়োর অ্যাংক্‌ল্ স্টীল্ হার্টিং?'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অস্মিতা কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

কলকাতায় কদিন একটানা অসহ্য গুমোটের পর শুক্রবার বিকেল থেকে প্রবল বৃষ্টি নেমেছে। জলকাদা, যানজটে শহর বিপর্যস্ত। হস্টেল থেকে বাড়ি আসার পথে অপু বাস থেকে নেমে রীতিমতো ভিজে গেল। মহুয়া নামল আরও পরে। ছাতা

খুলে ছেলেকে ডাকতে ডাকতে অপু প্রায় দৌড়ে দৌড়ে মিমিদের গাড়িবারান্দার নীচে পৌঁছে গেছে। মহুয়া ছাতা মাথায় দিয়ে জোরে জোরে হাঁটছে। দম্‌কা হাওয়ায় ছাতা প্রায় উল্টে যাওয়ার অবস্থা। কাছাকাছি এসে বলল, 'ঠিক সময় বুঝে নামল! ফেরার পথে একটা ট্যাক্সি পেলাম না।'

অপু তখন দোতলার গাড়ি বারান্দার পাশের জানলা থেকে মিমির গলা শুনছিল, 'আজ হঠাৎ চলে এলি?' মহুয়াকে দেখতে পেয়ে মিমি জানলা থেকে সরে গেল।

ছেলের হাতে ছাতা ধরিয়ে মহুয়া ব্যাগ থেকে ফ্ল্যাটের চাবি বের করে ভেতরে ঢুকল। অপু ভেজা ছাতা ছোট বারান্দায় রেখে চুপচাপ জুতো খুলল। মা যে কেন আজ হস্টেলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, স্পেশ্যাল পারমিশন করিয়ে পরীক্ষার মুখে ওকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে, অপু অনেকটাই অনুমান করতে পারছে। গত কয়েকমাস ধরে মা-র মন মেজাজ ভালো নেই। আংকল মারা গেছে বলে এত কষ্ট? অপু তো সেই দিনগুলোর কথা ভাবতেও চায় না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বৃষ্টি ধরে এল। মহুয়া খিচুড়ি ডিমভাজা তৈরি করে ছেলেকে নিয়ে খেতে বসল। বাড়ি ফিরে পর্যন্ত দুজনের মধ্যে বিশেষ কথা হয়নি। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত বুঝে অপু মিমিকে ফোন করেছিল। জানিয়ে দিয়েছে কাল কোথায় ওরা দেখা করবে। মিমিদের বাড়ির লোকজন মহুয়াদের পছন্দ করে না। বড় হওয়ার পরে কারণটা ওরা বুঝেছিল। অপু হোস্টেলে চলে যাওয়ার পরে দেখাশোনা কমে গেছে। ফোনে কথা হয়। ছোটবেলা থেকে ওর অনেক নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ মুহূর্তের সঙ্গী মিমিকে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার কথাগুলো বলা যায়। এবার একবার দেখা হওয়া দরকার। অপু বুঝতে পারছে মা, বাবার মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে।

দুটো শোবার ঘরের একটায় অপু দিদিমার সঙ্গে থাকত। ও হস্টেলে চলে যাওয়ায় দিদিমাকে মা ওল্ড-এজ হোমে পাঠিয়ে দিতে, ঘরটা এখন অপুর জন্যে গোছানো হয়েছে। বিছানায় শুয়ে ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে অপু দেখল মা ঘরে এসেছে। সামনের চেয়ারে বসে বলল, 'খুব দরকারে তোকে নিয়ে এলাম। তোর বাবা আবার কাস্টডি রাইট নিয়ে উকিলের চিঠি দিয়েছে। অথচ তোর এখনো আঠারো বছর বয়স হয়নি। শুনলাম তুই নাকি ওকে ফোন করেছিলি?'

অপু উত্তর দিল, 'আমি ফোন করিনি। জ্যাঠামশাই হস্টেলে এসেছিলেন। ওঁর মোবাইলে ফোন করে বাবা আমার সঙ্গে কথা বলেছেন।'

—'আমাকে বলিসনি তো। ওরা কি চাইছে এখন? তুই আমাকে ছেড়ে ইউ.এস.এ. চলে যাস?'

অপু সরাসরি মার চোখের দিকে তাকাল, 'বাবার ইচ্ছে আমি ওখানে কলেজে পড়ি। জ্যাঠামশাই বললেন সামনের বছর থেকে আমার জন্যে বাবা আর চাইল্ড্ সাপোর্টের খরচ পাঠাবেন না। এখানে আমাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'তোর কি ধারণা আমার সে ক্ষমতা নেই? প্রাইভেট কলেজে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে পারব না, সত্যি কথা। কিন্তু জয়েন্টে ভালো করলে যাহোক করে চেষ্টা করব। আরও কতো লাইন আছে। অপু, এখন মন দিয়ে পড়াশোনা কর।'

অপু বিরক্ত হলে—'সেটা আর করব কখন? শুধু শুধু এক্স্যামের মুখে বাড়িতে নিয়ে এলে। জয়েন্ট এন্ট্রেন্সে ভালো করা অত সোজা! আমি কোথায় কলেজে পড়ব সেটা আমাকেই ভাবতে দাও।'

মহুয়া ইদানীং ছেলের এই একরোখা ভাবটা লক্ষ্য করছিল। আজ মনে হল অভীক ওকে ভালো করে কিছু বুঝিয়েছে। নয়ত এমন উদ্ধত ভাবে উত্তর দিতোনা। ওর চোখে এখন আমেরিকা যাওয়ার স্বপ্ন। গানের টিউশন করে সংসার চালায়, এমন মায়ের ওপর ও আর আশা ভরসা রাখতে পারছে না। মহুয়া ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় অপু বলল, 'বাবা আমাকে স্যাট একস্যাম্ দিতে বলেছেন। প্রিপ্যারেশনের জন্যে বই পাঠিয়েছেন। দেখি, ফাইন্যালের রেজাল্টের ওপরেই সব ডিপেন্ড করছে।'

সারারাত বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে কখন ভোর হয়ে গেল। ঘুমের বড়ি খেলে যেটুকু আচ্ছন্ন ভাব আসে, গতরাতে তাও হয়নি। মহুয়া বিছানা ছেড়ে বসার ঘরে এলো। অপুর ঘরের দরজা বন্ধ। ছুটিতে বাড়ি এলে বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। আজ দশটায় গানের ছাত্রীরা আসবে। চা খেয়ে স্নান সেরে এসে মহুয়া দেখল কাজের মেয়ে বুল্টি প্ল্যাস্টিক মাথায় দিয়ে ঢুকে পড়েছে। সবিস্তারে রাস্তায় জল জমার বর্ণনা দিতে যাচ্ছিল, মহুয়া তাড়া দিল, 'আজ ক্লাস আছে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ কর।'

দশটা-সাড়ে দশটার মধ্যে তিনজন ছাত্রী এলো। মহুয়া হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে। অপু নিজের ঘরে তৈরি হয়ে নিল। বেরোবার সময় মহুয়া বলল, 'দুপুরে ফিরতে দেরি করিস না।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অপু মার গান শুনতে পেল -তোমার আমার বিরহের অন্তরালে কত আর সেতু বাঁধি.....

এটা মা-র প্রিয় গান। আংকল এলে শুনতে চাইত। সে লোকটা তো জাহাজের মধ্যে মরে ভূত হয়ে গেছে। মা তবু গানটা ভুলতে পারছেনা।

অপু জোরে জোরে হাঁটছে। মনের মধ্যে আবার সেই রাগ, অভিমান বিতৃষ্ণা ফিরে আসছে। তখনই মিমিকে ফোন করল, 'তুই কোথায়? আমি 'বারিস্তার' সামনে ওয়েট করছি। দেরি করিস না।'

বারিস্তায় বসে কফি খাওয়ার বেশি টাকাপয়সা অপুর পকেটে থাকে না। মিমি দুজনের জন্যে স্যান্ডউইচ্ কিনল। খাওয়া শুরু করার আগে বলল,

'বলেছিলি বিকেলে দেখা করবি? আমি তো পুপুদের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।'

অপু হাসল, 'আবার সেই সাউথ সিটি মল্? কি এত শপিং করিস?'

'কিনি আর কোথায়? দোকানগুলোয় ঘুরতে ভালো লাগে? তুই কাল অবধি আছিস তো?'

'না রে, আজ ফিরে যাব। তাই তোকে সকালে আসতে বললাম।'

'খুব পড়ছিস?'

'লাইফে আর কিছু আছে? গাদা গাদা টেস্ট, টিউশন। তাও ভাবছিস ভালো কলেজে চান্স্ পাব? মা লেক্চার দেয়, মুড়িওলার ছেলে কী করে জয়েন্টে চান্স পায়? একদিন বলেছি তুমি মুড়ির ঠোঙ্গা বানালে হয়তো আমিও ইন্সপায়ার্ড হতাম।'

মিমি হেসে উঠল, 'তুই পারিসও। সব বাড়িতেই এক অবস্থা! আমি অবশ্য বাবাকে বুঝিয়েছি কমিউনিকেশন নিয়ে পড়ব। মিডিয়ায় এখন অনেক স্কোপ্।' অপু বলল, 'মিমি, আমি হয়তো এখানে কলেজে পড়ব না। ফাইন্যালের পর বাবা ওঁর কাছে নিয়ে যেতে চাইছেন। ডিসিশনটা অবশ্য আমাকেই নিতে হবে।'

মিমির যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। গলায় আহত বিস্ময়ের স্বর ফুটল, 'আমেরিকায় পড়তে চলে যাবি? এতদিন তো কিছু বলিসনি? সব ঠিক হয়ে গেছে?'

'এখনো ফাইন্যালাইজড্ হয়নি। তোর কি মনে হয় মিমি এত বছর বাদে বাবার কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও যাব না?'

'কিন্তু তোর মা? ওঁকে ছেড়ে চলে যাবি? শুনলাম সেই ভদ্রলোকও তো মারা গেছেন।'

অপু রেগে উঠল, 'সো হোয়াট্? সব জেনে শুনে পুরোনো কথা তুলছিস

কেন? ওই লোকটার জন্যে আমার বারবার বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করত। বাবা তো তখনও নিয়ে যেতে চাইতেন। মা লিগ্যাল রাইট দেখিয়ে আটকে রাখল। তার বদলে কি দিয়েছে আমাকে? তোরা, পাড়ার ভদ্রলোকেরা কোনোদিন আমাদের অ্যাক্সেপ্ট করেছিস?'

অপুর উত্তেজনার আভাস পেয়ে মিমি বুঝতে পারছিল এবার ওদের উঠে পড়া দরকার। নীচু গলায় বলল, 'প্লিজ, এখানে আর মাথা গরম করিস না। চল্, বাইরে গিয়ে কথা বলি।'

বাইরে মেঘলা আকাশ। রোদের তাপ নেই। ওরা উদ্দেশ্যবিহীন পথে হাঁটতে হাঁটতে একসময় খেয়াল করল বাড়ি ফেরার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। মোবাইলে মিমির মা-র ফোন এলো। অপু বলল, 'আমার যাওয়ার ব্যাপারটা তুই ছাড়া কেউ জানেনা। এর মধ্যে কি ডেভেলপ্‌মেন্ট হয়,তোকে ফোনে জানাব। তোর অবশ্য কোনো ইন্‌টারেস্ট্ বুঝছি না।'

মিমি যেন চেষ্টা করে উচ্ছ্বাস দেখাল, 'কী করব? তুই আমেরিকা যাবি বলে আনন্দে নাচব? তোরও কি একবার মনে হোচ্ছে, আমাদের মধ্যে আর হয়তো কনট্যাক্ট্ই থাকবে না?'

অপু হেসে উঠল, 'বোকার মতো কথা বলিস না। ইউ.এস.এ. এখন বম্বে, দিল্লি হয়ে গেছে। বাবা প্রত্যেক বছর কলকাতায় আসেন। আমাদের দেখা হবে না কেন? মিমি, ডোন্ট্ বী সো সেন্‌টিমেন্ট্যাল।'

মিমি হাত নেড়ে বলে গেল, 'স্টেট্‌স্ এ যাওয়ার আগেই এত ইংরিজি বলিস না। পাড়ার লোক চম্‌কে যাবে। তখন আর সিক্রেট রাখতে পারব না।'

সন্ধ্যেবেলায় হস্টেলে ফেরার আগে অপু মহুয়াকে বলল, 'ভাবছি, ফাইন্যালের পরে এখানে আর পড়ব না। বাবার কাছে থেকে কলেজে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট করব। বাবা বলেছেন চার বছরের কোর্সের টিউশন ফী দেবেন। ধরে নাও সত্তর-আশি হাজার ডলার।'

মহুয়া উত্তর দিল, 'ভালো! তোর কেরিয়ার তৈরি হয়ে যাবে। আমার শুধু একটাই চিন্তা অপু। অচেনা দেশে একটা নতুন ফ্যামিলির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট্ করতে পারবি? তোর বাবার বউ আছে। দুটো ছেলেমেয়ে আছে। এতবার কলকাতায় আসে, তবু তোকে একবার দেখতেও চায়নি। আজ হয়তো তোর বাবার জেদের জন্যে মেনে নিয়েছে। তোর জন্যে ওদের সংসারে না অশান্তি শুরু হয়।'

'সেটা বাবা বুঝবেন। তাছাড়া, আমি হয়তো কলেজ ক্যাম্পাসে থাকব। এখানে যেমন হস্টেলে আছি।'

'আমার কি উপায় ছিল বল্? এইটুকু ফ্ল্যাট। তোর একটা ঘর নেই। পড়ার জায়গা নেই। মা-র ঘরে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসতে পারতিস না। একটু রাত অবধি আলো জ্বালিয়ে বই পড়লে মা ঘুমোতে পারত না। তাই নিয়ে ঝগড়া।'

অপুর স্পষ্ট মনে আছে, দিদিমার অশান্তির জন্যে নয়, আঙ্কল-এর কথাতে মা ওকে হস্টেলে দিল। আংকল যখন আসত, সন্ধ্যে থেকে মার সঙ্গে বসে ড্রিংক করত। মাঝে মাঝে রাতে মা-র ঘরে থাকত। অপু ক্রমশ নারী-পুরুষের শরীরের সম্পর্কের ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল। মা-র ওপর, আঙ্কলের ওপর প্রচণ্ড রাগ হত। একদিন বাড়িওলা এসে মাকে অপমান করল। আঙ্কলকে ধমকাল—বদমাইশি করতে হয় অন্য পাড়ায় যান। আমার বাড়িতে "কেপট" রেখেছেন, সে কথা আপনার বউ জানে? আমার পাড়ার ছেলেরা গিয়ে খবর দিয়ে আসবে।

এর পরেই মা ওকে হস্টেলে ভর্ত্তি করে এল। ছুটিতে ও যখন বাড়ি আসত, আঙ্কল বিশেষ আসত না। মিমির কাছে অপু পাড়ার সব খবর পেত। আঙ্কল বাড়ি ভাড়া বাড়িয়ে দিতে বাড়িওলা আর ঝামেলা করত না। মা প্রথমদিকে উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে পাড়ার মস্তান কেষ্ট পালকে ধরেছিল। কেষ্ট ভরসা দিয়েছিল মামলা টিকবে না। আপনার কাছে বন্ধুবান্ধব আসে। তারা ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলে তাতে ওঁর কি? দরকার হলে বলবেন, কড়কে দেব। পরে অপুকে মিমিই খবর দিয়েছিল, আঙ্কল আজকাল এ পাড়ায় বেশি আসে না। মাকে নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে যায়। কেরালার একটা হোটেলে মিমির কাকা কাকিমারা মা-র সঙ্গে আঙ্কলকে দেখেছিল। মা কলকাতার বাইরে গেলে অপুকে জানিয়ে যেত। ওর হাতে টাকাপয়সা দিয়ে আসত। বলত গানের প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছে। দিদিমা সব জানত। মাঝে মাঝে মা আর দিদিমার রাগারাগির সময় মনে হত মা-র ডিভোর্সের জন্যে হয়তো দিদিমাও দায়ী ছিল।

অপু আর পুরোনো কথা ভাবতে চায় না। সামনে শুধু পরীক্ষার প্রিপারেশন। বাবা নিশ্চয়ই আশা করছেন ওর রেজাল্ট ভালো হবে।

বিকেলে মহুয়া ছেলের ব্যাগ গুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ফিরে গিয়ে রাত্তিরের খাবার পাবি? না, বেরোনোর আগে রুটি করে দেব? ওবেলার চিকেন

আছে।' অপু বাড়িতেই খেয়ে নিল। ওকে আটটার মধ্যে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে মহুয়া যখন বাড়ি এলো, একতলার ওষুধের দোকানের ছেলেটা এসে ক্যুরিয়ারের খাম দিয়ে গেল। অভীকের পাঠানো ল-ইয়ারের চিঠি। অপু যে আর ইন্ডিয়াতে থাকতে চায় না, চিঠিতে তা জানানো হয়েছে। মহুয়া যখন ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছিল, ওর সেই পাসপোর্ট কবে এক্সপায়ার করে গেছে। তাও ল-ইয়ার চেয়ে পাঠিয়েছে। কলকাতার ইউ.এস. কন্‌সুলেট থেকে অপুকে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করবে। তার জন্যে মহুয়াকে ওর বার্থ্ সার্টিফিকেট, আরও কী কী সব কাগজ জমা দিতে হবে। আশ্চর্য। কবে অভীক এসে এত ব্যবস্থা করে গেছে, ছেলেকে বুঝিয়ে গেছে, মহুয়া বুঝতেও পারেনি। অপু নিজেও যা বলার বলে গেল। আজ কদিন ধরে বুকের কাছে চাপ ধরা একটা ব্যথা। রাতে ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম আসে। দীপংকর যে নেই, এখনো বিশ্বাস হতে চায় না। সুখে দুঃখে তবু একজন পাশে ছিল। এবার অপুও চলে যাবে। জীবনে কোথাও কোনো সম্পর্ক স্থায়ী হল না। শেষ পর্যন্ত সব কিছু মেনে নেওয়া। ছেড়ে দেওয়া। অঝোর বৃষ্টির রাতে অন্ধকারে বসে থেকে মহুয়া এক অমোঘ একাকিত্বের যন্ত্রণা অনুভব করছিল।

পরের বছর নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অপুর কলেজ অ্যাডমিশনের জন্যে অভীক সময়মতো ব্যবস্থা করছিল। অস্মিতার আশংকা, অনুমান সত্যি হলেও ওমি, শমী বাবার প্রথম বিয়ে, ওদের এক বড় ভাই আছে জানার পরে এখন আর আগের মতো মনখারাপ, কান্নাকাটি করছে না। চাইল্ড সাইকোলজিস্টের সাহায্য দরকার ছিল। অপু নামে একজনের ছোটবেলা যে খুব দুঃখে কেটেছে, ওরা তাকে বিগ ব্রাদার বলে ভালোবাসবে। সবাই মিলে হ্যাপি ফ্যামিলি হবে, ওমি, শমীকে সে সব তিনিই বুঝিয়েছেন। আমেরিকায় কত বাড়িতে নিরাশ্রয় ছেলেমেয়েরা ফস্টার চাইল্ড হিসেবে থাকে, ওমি, শমী তাও শুনেছে। হয়তো নানা কারণে সমস্যা তেমন জটিল হল না। অস্মিতা সাময়িক স্বস্তি পেয়েছে। তবু সম্পূর্ণ অপরিচিত এক টিন এজার ছেলেকে নিজের সংসারে অভীকের আপনজন বলে গ্রহণ করা। অস্মিতার সামনে এখন অনেক মানিয়ে নেওয়া, বোঝাপড়া বাকি। অভীকের বিশ্বাস অস্মিতার মতো সংবেদনশীল মানুষ সহজে ধৈর্য্য হারাবে না। এ বাড়িতে যে কয়েকদিনই থাকুক, অপু এসে এক সুস্থ, স্বাভাবিক পরিবেশ পাবে। যা তাকে মহুয়া কখনো দেওয়ার চেষ্টা করেনি। নিজের জেদ, উশৃঙ্খল জীবনযাপনের নেশায় ছেলেকে চূড়ান্ত অবহেলা করেছে।

অপুর আসার প্রতীক্ষায় থেকে অভীক আবার যেন নতুন করে পুরোনো ঘটনাগুলোয় ফিরে যায়। সেই সময়ের সুখস্মৃতি বলে কিছু নেই। তখন ওরা লুইসিয়ানার ছোট শহরে থাকে। বিয়ের কয়েকমাস বাদে মহুয়া যখন জানল মা হতে চলেছে, একটুও খুশি হল না। অভীকের নতুন চাকরি। মাঝে মাঝে কাজের জন্যে বাইরে যেতে হয়। মহুয়ার অজস্র অভিযোগ। আমেরিকার ওই মফঃস্বলের জীবনে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। ওখানে বাঙালি সমাজ নেই। মহুয়ার গানের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে কাজের লোক নেই। এত কাজ করার জন্যে লোকে আমেরিকায় আসে? মহুয়া গাড়ি চালানো শিখবে না। অভীক বাইরে গেলে ওকে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্যে আমেরিকান প্রতিবেশীর সাহায্য নিতে হয়। তারা উপদেশ দেয় ড্রাইভিং না জানলে তুমি ইন্‌ডিপেনডেন্ট হতে পারবে না। মহুয়ার বিরক্তি বাড়তে থাকে। মাঝে মাঝে বমি আর মাথা ঘোরার কষ্ট। অভীক অফিস থেকে ফিরে যা পারে রান্না করে। বাধ্য হয়ে মহুয়ার কথায় দেশ থেকে ওর মাকে আনাতে হল। অভীক সে সময় সবেমাত্র সিনিয়র ইঞ্জিনিয়র হয়েছে। একার রোজগারে সবদিক সামলাতে হচ্ছে। শাশুড়িকে আনাতে গিয়ে খরচ বাড়ল। তাঁর ভিসার ব্যবস্থা, প্লেনের টিকিট, আমেরিকার মেডিকেল ইন্সিয়োরেন্স, না করে তো উপায় ছিলনা। মহুয়ার সি-সেক্‌শন ডেলিভারির খরচও অভীকের কোম্পানির হেল্‌থ ইন্সিয়োরেন্স থেকে পুরো দেয়নি। কলকাতার বাড়িতে বাবা, মা-র জন্যে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হত। মধ্যবিত্ত বাড়ির ইঞ্জিনিয়র ছেলের অনেক দায় থাকে। তবু যদি মহুয়া আর ওর মা একটু বোঝার চেষ্টা করত। শুধু অসন্তোষ। মহিলা এসেছিলেন মেয়ের বাচ্ছা হওয়ার সময় সংসারে সাহায্য করতে। অন্তত মহুয়া তাই বলেছিল। অথচ তাঁর নায়াগ্রা ফল্‌স্ দেখা হল না বলে, নিউইয়র্ক দেখা হল না বলে কী দুঃখ! কোথায় লুইসিয়ানার ছোট শহর লেক চার্লস্, কোথায় নিউইয়র্ক। বাড়িতে ছোট্ট বাচ্ছা। মা, মেয়ের আবদারে অভীকের মাথা গরম হয়ে যেত। মহুয়ার গানের ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে গেল বলে যখন তখন রাগারাগি। বাড়িতে মেইড রাখা, বাচ্ছা দেখাশোনার জন্যে ন্যানী রাখা, আমেরিকার উচ্চবিত্ত বাঙালিদের মতো আর্থিক ক্ষমতা অভীকের তখন ছিল না। শেষ পর্যন্ত অশান্তি চরমে পৌঁছোল। কোনো পক্ষ আপস করতে রাজি নয়। অপুর যখন দেড় বছর বয়স, মহুয়া ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল। অভীক বিয়ের চার বছরের মাথায় ডিভোর্স দিয়ে দিল। তারপর

লুইসিয়ানা ছেড়ে নতুন চাকরি নিয়ে নিউইয়র্কে চলে এলো। অপুর দায়িত্ব না পেলেও ষোলো-সতের বছর ধরে ওর জন্যে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি ডলার পাঠিয়ে যাচ্ছে। বছর বছর অপুকে গিয়ে দেখে এসেছে। সেদিক থেকে কর্তব্য যা করার, অভীক সবই করেছে এবার শুধু নিজের প্রথম সন্তানকে ফিরে পাওয়ার অপেক্ষা।

অভীকের ইচ্ছেয় অপু যে তার মাকে ছেড়ে চলে আসছে, অস্মিতার কি সে নিয়ে কোনো বক্তব্য আছে? অভীক ঠিক বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে অস্মিতার একটা পুরোনো প্রশ্ন তাকে বিদ্ধ করে। অস্মিতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার কি কখনো মনে হয়েছে তুমি নিজেও মহুয়ার কষ্ট বোঝার চেষ্টা করোনি? আমেরিকায় বিয়ে হয়ে এলেই সবাই যে সর্বসুখে থাকবে তা তো নয়। তার সোশ্যাল আইসোলেশন থাকতে পারে। সে হয়তো গানের কেরিয়ার বেছে নিতে চেয়েছিল। তাড়াতাড়ি মা হতে চায়নি। মেটিরিয়্যালিজম-এর দেশে এসে প্রথমদিকের ছোটখাট অ্যাড্‌জাস্টমেন্ট্, বা তার মতে 'স্যাক্রিফাইস'গুলো করতে রাজি হয়নি। সে নিশ্চয়ই তোমার কাছে অনেক বেশি কম্‌প্যাশন আশা করেছিল।'

অস্মিতার প্রশ্নে অভীক আশাহত হয়েছিল, 'এত বছর আমার সঙ্গে থেকে তোমার তাই মনে হয় অস্মি? অ্যাম্ আই সো সেল্‌ফ্-সেন্টারর্ড অ্যান্ড সেল্‌ফিশ?'

অস্মিতা বলে উঠেছিল, 'না গো, সে কথা বলিনি। জানি, তোমার কোনো রিগ্রেট্ থাকার কথা নয়। দুবছরেও যখন একটুও অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়নি, তোমাদের টেম্‌পেরামেন্ট কোনোদিনই মিলত না।'

আর কখনো অস্মিতা এমন প্রসঙ্গ তোলেনি। ইদানীং শুধু একবার বলেছে, 'অপুকে তুমি মাঝে মাঝে কলকাতায় পাঠিও। আমরা যাই ভাবি, ওর তো মা।'

বিরক্ত হয়ে অভীক বলেছে, 'স্টুডেন্ট ভিসায় যারা এদেশে পড়তে আসে, তারা কজন বছর বছর দেশে যায়। প্রথমবার এসে আমি আড়াই বছরের আগে কলকাতায় যেতে পারিনি। তখন ফোন করা এত সস্তা ছিলনা। ই-মেইল ছিল না। আমারও তো সেখানে বাবা, মা ছিলেন, নাকি? অপু যদি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অ্যাডমিশন পায়, হয়তো ওকে সামারে ক্লাস করতে হবে। অ্যাট্‌লিস্ট্ বছর দুই ইন্ডিয়া যাওয়ার প্রশ্ন নেই। তুমি সামারে ওমি, শমীকে নিয়ে ঘুরে আসবে। দ্যাটস্ ইট্।' অভীক মনে মনে সেটাই ভেবে রেখেছে।

কলকাতায় অপুর স্কুলের ফাইন্যাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোল। এন আই টি-তে ভর্ত্তির সুযোগও পেল। ততোদিনে নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাডমিশনের চিঠি এসে গেছে। রওনা হওয়ার আগে হাতে আর মাত্র দেড়মাস সময়। অপুকে নিয়ে মহুয়া একদিন 'শান্তিভবনে' গেল। সন্ধ্যের পরে হঠাৎ কারেন্ট্ চলে গেছে। নীচে বসার ঘরে টিমটিমে আলোয় শীলা ওদের দেখে বললেন, 'তোদের এত দেরী হল? বলেছিলি যে বিকেল বিকেল আসবি? এখন তো ছাই ভালো করে দেখতেও পাচ্ছি না।'

অপু হাসল, 'এই তো কাছে বসলাম। গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখো। তোমার সামনের দাঁত পড়ে গেল কবে?'

শীলার গলায় অভিমান, 'তুই কোনোদিন দেখতে আসিস যে জানবি?'

মহুয়া ব্যাগ থেকে মিষ্টির বাক্স বার করে রাখল, 'কখন বেরিয়েছি। শেষ মুহূর্তে হাজারটা কাজ সারতে হচ্ছে। অপু তো আজ দুদিন পরে ফিরল।'

'কেন? ও আবার কোথায় গিয়েছিল?'

'ওর জ্যাঠার বাড়ি।'

শীলা মুখ বিকৃত করলেন, 'হুঁঃ বাড়ির ছেলে আমেরিকা যাচ্ছে বলে এখন খুব আদিখ্যেতা! দরকারের সময় তো একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেনি। তুই ও বাড়িতে যেতে দিলি কেন?'

মহুয়া অপুর মুখ দেখে প্রমাদ গুনল, 'তুমি থামো তো মা। শুধু শুধু ওদের সম্পর্কে বোলো না। দরকার আবার কী? আমি ওদের কাছ থেকে টাকা নেবই বা কেন? অপুর জন্যে ওর বাবা এ পর্যন্ত কম টাকা পাঠিয়েছে? এলাম ছেলেটাকে নিয়ে দেখা করতে। ওর সঙ্গে দুটো কথা বলো।"

মেয়ের মেজাজ বুঝে শীলা ধাতস্থ হলেন, 'বুঝিস তো, মনটা ভালো নেই। হ্যাঁ রে অপু, এই যে পড়তে যাবি, পাশ টাশ করে আবার ফিরে আসবি তো? নইলে মাকে দেখবে কে?'

অপু যেন দায়সারাভাবে উত্তর দিল, 'দেখি। আগে পড়াশোনা শেষ করি।'

মহুয়া ছেলের নিরুত্তাপ ভাব লক্ষ্য করছিল, 'আমার জন্যে কেরিয়ার নষ্ট করে ফিরে আসার কি আছে? হাজার হাজার এন.আর.আই. এর মা এদেশে একা থাকে। আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাইলেও যায় না। আর, আমার তো কোনো মোহই নেই।'

অপুর আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। মিমির সঙ্গে কদিন দেখা হয়নি। ও দিল্লিতে সোশিয়োলজি নিয়ে পড়তে চলে যাচ্ছে। আজ ও ফিরে গিয়ে ফোন করতে রাত হয়ে যাবে। অপু মাকে তাড়া দিল, 'আমার এখনো অনেক কাজ বাকি আছে মা। কাল সকালে ট্র্যাভ্‌ল্ এজেন্টের অফিসে যেতে হবে। এখন তো এখান থেকে একটা ট্যাক্সিও পাব না।'

অপু শীলাকে প্রণাম করল, 'চললাম দিদা। ভালো থেকো। যদি নেক্স্ট্ ইয়ারে আসতে পারি, তখন দেখা হবে।'

ওরা শান্তিভবনের গেট পার হয়ে চলে যাচ্ছে। শীলা জানলা দিয়ে চেয়ে আছেন। মনে মনে বলছেন, ছেলেটা বড় দুঃখী। লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক। জীবনে সুখ শান্তি পাক।

'অর্পণ ঘোষ' লেখা পাসপোর্ট নিয়ে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক অপু অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছাল। অভীকদের লার্চমেন্টের বাড়িতে কয়েকদিন থেকে কলেজ খোলার আগে বিংহ্যামটনের ক্যাম্পাসে চলে যাবে। বাড়ি থেকে গাড়িতে কয়েক ঘণ্টার পথ। অভীক ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। অপু এরকমই আশা করেছিল। বাবার কাছে থাকলেও সম্পূর্ণ অচেনা একটা ফ্যামিলির সঙ্গে সারাক্ষণ মানিয়ে চলা সহজ নয়। অস্মিতা অবশ্য খুবই ভালো ব্যবহার করছে। অপুকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে গিয়ে ওর জামাকাপড়, জ্যাকেট, জুতো থেকে শুরু করে কলেজের জন্যে যা যা দরকার, কিনে আনছে। কলেজ ডর্মে তিন বেলা অপু 'মিল্ প্ল্যান্' এ খাবে। সময়মতো ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়ে যত ইচ্ছে খাওয়া। তাও অস্মিতা ওকে একটা ছোট্ট মাইক্রোওয়েভ কিনে দিয়েছে। বিংহ্যাম্টনে শীতকালে ভীষণ বরফ পড়ে। ঘরে একটু খাবার গরম করে খাওয়ার ব্যবস্থা রাখা উচিৎ বলে টিনের খাবারের লিস্ট লিখে দিয়েছে। এদিকে অভীক উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে কলেজ কোর্সের বিষয়ে। অপু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। অপু যে বিংহ্যামটন কলেজে অ্যাডমিশন পেয়েছে, অভীক যে বন্ধুবান্ধবদের কাছে ছেলের পরিচয় দিতে পারছে, এতেই তার অনেকদিনের আশা পূর্ণ হয়েছে। ওমি, শমীকে এতদিন না জানালেও অভীকের প্রথম বিয়ে, ডিভোর্স, অপুর কথা চেনাশোনা বাঙালিরা মোটামুটি জানে। কৌতূহল দেখায় না। এখন তারা অপুকে দেখছে। কলেজে যাচ্ছে বলে কনগ্র্যাচুলেট্ করছে।

শুধু ওমি, শমী প্রথমদিকে অপুর ধারে কাছে আসছিল না। অপু বুঝতে পারছিল, বাবা যতই চেষ্টা করুক, ওরা এত তাড়াতাড়ি ওকে অ্যাক্সেপ্ট করতে চাইবে না। কাজ হল খাবার টেবিলে বসে তাসের ম্যাজিক দেখিয়ে। 'ট্রিক্স্' শেখার উৎসাহে ওমি অপুর কাছাকাছি ঘুরতে লাগল।

আমেরিকায় ভাইবোনদের কেউ দাদা, দিদি বলে না। অপুকে ওমি, শমী "আপু" বলে ডাকে। অস্মিতা বলেছে ওকে "মাসি" ডাকতে। ড্যাড, বাবা, মাম্মা, মাসি, আপু—এমন সব সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে ওদের সঙ্গে অপুর নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগল।

ছেলেমেয়েরা ছোট বলে অস্মিতা চাকরি করে না। ইন্ডিয়া ট্রিবিউন নামে একটা ইংরিজি পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ লেখে। দুপুরে লেখালেখি, বাকি সময় সংসার আর বাইরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। বাবা বলে অস্মি ভীষণ অর্গ্যানাইজড্। কলেজে পৌঁছে দেখবি তোর প্রত্যেকটা জিনিস গুছিয়ে লিস্ট করে দিয়েছে।

অস্মিতা সম্পর্কে অভীকের প্রশংসার ব্যাপারটা অপুর কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে না। ক্রমশ অপু নিজেও অনুভব করছিল এ বাড়ির জীবনযাত্রায় একটা ধরাবাঁধা ছন্দ আছে। স্নেহ ভালোবাসা, রুটিন আর ডিসিপ্লিনের সহাবস্থানে উদ্বেগহীন এক নিরাপত্তাবোধ। দিল্লিতে মিমিকে অপু ই-মেইল্ এ লিখেছিল—আই নেভার হ্যাড দিস্ কাইন্ড অফ্ চাইল্ড-হুড। বাবা থেকেও নেই। ভাইবোন আত্মীয়স্বজন নেই। মা-র নেগ্‌লিজেন্স্। দিদার রাগ, মেজাজ। ছোটবেলায় অ্যাফেক্শন আর পেলাম কার কাছে? ডিসিপ্লিন যেটুকু শিখলাম হস্টেলে থেকে।

মিমি উত্তর দিয়েছিল, 'এত পুরোনো কথা লিখিস কেন? নতুন খবর জানাস। ছোট ভাইবোন দুটোর ছবি পাঠাস। তোর রুমমেট কি আমেরিকান?'

অপু কলেজ ক্যাম্পাস থেকে মিমিকে ওমি, শমীর ছবি পাঠাল। লিখল, রুমমেট আমেরিকান। তোর এর মধ্যেই এত বন্ধুবান্ধব হয়ে গেছে? আমাকে মিস করছিস না? কলকাতাকে? আমি মিস্ করছি। শুধু তোকে নয়। আমাদের পচা পাড়াটাকেও।

বছর শেষ হল। থ্যাংক্স্ গীভিং, ক্রীসমাসের ছুটিতে অপু লার্চমেন্টের বাড়িতে এলো। আমেরিকায় প্রথম শীতের ধাক্কায় নতুন বছরের শুরুতেই অপুর ব্রংকাইটিস। আপস্টেট নিউইয়র্কে বরফ পড়ারও শেষ নেই। ক্যাম্পাসে ফিরে আবার

পড়াশোনা, মিড-টার্ম, ফাইন্যাল পরীক্ষার চাপ। মে মাসে সেকেন্ড ইয়ারে উঠে গরমের ছুটি হবে। অভীক এখন থেকে অপুর জন্যে নিজেদের অফিসে তিনমাসের সামার জব্ এর ব্যবস্থা করছে। বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে চাকরির অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপুর কিছু রোজগার হবে। অপু ফোনে মহুয়াকে আশা দিল হয়তো সামনের ডিসেম্বরে কলকাতায় যেতে পারে।

ওমি শমীর গরমের ছুটি থাকে প্রায় আড়াই মাস। অভীক অস্মিতা ওদের নিয়ে দেশে যায়। এবছর হঠাৎ সেই নিয়ে অশান্তি বাধল। অভীক ঠিক করেছে এবার আর নিজে যাবেনা। অস্মিতা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘুরে আসুক। অস্মিতা কারণটা বুঝেছে। তবু জিজ্ঞেস করল, 'এবার হঠাৎ না যাওয়ার কি হল? বলেছিলে কদিনের জন্যে পুরীতে যাব।'

'নাঃ, তোমরা ঘুরে এসো। জুন থেকে অপুর সামার ইনটার্নশীপ শুরু হবে। আমাদের অফিসেই জয়েন করছে। আই থিংক আই শুড্ স্টে হিয়ার।'

'তুমি দেশে গেলে ওর অসুবিধেটা কী? এখানে সবাই কি বাবার অফিসে সামার জব করে?'

অভীক বোঝাতে চেষ্টা করল, 'স্টিল, হি নীডস্ সাম গাইডেন্স্। ছ-মাস হল মাত্র এসেছে। এখনো ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়নি। এখন থেকে রোজ নিউইয়র্কে কমিউট করবে। এ বছরটা ওকে একা রেখে নাই বা গেলাম।'

'যা তোমার ইচ্ছে। তার মানে, তোমার দাদাদের সঙ্গেও দেখা হবেনা? আমার বাবা, মাও তো এক্সপেক্ট করেন....'

'কিছু করার নেই। অপুর কেরিয়ারটা আমার কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট। তার চেয়ে ক্রীসমাসে আমরা সবাই মিলে ফ্লোরিডা যাব।'

অস্মিতা রেগে গেল, 'আজকাল ট্র্যাভ্ল্ করা যে কি হ্যাস্ল্। তার ওপর দেশে গেলেই তো একজনের ভাইর‍্যাল ফিভার, একজনের পেটখারাপ। তুমি সঙ্গে গেলে অত চিন্তা থাকে না। অপু একটা অ্যাডাল্ট্ ছেলে। মাসখানেক নিজে ম্যানেজ্ করতে পারবে না?'

অভীক জেদ ধরে রইল, 'দ্যাট্স্ নট দ্য পয়েন্ট। আমি এবছর ওকে একা রেখে যেতে চাই না। ওর সঙ্গে একটু সময় কাটাতেও ইচ্ছে করে।'

'কেন? আমরা তোমাকে সেইটুকু স্পেস্ দিই না? তার জন্যে বাড়ি খালি

করে দেশে চলে যেতে হবে? ওমি, শমী তোমাদের কি ডিসটার্ব করে?'

অস্মিতা অভিমান করে উঠে যাচ্ছে দেখে অভীক ওর হাত ধরে বসাল, 'কি যে পাগলের মতো বলো! আমি তো জানি তুমি অপুকে যেভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছ, সকলের সেই কমপ্যাশন থাকে না। অস্মি, ইচ্ছে হলে দেশে ঘুরে এসো। নয়তো, এবার কাছাকাছি কোথাও শর্ট ট্রিপ নিতে পারি। অপু না হয় শেষের দিকে একটা উইক্ অফ্ নিয়ে নেবে। এসে পর্যন্ত কোথাও তো যায়নি।'

অস্মিতা মাথা নাড়ল, 'না গো, বাবার শরীর ভালো যাচ্ছে না। আশা করে বসে থাকেন। সিঙ্গাপুর থেকে সুস্মিতারাও আসছে। সামারে ঘুরেই আসি।'

বিংহ্যামটনের ক্যাম্পাসে অপুর দুবছর পার হয়ে গেল। থার্ড ইয়ারে উঠেও গরমের ছুটিতে কলকাতা যাওয়া হল না। প্রত্যেক সামার এ চাকরি করছে। রেজাল্ট ভালো হচ্ছে। কাছাকাছি কোম্পানিতে দু-আড়াই মাসের কাজ পেয়ে যাচ্ছে। অভীক একরকম নিশ্চিন্ত যে এদেশে ছেলের মন বসে গেছে।

অপু স্পষ্ট করে অভীককে কিছু জানায় না। মহুয়াকে ফোন করলে দেশে আসার কথা জিজ্ঞেস করে। অপু মাকে বোঝায়—পড়া আর চাকরির মাঝে একদম ব্রেক পাচ্ছি না। এবার ক্রীসমাসে বোধহয় বাবার সঙ্গে দু-তিন উইকের জন্যে যাব।

মিমি মাঝে দিল্লি থেকে দেওয়ালির ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে অপুকে ফোন করেছিল। বলল, 'তোদের বাড়িটা প্রোমোটারকে দিচ্ছে। বাড়িওলা তোর মাকে ফ্ল্যাট ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে। ভাড়া নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আগেও নাকি ভাড়া টাকা বাকি ছিল। বেশ ঝামেলা করছে।'

অপু চিন্তিত হল, 'নোটিশ দিলেই হল? এতবছর থাকার পর মা যাবে কোথায়? টেনেন্টদের জন্যে রাইট আছে না?'

'সে জন্যে উকিল টুকিল দরকার। কেস চালানোর খরচ আছে। উনি তোকে কিছু জানাননি?'

অপু বলল, 'আমার সঙ্গে কোনো কথাই হয়নি। তুই খবর পেলি কী করে?'

ফোন রাখার আগে মিমি জানাল, 'একদিন ওঁর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল। তখন বলছিলেন। ওষুধের দোকানের ভদ্রলোক নাকি বুঝিয়েছেন এভিক্ট্ করতে চাইলে পার্টির হেলপ্ নেবেন। কে জানে? তুই একবার মাকে কনট্যাক্ট কর। দেখাও তো কতদিন হয় না। এ বছর আসবি না?'

অপুর একবারও মনে হয়নি মা এতরকম সমস্যায় আছে। মা-র হাতে

টাকাপয়সা কেমন আছে, সে বিষয়েও কোনো ধারণা নেই। গান শেখানো ছাড়াও মা দক্ষিণাপনে একটা টেক্স্টাইলের দোকানে চাকরি নিয়েছে। অপু ভেবেছিল মা-র সময় কাটেনা বলে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। প্রয়োজনে ব্যাপারটা মাথায় আসেনি। মিমির কাছে ফোনে মার খবর শুনে অপু একদিন অভীককে জানাল। অভীক নির্বিকার, 'বাড়ি ছাড়তে হলে ছাড়বে। আমরাও তো কেস্ করে কলকাতার বাড়ির ভাড়াটে ওঠালাম।'

অপু বলল, 'বাট অ্যাট্ দিস্ স্টেজ হোয়্যার উইল্ শী গো? ওখানে মার গানের স্কুল। ঢাকুরিয়ার শপিং সেন্টারে কাজ করে। এখন কোন্ পাড়ায় গিয়ে ফ্ল্যাট খুঁজবে?'

'ফার্স্ট অফ্ অল্, সেটা আমার ভাবার কথা নয়। তুমিও কোনো সলিউশন করতে পারবে না। তোমার মা যদি কেস্ এর ঝামেলায় না যেতে চায়, শী শুড্ নেগোশিয়েট ফর সামথিং। বাড়িওলা নয়তো প্রোমোটারের কাছে কিছু ডিম্যান্ড করুক। টাকাকড়ি পেলে নিজের মা-র কাছে ওল্ড-এজ হোমে চলে যাক। এই বয়সে অন্যের ফ্ল্যাট দখল করে রেখে হবেটা কী? ভালো কথায় বাড়ি না ছাড়লে ওরা হ্যারাস্ করবে।'

অপুর হঠাৎ ওই মুহূর্তে বাবাকে ভারী নিষ্ঠুর মনে হল। যেন মা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালে বাবা খুশি হয়। হোতে পারে, মা একসময় বাবাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। তবু, বাবা জীবনে প্রায় সব কিছু ফিরে পেয়েছে। অপুও চলে এসেছে। ওখানে মা একা। মিমির কথায় বুঝতে পারল মা ওকে কিছু জানাতেও চায় না। বাবার যুক্তিগুলো অস্বীকার করা যায় না। অপু এত দূরে থেকে কি সলিউশন করবে? মার পক্ষে কেস্ করার ঝামেলাও কী কম?

অপু মাকে ফোন করে বাবার কথাগুলো বলল। মহুয়া বোঝাল, 'আমার জন্যে ভাবিস না অপু। যদি কোথাও যেতে হয়তো যাব। গানের টিউশন কমে গেছে। তুইও ফিরবি না। ফ্ল্যাটটা রাখার জন্যে কেস এর ঝামেলায় যাব কেন? সে ক্ষমতাও নেই। তার চেয়ে যাদবপুর, গড়িয়ার দিকে কোথাও পেইং গেস্ট হয়ে চলে যাব।' অপু মানতে পারছিল না, 'এখনই ডিসিশন নিচ্ছো কেন? এভিক্শনের কেস্ তো বছরের পর বছর ধরে চলে। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং কম্প্লিট করতে আর একটা বছর। এখানে রিসেশন হোক। যাই হোক, আমাদের জব মার্কেট ভালো। হয়তো ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাব। তোমাকে টাকার জন্যে কোনো কমপ্রোমাইজ করতে

হবে না। আই উইল টেক কেয়ার অফ্ ইউ।'

মহুয়ার গলার স্বর কান্নায় বুঁজে এল, 'বাবার সঙ্গে অশান্তি করিস না। সেরকম অবস্থা হলে তোকে নিজেই জানাব।'

ওমি জুনিয়র হাইস্কুলে যাচ্ছে। নতুন ক্লাসে হায়ার ম্যাথ গ্রুপে ঢুকতে পারেনি। অপু ছুটির মধ্যে বাড়িতে এলে ওমিকে অঙ্ক করায়। ওমিকে সামার স্কুলে পাঠানোর জন্যে অস্মিতারা এবার দেশেও যায়নি। ক্রীসমাসের ছুটিতে অভীকের সঙ্গে অপু শেষ পর্যন্ত কলকাতায় গেল। দু সপ্তাহ পুরোনো পাড়ায় মা-র কাছে থাকল। মিমির সঙ্গে দেখা করার জন্যে দিল্লি গেল। দিল্লি থেকে নিউইয়র্কের ফ্লাইটে অভীকের সঙ্গে লার্চমন্টে ফিরে এলো। মিমির সঙ্গে অপুর বন্ধুত্বের খবর এখন অস্মিতাও জানে। অভীকের সঙ্গে এবার দিল্লি এয়ারপোর্টে মিমির আলাপ হল। প্লেনে আসতে আসতে অভীক জিজ্ঞেস করেছিল, 'ইজ শী ইয়োর গার্লফ্রেন্ড? নাকি পাড়ার বন্ধু?'

অপু উত্তর দিয়েছিল, 'ছোটবেলার পাড়ার বন্ধু। অ্যান্ড নাউ উই হ্যাভ আ স্টেডি রিলেশনশিপ।'

অভীক হেসে ফেলেছিল, 'তুই থাকিস বিংহ্যামটনে। ও থাকে দিল্লিতে। ইউ ডোন্ট সী ইচ্ আদার।'

অপু হাসি মুখে মাথা নেড়েছিল, 'ইয়া দ্যাট্স্ আ প্রবলেম।'

অভীকের কাছে শুনে অস্মিতা বলেছিল, 'হয়তো মেয়েটা খুব কেয়ারিং। ছোটবেলা থেকে অপুর সিচ্যুয়েশনটা জানে। ওর পক্ষে দেশের চেনাশোনা মেয়ে বিয়ে করাই ভালো।'

অভীকের ধারণা অপুর এখন কোনো কমিটমেন্টে যাওয়ার বয়সই হয়নি। আগে ভালোভাবে সেট্‌ল করুক।

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি নেওয়ার পর অপুর তিনটে চাকরির সুযোগ এলো। অভীকের ইচ্ছে ছিল অপু নিউইয়র্ক-নিউজার্সি-বস্টনের দিকে চাকরির অফার নেয়। অপু চলে গেল স্যানফ্রানসিসকো। অভীক ভাবতেই পারছিলনা চার বছরে অপু এত ইনডিপেনডেন্ট হয়ে গেল যে ক্যালিফোর্নিয়ার চাকরিটা নেওয়ার আগে একবার বাবার মতামতও নিল না। তখনো ওর অপুর চাকরির শর্তটা জানা ছিল না। অপু ফোন করে বলল, দু বছরের অ্যাসাইন্‌মেন্টে ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছে। যদিও প্রায়ই স্যানফ্রানসিসকোয় আসতে হবে।

অভীক অবাক, 'দু বছরের জন্যে ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছিস? আগে থেকে কথা হয়েছিল?'

অপু উত্তর দিল, 'এরকম একটা পসিবিলিটির কথা জানতাম।'

অভীক আশাহত হল, 'আমাকে বলিসনি তো! তোর কি এদেশে থাকতে ভালো লাগছে না?'

অপু বলল, 'তা কেন হবে? অফিসটা তো এখানেই। বলতে পারো আমি একটা সুযোগ খুঁজছিলাম।'

'কীসের সুযোগ? ইস্ট কোস্টে এত ভালো ভালো অফার পেয়েছিলি...।'

'বাবা, আই নীড টু টেল্ ইউ সামথিং। মা-র শরীর ভালো নেই। মাঝে চেস্ট পেইন্ হয়ে হসপিটালে গিয়েছিল। ফ্ল্যাটটাও এবার ছেড়ে দিতে হবে। আমার একবার যাওয়া দরকার। ব্যাঙ্গালোরে থাকতে থাকতে মা-র ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা, তারপর সল্টলেকের সিনিয়র সিটিজেন হোমে মাকে রাখার ব্যবস্থা, অনেক কাজ করে আসতে পারব।'

অভীক কেমন অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করল, 'দু বছরের মধ্যে ফিরে আসবি তো অপু? নাকি ওখানেই চাকরি নিয়ে থেকে যাবি?'

অপুর মনে হল একদিন মাও এই প্রশ্ন করেছিল। পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট নয়, ওর কাছে আরও বিস্তারিত হয়ে চলেছে। তবু একটা স্থায়ী ঠিকানা আছে। পাসপোর্টের অর্পণ ঘোষের মনোহরপুকুর সেকেন্ড বাই লেনের ঠিকানাটা মুছে গিয়ে লার্চমেন্টের বাড়ির নতুন ঠিকানা। স্যানফ্রানসিসকো আছে। ব্যাঙ্গালোর আছে। কলকাতা আছে। দিল্লিতে মিমি আছে। অপু অভীককে উত্তর দিল, 'যখন যেখানেই থাকি, ফিরে আসব।'

———